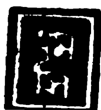
জাহানারা রোশেনারা

দ্বৈপায়ন

দাম ৪.


মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

JAHANARA ROSHENARA

A Historical Novel

By Daipayan

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬০
প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কল-৯
মুদ্রাকর : সনাতন পাল। প্রিন্টিং উদ্যোগ। ১৯/ডি/এইচ/১৪, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কল-৬
প্রচ্ছদ : প্রতাপ গঙ্গোপাধ্যায়

পঁয়ত্রিশ টাকা

শ্রীতপন ভট্টাচার্য
শ্রীমতী রীণা ভট্টাচার্য
প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের

শেষ পাঠান
রাজদরবার
মুঘল হারেম
ভাবভালবাসা
মেহেরউন্নিসা
সেদিন সন্ধ্যায়
একাকী অন্ধকারে
পৃথ্বিরাজ চৌহান
এই রোধ—এই বৃষ্টি

পেয়ারী বহিন শবনম,

তুমকো সালাম আলেকুম। দীর্ঘদিন পরে তোমার লেখা পত্র পেলাম আজ-ই। লিখেছো, গত রমজান (পৌষ) মাসে আব্বাজান সম্রাট শাজাহানের মৃত্যু সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পত্র লিখেছিলে। তার পরেও অনেকগুলো পত্র তুমি আমাকে পাঠিয়েছো। হয়তো তোমার বদ নসিব! আমি তোমাকে ভুলে গেছি! তাই, কোন পত্রের উত্তর তুমি পাওনি।

না শবনম, তোমাকে আমি ভুলিনি। এ জিন্দেগীতে তোমাকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার ঋণ কোনদিন পরিশোধ করতে পারবো না। আশ্চর্য হবে! ভাববে, কিসের ঋণ তোমার কাছে আমার? তুমি জান না, কি ঋণের জালে তুমি আমাকে আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়েছো। আমার প্রতি তোমার অটুট বিশ্বাস, ভালবাসার স্মৃতি কি করে ভুলবো আমি!

শবনম, তোমার পত্রের ছত্রে-ছত্রে অভিযোগ আর অভিমান! অভিযোগ অস্বীকার করছি না। অভিমান স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, তোমাকেও আমি অনেকগুলো পত্র লিখেছি।

শবনম, শাবান (অগ্রহায়ণ) প্রায় শেষ হয়ে এল। ধূসর আকাশ। আগ্রার বাতাসে শীতের কামড়। দিন বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন। রাত্রি শেষ হয়ে যাবার পরও অনেক সময় ধীরে ম্লান অন্ধকারটা জড়িয়ে থাকছে প্রকৃতিকে। দিনের প্রথম সূর্যের আলো ফুটছে বড় ধীরে-ধীরে। কদিন পরেই রমজানের সুরু। মধ্যের এই দীর্ঘ ক'মাসে তোমার লেখা কোন পত্রই আমার হস্তগত হয়নি। কেন? কি কারণে? আমি জানি না। বিশ্বাস করো।

কিন্তু গত রজবের (কার্ত্তিক) আগের পাঠানো তোমার কোন পত্র আমার না পাওয়ার কোন কারণ দেখছি না। দীর্ঘ দিন তোমার লেখা বহু পত্র আমি পেয়েছি। তুমিও পেয়েছো আমার পত্র। এবার কেন এই ব্যতিক্রম, বুঝতে পারছি না।

একি বাদশাহ আলমগীরের কোন নতুন কৌশল, না-স্নেহের ভগিনী রোশেনারার প্রতি করুণা? বুঝতে পারছিনা। শুধু এইটুকু বুঝেছি রজব শেষ হওয়ার কদিন আগে থেকে আমি বন্দিনী। একটু একটু করে তিনি আমার সমস্ত রকমের স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছেন। আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। নিরাপত্তার কারাগ্রে গৃহদ্বার আজ আর সকলের কাছে অবারিত নয়। যদিও তা তিনি স্বীকার করেননি।

পরিণতি? না, তার জন্য চিন্তা করি না। অহেতুক চিন্তা করে কি লাভ? জানি, জন্ম লগ্নের পর থেকেই আমরা প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। একদিন মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নেয় জীবনকে। আমার এই জীবনটাও তো একদিন না একদিন শেষ হবে। কবরের নিচে শুইয়ে দেবে আমার এই দেহটাকে। তাহলে

অহেতুক মৃত্যু চিন্তা করে কি লাভ ? আমি যেমন ছিলাম, তেমনি আছি।

তাই কি? সত্য সত্যই কি আমি আগের মত আছি ? এতটুকু পরিবর্তন আসেনি কি আমার দৈনন্দিন জীবেন, আচারে-ব্যবহারে ?

না, সত্য নয়। পরিবর্তন এসেছে। আমি বুঝতে পারছি আমার পরিবর্তন। জীবনটা ছিল বহতা নদীর মত উচ্ছল-চঞ্চল। গভীরতা কি আমি জানতাম না। অহেতুক চিন্তা-ভাবনাকে স্থান দিতাম না মনে। আসলে সব কিছুকেই এতদিন আমি বড় সহজ সরল ভাবে নিয়েছি। দুঃখ-শোক, আনন্দ-বেদনা কোন কিছুই আমার মনে কখনো গভীর ভাবে রেখাপাত করেনি। আনন্দের মুহূর্তগুলোকে যেমন পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করেছি, ঠিক দুঃখের মুহূর্তগুলোতে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছি। আবার, এক সময় সব কিছু ভুলে সহজ হয়ে উঠেছি। এতদিন আমার জীবনে দুঃখ-সুখের মুহূর্তগুলো চিরস্থায়ী রূপ নেয়নি।

আজ আর তা বলতে পারবো না। আমার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। আমি এখন অনেক পাল্টে গেছি। একটা বিধ্বংসী ঝড়ের আঘাতে আমার আগের জীবনটাকে সমূল পাল্টে দিয়েছে।

সেই ঝড়...। ঝড় কেন বলি ? বলা উচিৎ ..। সে কথা এখন থাক শবনম। সব বলবো তোমাকে। জীবনের কোন কথাই তোমার কাছে গোপন করবোনা। দীর্ঘদিন ধরে একটা পাষাণ ভার বুকের মধ্যে আটকে আছে। তোমাকে সব কথা জানিয়ে একটু হালকা হতে চাই।

শবনম, আমি সম্রাট শাজাহানের কনিষ্ঠা কন্যা রোশেনারা। ঔরংজীব যখন দ্বিতীয়বার (১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে) দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই সময় তিনি আমাকে তাঁর পরিবারের সঙ্গে নিয়ে যান। সেই সময় তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়, বন্ধুত্ব। আমার দাক্ষিণাত্য বাসের কটি মাস তুমি আমাকে দেখেছো। নগররক্ষীর বিবি তার সব জড়তা সংকোচ কাটিয়ে একদিন বলেছিল, যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলবো শাহাজাদী ?

তোমার দিকে চেয়ে অবাক হবার ভান করেছিলাম আমি। বলেছিলাম, স্রিফ একটো বাত ?

তুমি বলেছিলে, বিশ্বাস করুন...

বলেছিলাম, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা থাক শবনম। কি বলবে বল।

তুমি বলেছিলে, শাহাজাদী, আপনি এমন কেন ? আমার মনে হয়...

—কি মনে হয় তোমার ? শবনম, তোমার মনের কথা অকপটে আমাকে বলতে পার। কোন সংকোচ কোর না। তুমি যা বলতে চাও তা যদি রূঢ় কথাও হয়, তাহলেও তুমি অসংকোচে বলতে পার আমাকে। তোমার কথায় যদি দুঃখ বা ব্যথা পাই, জানবে, তাও ক্ষণিকের।

তোমার দুচোখে বিস্ময় উপচে পড়েছিল। আমার একটা হাত চেপে ধরে মৃদু

কণ্ঠে তুমি বলেছিলে, শাহাজাদী বিশ্বাস করুন আপনি আমার কাছে ঠিক স্বপ্নের মত।

ভুলিনি শবনম, তোমার সে কথা আমি ভুলিনি। তোমার কাছে আমি ছিলাম স্বপ্নের মত। বড় সহজ, সরল, আর স্বচ্ছ বলে মনে হয়েছিল আমাকে। মুঘল সম্রাট শাজাহানের কন্যা বলে কখনো মনে হ'ত না তোমার। মনে হ'ত....

ঠিক তাই। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের মাধুর্য আমার কাছে অপরিসীম। স্বপ্নের পাখা মেলে হঠাৎ-হঠাৎ আমার মন কোথায় উধাও হয়ে যেত। পছন্দ করতাম নির্জনতা। কলকোলাহল, মুঘল হারেমের প্রাচুর্য আর বিলাসিতা মনটাকে সঙ্কুচিত করে তুলতো। আমি হাঁফিয়ে উঠতাম, কোথাও পালিয়ে যেতে চাইতাম, পথ রুদ্ধ জেনে মাথা কুটতাম মনের দরোজায়। দাক্ষিণাত্য যাত্রা আমাকে মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছিল। খুঁজে পেয়েছিলাম জীবনের পরিপূর্ণতা। আমি আলোকিত হয়ে উঠেছিলাম। যা দেখে তুমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়েছিলে। দুলেছিলে সন্দেহের দোলায়। প্রশ্ন জেগেছিল মনে।

কিন্তু আজ? আজ আমি সেই মনটাকে হারিয়ে ফেলেছি। চিন্তার সমুদ্র বাঁধভাঙা বন্যার মত প্রতি ক্ষণে-মুহূর্তে অস্থির করে তুলছে। আমি কি পাগল হয়ে যাব?

আমার কেউ নেই। কোন দিন ছিল না। এতদিন যাদের আপন জন, প্রিয় বলে মনে হ'ত, স্বার্থের খেলা শেষ হতে তাদের নগ্ন স্বরূপ কত বিভৎস, ভয়ঙ্কর। প্রয়োজন ফুরিয়েছে আমার।

তোমার পত্র পাবার কিছুক্ষণ আগে শাহাজাদী জাহানারা এসেছিল আমার কাছে। আমি দ্বিপ্রহরের আহারের পর চুপচাপ বসেছিলাম। খালেদা, আমার প্রিয় বাঁদী এসে জাহানারার আগমন সংবাদ জানিয়েছিল। তার কথা শুনে প্রথমটায় আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। মনে হয়েছিল ভুল শুনেছি। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কার কথা বলছো তুমি?

খালেদা তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছিল, মরণ! মাথাটা তো চিবিয়ে খেয়ে গেছে। কানের মাথাটাও খেয়েছো?

খালেদার মুখ বড় ভয়ঙ্কর। মুখে যা আসে তাই বলে। বলবে না-ই বা কেন, আমাদের ছটি ভাই-বোনকে খালেদাই কোলে করে একরকম মানুষ করেছে। আমার জন্মের পর থেকেই আম্মার শরীরে রোগ বাসা বাঁধে। জন্মের পর থেকে আমি ছিলাম রুগ্না আর কাঁদুনে, তাই খালেদা সব সময় আমাকে কাছে রাখতো। খালেদা ছাড়া আমি কাউকে জানতাম না, চিনতাম না। সেও আমাকে সন্তানস্নেহে মানুষ করেছে। মাঝে-মধ্যে বলেও সে কথা। ভালবাসে আমাকে। শাসন করে। শুধু রেগে গেলে যা মুখে আসে তাই বলে দেয়। শুনে রাগ যে হয় না তা নয়, কিন্তু কিছু করার নেই।

বলেছিলাম, একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই...

বাধা দিয়েছিল খালেদা। বলেছিল, মন বলে পদার্থটা থাকলে তবেই না কথাটা শুনবে তুমি। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছো, মনের রোগে তুমি ভুগবে না তো আমি ভুগবো?

কথাটা শুনে বিরক্ত হয়েছিলাম। বলেছিলাম, শোন, রোগটা যখন আমার অন্যে তখন নিশ্চয়ই ভুগবে না। আর আমি চাই না আমার জন্যে অন্যে কষ্ট পাক। এখন বল, কি বলছিলে!

খালেদা আমার কথা শুনে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল। মুখটা গম্ভীর করে বলেছিল, শাহাজাদী তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তাকে কি এখানে পাঠিয়ে দেব?

—কে শাহাজাদী?

—তোমার বাজি (দিদি)। কথাটা বলেই খালেদা কক্ষ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের মধ্যে একটা শিহরণ বয়ে গিয়েছিল। জাহানারা এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে! কেন?

মুহূর্তে মনে পড়েছিল গত রমজানের সেই দিনটির কথা। প্রচণ্ড শীতের রাত্রি সবেমাত্র শেষ হয়েছে। সূর্য ওঠার দেরি আছে তখনও। রাতের কুয়াশা ভেদ করে দিনের আলো ফুটছে একটু একটু করে। পাখিদের কিচির-কিচির ডাক দূর থেকে এক-আধবার ভেসে আসছে।

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। যত রাত্রিই হোক না কেন শয্যাগ্রহণে, সূর্যোদয়ের অনেক আগে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কেউ যেন অদৃশ্য থেকে আমাকে জাগিয়ে দেয়।

সেদিনও ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছিলাম। স্নান সেরে নমাজ পাঠ করে যখন দ্বিতলের অলিন্দে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তখনও পূবের আকাশে আলোর ইসারা জাগে নি। সেই অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে আমি যেন কিছু খুঁজছিলাম। কি খুঁজছিলাম জানি না। তবে সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে আমার মনটা ছিল ভারাক্রান্ত। গত রাত্রে হঠাৎ কেন যেন ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। স্বপ্ন দেখেছিলাম কিনা মনে করতে পারি নি।

এক সময় কার মৃদু কণ্ঠস্বর আমার কানে এসেছিল, বেগম!

বেগম! ফিরে বলবনকে দেখতে পেয়েছিলাম। আমার খোজা বান্দা। বাদশাহ আকবর শাহের সময় এসেছিল মুঘল হারেমে। বলবন তখন নিতান্ত বালক। বাদশাহ আকবর শাহ একটি খোজা বালকের কথা কথাচ্ছলে বলেছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত আমীর-ওমরাহদের কাছে। কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ কয়েকজন বালক খোজা পৌঁছে গিয়েছিল বাদশাহের কাছে। তার মধ্যে বলবন একজন। বাদশাহ দেখে অনেক-গুলোর মধ্যে দুটিকে নির্বাচন করেছিলেন। বলবন আর পীর খাঁ। প্রায় সমবয়েসী

দুটি বালক।

উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে দুজনকে তুলে দেওয়া হয়েছিল। দেখানো হয়েছিল আদব-কায়দা। চেনানো হয়েছিল হারেমের অন্দিসন্ধি। ভাগ্যহীন দুটি বালক পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠেছিল। এক সঙ্গে ওঠা বসা, খাওয়া শোওয়া। টুকটাক কাজ। ইচ্ছে মত ঘুরে বেড়ানো।

বেশ চলছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে বলবনের কাছ থেকে পীর খাঁকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। পীর খাঁ চলে গিয়েছিল শাহাজাদা সেলিমের কাছে। শাহাজাদার কাছে স্থান হয়েছিল তার। একা হয়ে গিয়েছিল বলবন।

তবে প্রায়ই তাকে শাহাজাদার প্রাসাদে যেতে হ'ত। নানান অছিলায় তাকে সেখানে পাঠানো হত। পীর খাঁর কাছ থেকে নিয়ে আসতে হ'ত নানান খবর।

তারপর একদিন বাদশাহ আকবর মারা গেলেন। মসনদে বসলেন শাহাজাদা সেলিম। হলেন জাহাঙ্গীর। পীর খাঁ আর বলবন দুই বন্ধু আবার একসঙ্গে হল। কয়েক বছর পরে হারেমে এলেন বিধবা মেহেরউন্নিসা। বছর পার হতে জাহাঙ্গীর তাঁকে শাদী করলেন। মেহেরউন্নিসা হলেন নূরজাহান।

আর এর মধ্যে বলবন চলে এসেছে খুরমের কাছে। বন্ধু পীর খাঁ জাহাঙ্গীরের হারেমে। আর খুরমের সঙ্গে যখন নূরজাহানের বিরোধ চরমে সেই সময় নূরজাহানের রোষে অনেক হতভাগ্যকেই প্রাণ দিতে হয়েছিল। তাদের একমাত্র অপরাধ কোন-না-কোন সময় তারা খুরমের পরিচিত ছিল। তার মধ্যে একজন পীর খাঁ।

বাদশাহ আকবর থেকে সম্রাট শাজাহান। এখন মসনদে বাদশাহ আলমগীর। দীর্ঘ পথ। অসংখ্য বছর পার হয়ে গেছে একটি একটি করে। বালক বলবন বালক থেকে কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধ হয়েছিল।

শিশুকাল থেকে বিশালদেহী মানুষটা ছিল খালেদার মতই আমার আপনজন। মা আরজুমন্দবানু বেগম বলবনকে বড় বিশ্বাস করতেন। শুনেছি আব্বাজানও পছন্দ করতেন তাকে। এই সেদিন পর্যন্ত সে ছিল। সদা-সর্বদা সতর্ক প্রহরায় সে আমাকে আগলে রাখতো। আজ নেই। আজ.

না সেদিন। সেই প্রচণ্ড শীতের রাত্রি শেষে আমি যখন সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায়, আমাকে ডেকেছিল সে। আমাকে সে বেগম বলে ডাকতো।

আমি তার ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। আবছায়া অন্ধকারে দীর্ঘ দেহটার দিকে তাকিয়েছিলাম।

সে বলেছিল, আজ তোমার সূর্যোদয় দেখা বোধ হয় হল না বেগম!

বলেছিলাম, জরুরী কোন কথা বলবে কি?

—একবার তোমাকে নিচে যেতে হবে বেগম।

—নিচে নামতে ইচ্ছে করছে না।

—তবুও তোমাকে একবার যেতেই হবে।

তার কথার মধ্যে ব্যস্ততার ভাব ছিল। এমন সে করে না বড় একটা। বড় ধীর স্থির শান্ত বৃদ্ধ। কারণ কিছু বুঝতে পারি নি। কি এমন ঘটলো যার জন্যে বলবনের এই ব্যস্ততা। যাই ঘটে ঘটুক। সূর্যোদয় দেখা আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। বলেছিলাম, বুড়া, তুমি এখন যাও। আমি পরে যাচ্ছি।

সে বলেছিল পরে না, এখনই তুমি চল।

—আঃ, বুড়া, বড় জ্বালাও তুমি। বিরক্তি বোধ করেছিলাম। একটু গলা চড়িয়ে বলেছিলাম, দিন দিন কি যে হচ্ছে তোমার বুঝি না! যত দিন যাচ্ছে দেখছি, যখন যা বলো তখন তাই করতে হচ্ছে আমাকে। কেন এমন করো বলতো তুমি?

আমার তিরস্কারে বৃদ্ধ একটু ঝুঁকিয়ে ছিল তার মাথাটা। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, বেগম, আর বলবো না। শেষ বার তুমি আমার কথাটা শোন।

চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল আমার। মানুষ বৃদ্ধ হলে এমনিই হয়ে ওঠে! শিশুর মতোই না-ছোড়। শিশুর স্বরূপে আমার দেখা। বৃদ্ধের নাছোড় ভাব বলবনের ব্যবহারে পদে-পদে আমাকে বিব্রত করে। মাঝে মাঝে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। মুখে যা আসে বলে দিই। বারকতক দূর করে দিয়েছি। চলে গেছে। আপদ বিদায় হয়েছে ভেবে স্বস্তি পেয়েছি। কিন্তু দু-একটা দিন না কাটতেই মনটা খারাপ হয়েছে। অনুশোচনা জেগেছে। খোঁজ করেছি। সামনে এসে হাজির হয়েছে বৃদ্ধ শয়তান।

বলেছি, আবার এসে হাজির হলে যে?

উত্তর দিয়েছে খুঁজবে জানি বলেই তো যেতে পারি নি।

বলেছি, গেলেই পারতে।

—যাব তো বটেই। দেখবে একদিন হাজার ডেকেও সাড়া পাবে না। বলেছে বৃদ্ধ, মেহেরবান খোদার ডাকে চলে যাব যেদিন সেদিন তোমার ডাকে সাড়া কেমন করে দেব বেগম! যতদিন তিনি না ডাক দিচ্ছেন, ততোদিন তোমার ডাকে সাড়া দিতে বান্দা হাজির।

অদ্ভুত উত্তর। অশিক্ষিত খোজা। জীবনভোর খিদ্‌মত খাটতে খাটতে দিন গেছে। তবু দীর্ঘদিনের এমন সব কথা ওর মুখে শুনেছি যে চমকে উঠতে হয়েছে। ভেবেছি অনেক। কোথায়, কার কাছে এমন সব কথা শিখল? জীবনের কাছে কি?

সেদিন সেই রমজান মাসের ভোরে খোজা বলবনের না-ছোড় অনুরোধে একরকম রাগ করেই নিচে নেমেছিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণভাবে চমকে উঠেছিলাম। মাথাটা দুলে উঠেছিল। থরথর করে কেঁপে উঠেছিল সর্ব শরীর। আমি কি স্বপ্ন দেখছি। এ-কেমন করে সম্ভব!

সেই স্থির মূর্তি যেন বুঝতে পেরেছিলেন আমার অবস্থা। দ্রুত কাছে এসে

শক্ত করে আমার একটা হাত ধরে বলেছিল, কি হল রোশেনারা !

স্খলিত কণ্ঠে বলেছিলাম, আপা (দিদি), তুমি ?

জাহানারা আরো জোরে আমার হাতটা চেপে ধরেছিল।

২

জাহানারা। আমার দিদি। আরজুমন্দবানু বেগমের ছয় পুত্র-কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা ! বিস্মিতা আমি বহুক্ষণ কোন কথা বলতে পারিনি। আমার সমস্ত চিন্তা-শক্তি অবশ শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

দীর্ঘদিন আমি জাহানারাকে দেখিনি। ঔরংজীব পিতাকে বন্দী করার পর (১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) জাহানারা পিতার সঙ্গেই কারাগারে তাঁর স্থান করে নিয়েছিলেন। তারও অনেক আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। এমনকি বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

জাহানারা ধীর স্থির বুদ্ধিমতী। অনেক গুণের অধিকারিণী। আর আমি ? আমার বুদ্ধি কিছুই নেই। কি আছে, তাও কোন দিন চিন্তা করে দেখিনি। আমি নিজের খুশির খেয়ালে চলেছি। আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভেসেছি। বংশ-মর্যাদা, সম্ভ্রম কোন কিছুরই তোয়াক্কা করিনি কোন দিন। সেই ছেলেবেলা থেকেই।

অনেকেই আমাকে বহুবার বুঝিয়েছেন। বার বার নিষেধ করেছেন। আমি কারো কথায় কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করি নি। আমার ভেতরের বন্যতা বা সব কিছুকে অস্বীকার করার প্রবণতা অনেকের-ই বিরাগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং সেই কারণেই বোধ হয় সকলে অল্প বয়স থেকেই এড়িয়ে চলেছে। একদিন আবিষ্কার করেছি আমি একাকী—নিঃসঙ্গ।

শবনম, বিশ্বাস করো, জীবনে আমি কাউকে কোনদিন শত্রু ভাবিনি ; কারো অমঙ্গল কামনা করিনি কোন দিন। শুধুমাত্র আমার বাহ্যিক আচরণের জন্যে সকলেই আমাকে ভুল বুঝেছে, দূরে সরিয়ে দিয়েছে—আঘাত হেনেছে। আর তারই জন্য আমি দিন দিন জেদী একগুঁয়ে হয়ে উঠেছি।

সেই জন্যই সেই ছোটবেলা থেকে জাহানারা আমার সঙ্গে কোনদিন ভালো ব্যবহার করেনি। সস্নেহে কাছে ডাকেনি। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। সুন্দরী বুদ্ধি-মতী জাহানারা ছিল সকলের প্রিয় পাত্রী।

কিন্তু তার জন্য আমার মনে কোন দুঃখ, বেদনা, ক্ষোভ ছিল না। ছিল না হিংসা। আসলে সকলের কাছে ভাল হওয়া, ভালবাসা পাওয়া বা নিয়ম নিষ্ঠা-মেনে চলা আমার ধাতে ছিল না। ওসব নিয়ে কোন চিন্তা ছিল না আমার মনে।

তবু মাঝে মাঝে মনে হ'ত জাহানারা কত ভাল। কত ভালবাসে সকলে তাকে। হারেমের সকলে কত গুণগান করে তার। সে ভাল বলেই সকলের কাছে তার

সুখ্যাতি। কিন্তু সে নিজে তো একটু হেসে কথা বলতে পারে? কথা বললে কি তার ক্ষতি হবে বা ভালত্ব নষ্ট হয়ে যাবে?

বিশ্বাস করো, কত কি চিন্তা করতাম তখন। অন্ধকার রাত্রে একাকী শয্যায় শুয়ে শুয়ে বিনিদ্র প্রহর কাটাতাম। ভাবতাম, আমিও জাহানারার মত ভাল হবার চেষ্টা করিনি কেন। চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই আমার পরিবর্তন হবে। সকলে না হলেও কেউ-না কেউ আমাকে নিশ্চয়ই ভাল বলবে। ভালবাসবে। এখন যেমন সকলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা সেটা নিশ্চয়ই দূর হবে।

সে চেষ্টা করিনি যে কখনো তা নয়। বেশ কয়েক বার-ই চেষ্টা করেছি। কিশোরী রোশেনারা লাজুক-লাজুক ভাব করেছে। কেউ কিছু বললে মন দিয়ে শুনেছে। শান্ত স্বরে উত্তর দিয়েছে। উৎপাত কমিয়ে পাঠাভ্যাসে মন দিয়েছে। হারেমবাসিনীরা অন্ততঃ কটা দিন তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন কারণ খুঁজে পায়নি। বিশেষ করে বৃদ্ধার দল।

কিন্তু কদিন! দূরে-দূরে! এভাবে বেঁচে থাকা যায় নাকি? এ জীবন বিস্বাদ। প্রকাশ পেয়েছে স্বরূপ। ভাল হবার প্রতিজ্ঞা কোথায় ভেসে গেছে। যার যা হবার নয়, তা কি করে হবে? মেহেরবান খোদা তো অন্ধ নন। তাঁর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

আমি চলেছি আপন খেয়ালে। জাহানারা তর শান্ত সংযত জীবনযাত্রায়। আমাদের দূরত্ব ক্রমশঃ বেড়েছে। আমরা পরস্পরের কাছে ক্রমশঃ অপরিচিতা হয়ে উঠেছি। কখনো-কখনো অনেক দিন দেখাই হয়নি। আবার অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেলে পাশ কাটিয়ে চলে গেছি আমরা দুজন।

তারপর একদিন রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়েছি আমরা। আমি কিভাবে জড়িয়ে পড়লাম আজও বুঝে উঠতে পারিনা? কারণ ওই অভিশপ্ত মসনদের কথা আমার মনে কোন দিন স্থান পায়নি। তবুও আমি আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়ে পড়েছিলাম। স্বেচ্ছায় নয়, অজান্তে। আমার সরলতার, বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ছিলেন ভাইজান ঔরংজীব। আমাকে বদনামী করে দিয়েছেন। আমার মনটাকে দুঃখ-বেদনা, হতাশা-হাহাকারে ভরিয়ে দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস ভালবাসার অমর্যাদা করেছেন। আমাকে কান্নার সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছেন তিনি।

আমার জীবনের সব চেয়ে বড় বেদনা এজিন্দেগীতে আব্বাজানের সামনে গিয়ে কোন দিনই দাঁড়াতে পারলাম না। দীর্ঘ আট বছর তিনি শাহবুরুজ প্রাসাদে বন্দী ছিলেন। তাঁর স্নেহ-ভালবাসা জীবনে কম পাইনি। তিনি তাঁর সন্তানদের কম ভাসতেন না। তাঁর স্নেহ ছিল সকলের প্রতি সমান।

আমার দুরন্তপনার অভিযোগ তাঁর কানে নিশ্চয়ই পেঁছাতো। দ্বিপ্রহরে হারেমে এসে আহারাদির পর বিশ্রামের সময় কোন কোন দিন আমার খোঁজ করতেন। ডাক পড়তো আমার। গিয়ে দাঁড়াতাম। তিনি হয়তো তখন কারো সঙ্গে কথা বলছেন।

আমাকে দেখতে পেয়ে মৃদু হাসি মুখে মাথা নাড়তেন। তারপর এক সময় ডাকতেন, আও বেটী।

পায়ে পায়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম।

আয়ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসতেন। প্রশ্ন করতেন, ক্যা সমাচার?

—আচ্ছা।

—খানা খা লিয়া?

—জী।

উত্তর শুনে সেই আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখা আর মৃদু হাসি।

বলতাম, আপনে হমকো বোলায়া?

প্রশ্ন শুনে একটু দেখতেন তিনি। মুখে সেই মৃদু হাসি। বলতেন, নেহি তো।

—তব?

—তব ক্যা?

—বুড্ডা বোলা আপনে হমকো বোলায়া?

দ্বার পথে বুড়ো বলবন উঁকি দিত। তিনি হাসি মুখে কাছে টেনে নিতেন আমাকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলতেন, যাও বেটী।

চলে আসতাম। সব আক্রোশ পড়তো বলবনের ওপর।

স্নেহময় পিতা। অফুরন্ত ভালবাসা ছিল তাঁর হৃদয়ে। তিনি তাঁর প্রতিটি সন্তানকেই ভালবাসতেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য ছলনার জালে জড়িয়ে পড়ে তাঁর ভালবাসার মর্যাদা আমি রাখতে পারিনি। বন্দী পিতার কাছে ছুটে যেতে পারি নি।

জাহানারা স্বেচ্ছায় বন্দীনীর জীবন যাপন করেছে। পিতার সেবার ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। গত রমজান মাসে শাহবুরুজ প্রাসাদ থেকে আমার কাছে এসেছিলো। তাকে দেখে আমার সর্ব শরীর কেঁপে উঠেছিল। সে আমাকে ধরে ছিলো। এক সময় অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। স্খলিত কণ্ঠে বলেছিলাম, আপা, তুমি?

—হ্যাঁ, আমি। ধীর শান্ত কণ্ঠস্বর। বলেছিলো, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে রোশেনারা।

—কথা! আমি তার মুখের দিকে চেয়েছিলাম। ম্লান বিষণ্ন মুখ। যন্ত্রণায় জর্জরিত। বুকের মধ্যে একটু কষ্ট অনুভব করেছিলাম। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, তোমার কাছে একটা আর্জি নিয়ে এসেছি রোশেনারা।

—আর্জি।

—আমার বিশ্বাস তুমি পারবে।

—কি পারবো আমি?

—তুমি অনুরোধ করলে বাদশাহ নিশ্চয়ই না করবেন না।

—আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

জাহানারা আমার দিকে চেয়েছিল। মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, রোশেনারা, আব্বাজান অসুস্থ।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের মধ্যে আলোড়ন জেগেছিল। আব্বাজান অসুস্থ। নিশ্চয়ই অসুস্থতা এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে যার জন্য জাহানারা তার মান-সম্মান, দ্বিধাদ্বন্দ্ব সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছে। নিশ্চয়ই চিকিৎসার প্রয়োজনে। কিন্তু একটি কথাও আমি বলতে পারিনি। তীব্র অনুশোচনায় আমার অন্তরটা দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। লজ্জায় মাথা নত করেছিলাম আমি।

জাহানারা ডেকেছিল, রোশেনারা!

আমি নিথরভাবে বসেছিলাম।

শান্ত কণ্ঠে সে বলেছিল, রোশেনারা আব্বাজানের ইন্তেকালের আর বেশি দেরি নেই।

—আপা! আর্তচিৎকার বেরিয়েছিল আমার বুক ঠেলে।

জাহানারা আমার হাত ধরেছিল। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, শান্ত হও। আমার কথা শোন। ভুলে যাও অতীত। আমার ইচ্ছা আব্বাজানের মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ রাজকীয় মর্যাদায় যেন সমাধিস্থ হয়। তুমি বাদশাহ ঔরংজীবকে এই অনুরোধটুকু করো। আমার বিশ্বাস, তোমার অনুরোধ তিনি রাখবেন। তুমি কি…।

আমি দুহাতে তাঁর হাত চেপে ধরেছিলাম। কথা বলতে পারিনি। বুকের মধ্যে বড় কষ্ট হয়েছিল।

জাহানারা চলে গিয়েছিল।

জাহানারা চলে গেছে। আমি স্থির পাষাণের মত বসেছিলাম। আমার গৃহের প্রতিটি মানুষ অবাক হয়েছিল। সন্তর্পণে তাদের চলাফেরা দেখেছিলাম। বুঝতে পারছিলাম তারা সকলেই তটস্থ—কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। আমার সেদিনের আচরণ তাদের অপরিচিত। প্রতিদিন দুস্থ, সাহায্য প্রার্থিনী যারা আমার কাছে আসে, তাদের কাউকে তারা সেদিন আমার কাছে আসতে দেয়নি।

আমি কতকটা তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বসেছিলাম। আমি সব দেখছি, শুনছি কিন্তু করণীয় কি বুঝতে পারছি না। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল আব্বাজানের মুখখানা। ভারত সম্রাট শাহাজানের মুখখানা। হাসিখুশি স্নেহময় রূপ। কোন দিন তাঁর বিরূপ মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাঁর সম্পর্কে নানান কথা কানে এলেও তাঁকে কখনো কঠিন হতে দেখিনি। বাইরে কর্তব্য কর্মে যাই করুন না তিনি, হারেমে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন মানুষে পরিবর্তিত হতেন, স্নেহময় পিতা। কর্তব্যনিষ্ঠ স্বামী। সহৃদয় একজন মানুষ।

শুধু…। না সে ছবি আর আমার কাছে স্পষ্ট নয়। আমি তখন নিতান্ত বালিকা। আম্মাজানের মৃত্যুর পর তিনি নাকি উদ্‌ভ্রান্তের মত আচরণ করেছিলেন। প্রলাপ বকে ছিলেন। ত্যাগ করেছিলেন অন্নজল। যদিও সে সময় আমাদের তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। সিত্তীউন্নিসা সে সময় আমাদের আগলে রেখে ছিলেন।

আম্মাজানের স্মৃতি সৌধ তৈরি হয়েছিল। তাজমহল! তারপর?

না, তার পরের দিনগুলোর কথা আমি চিন্তা করতে চাইনা। কষ্ট হয় বড়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। দুঃস্বপ্নের রাত্রি শেষে নতুন দিনের সূর্য সোনালী স্বপ্ন নিয়ে আজও উদিত হলনা।

সম্রাট শাহাজানের কারাজীবনের কথা আমি জানি না। দীর্ঘদিন আমি তাঁকে দেখিনি। ভাইজানের কাছে শুনেছিলাম, শাহবুরুজ প্রাসাদে সম্রাটের স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত রকম ব্যবস্থা তিনি করেছেন।

তবু বলেছিলাম, ভাইজান, আব্বাজানকে আমাদের সকলের মধ্যে এনে রাখলে হয় না?

আমার কথা শুনে ঔরংজীব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা, আমিও তাই চেয়েছিলাম।

—আপনিও চেয়েছিলেন তাই?

— হ্যা, বহিন।

—তিনি আসতে চাইলেন না?

—না। হতাশভঙ্গি করেছিলেন ঔরংজীব। বলেছিলেন, আমার বিশ্বাস তাঁকে সকলের মাঝে আসতে দেওয়া হলনা।

—কে আসতে বাধা দিলেন তাঁকে?

—আমার বিশ্বাস শাহাজাদী জাহানারা। তিনি আব্বাজানের কাছে আছেন।

জানতাম না জাহানারা আব্বাজানের কাছে আছে। আমি অনেক কিছুই জানি না। জানার প্রয়োজন বোধ করিনি। তবে আব্বাজানের জন্য বড় কষ্ট হ'ত। ভাইজান তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থা করেছেন জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

ঔরংজীব বলেছিলেন, বহিন, আব্বাজানকে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা যদি তোমার হয়, আমাকে জানিও, আমি তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। আমার কাছে কোন সংকোচ কোর না। তুমি কি একবার দেখতে যেতে চাও তাঁকে?

প্রস্তাবটা শুনে একটু বিহ্বল পড়েছিলাম। সহসা কোন উত্তর দিতে পারি নি।

ঔরংজীব বলেছিলেন, বহিন, আব্বাজান আমাদের সকলের প্রিয়। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্যকে অস্বীকার করা উচিৎ নয়। সেই জন্যই আমি তাঁকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। হয়তো তিনি সম্মত হতেন। কিন্তু

শাহাজাদী জাহানারা তা চান না।

কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি মনস্থির করে ফেলেছিলাম। পিতা আমার প্রিয়। তাঁর জন্য আমার দুঃখ হয়। তাঁকে একবার দেখার জন্য মনটা ছট্‌ফট করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, একবার ছুটে চলে যাই তাঁর কাছে। তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলি, আব্বাজান, আপনার অসুস্থতার মধ্যে যে হানাহানি, রক্তপাত ঘটলো মসনদ নিয়ে, আমি তা চাইনি। আমি দূরে সরে ছিলাম। কিন্তু আমাকে দূরে থাকতে দেওয়া হয়নি। কৌশলে ঔরংজীব আমাকে জড়িয়েছিল। আমার জীবনটাকে কালিমালিপ্ত করে দিয়েছে। আমাকে অপরাধিনী করেছে। আপনি আমাকে শাস্তি দিন। আমি আমার অন্যায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

পারিনি। জাহানারা তাঁকে আগলে আছে। হয়তো তাঁর কাছে পেঁছানোর অনুমতি আমার মিলবে না।

অভিমান বুকে চেপে দূরে সরেছিলাম। কিন্তু দীর্ঘ সেই কটা বছর আমার জীবনে কোন ছন্দ ছিল না। আমার প্রাণ প্রাচুর্য একটু একটু করে নিঃশেষ হয়েছিল। ধীরে ধীরে আমি কেমন হয়ে উঠেছিলাম।

খালেদা বলতো, তোমার কি হয়েছে বলতো ?

উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকতাম।

খালেদা বলতো, কি হল, কথাটা কানে গেলনা বুঝি ?

বলতাম, কি বলি বলতো ?

—বলবে তো তুমি। ঝঙ্কার দিত খালেদা। আদিখ্যাতা কোর না বাপু। কি হয়েছে ঠিক ঠিক বলতো।

বলতাম, সত্যি আমার কিছু হয়নি।

—আলবাত হয়েছে। ধমকাতো খালেদা। বলতো, তোমাকে পেটে ধরিনি বটে, কিন্তু বুকে-কোলে করে মানুষতো করেছি। তোমার নাড়ি-নক্ষত্র সব আমার মুখস্থ। সত্যি করে বল কি হয়েছে তোমার।

খালেদাকে দেখতাম। আম্মাজানের সঙ্গে কিশোরী খালেদা মুঘল হারেমে এসেছিল। রূপ ছিলনা, ছিলনা চটক। লম্বা রোগা হাড় সর্বস্ব শরীর। কালো রঙ। সামনের দুটো দাঁত বেশ উঁচু। থাকার মধ্যে ছিল দুটো ডাগর কালো চোখ, এক মাথা কোঁকড়া চুল আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি। বিগত-যৌবনা খালেদা এখনও প্রাণ-প্রাচুর্যে পরিপূর্ণা।

চুপ করে থাকতে দেখে খালেদা হুঙ্কার দিয়েছিল, কি হল এভাবে চুপ করে [illegible] আমার কি কোন কাজ-কর্ম নেই ?

বলেছিলাম, কাজ যদি থাকে তো করো গিয়ে।

—তাহলে আমার কথার জবাব দেবে না ?

বলেছিলাম, তোমার কথার উত্তর আমার জানা নেই খালেদা।

শুনে অনেকক্ষণ চুপ করেছিল খালেদা। এক সময় বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল তার। কতকটা আত্মগতভাবেই সে উচ্চারণ করেছিল, মেহেরবান খোদার কি ইচ্ছে জানি না।

আমিও জানি না। পারিবারিক বিপর্যয়ের পর থেকেই দিন দিন আমি কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছিলাম। আমার জীবন-ধারা পরিবর্তিত হচ্ছিল। আমার চেতনা গভীর হচ্ছিল। অন্তর্মুখী হচ্ছিলাম আমি।

সেই ভাবেই পার হয়েছিল কটি বছর। এসেছিল সেই দিনটা। প্রচণ্ড শীতের সেই রাত্রি শেষ। যেদিন জাহানারা সাহায্যের আশায় আমার কাছে এসেছিল, প্রার্থনা জানিয়ে চলে গিয়েছিল।

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত আমি বসেছিলাম বহুক্ষণ। তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়েছিলাম এক সময়। উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কষ্ট হয়েছিল। মাথাটা যেন দুলে উঠেছিল। পায়ে জোর নেই। কোন রকমে দ্বিতলে নিজের কক্ষে গিয়ে শয্যায় বসেছিলাম। শুয়ে পড়েছিলাম এক সময়।

অনেকক্ষণ পরে কার ডাক শুনেছিলাম, বেগম!

চোখ মেলতে কষ্ট হয়েছিল। ডেকেছিলাম, ভেতরে এসো।

— এভাবে শুয়ে থাকলে চলবে বেগম?

উঠে বসতে গিয়েছিলাম! কে যেন ধরে ছিল আমাকে। খালেদা।

—তোমার যে এখন অনেক কাজ বেগম!

—অনেক কাজ! অস্ফুটে উচ্চারণ করেছিলাম।

—মনটাকে শক্ত করো বেগম।

—মন আমার শক্ত আছে।

—এবার উঠে বসো বেগম। আমার কথা শোন। জাহাঁপনার সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে হবে।

—আমার মনে আছে।

—তাহলে তৈরি হও। উঠে বসো। এভাবে শুয়ে থাকার সময় এটা নয়।

ঠিক যেন তীব্র কশাঘাত করেছিল। উঠে বসেছিলাম। বলবনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। বয়সের ভারে ন্যুব্জ দেহ। বলিরেখা কুঞ্চিত মুখ মণ্ডল। বকের পালকের মত চুল-দাড়ি। কিন্তু মুখে সেই মৃদু হাসি লেগে আছে।

বাদশাহ আকবর শাহের বালক বান্দা। আদরের সেখু বাবার ওপর গুপ্তচর বৃত্তির জন্য বাদশাহ দুটি খোজা বালককে সংগ্রহ করেছিলেন। কারণ বড় আদরের একগুঁয়ে খামখেয়ালী সুরাসক্ত পুত্রের জন্য মনে বড় ভয় ছিল বাদশাহের। উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। সেই জন্যই খোজা বালক দুটিকে সব রকম সংবাদ সংগ্রহের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। সর্বত্র অবাধ গতি ছিল দুটি বালকের। বাদশাহ সব সংবাদ পেতেন। আজ একজন আছে।

ধীরে ধীরে উঠে বসেছিলাম। প্রশ্ন করেছিলাম, আমি কি করবো বুড়া।

—জাহাঁপনার সঙ্গে দেখা করবে।

—কিন্তু আমার মন বলছে...।

বাধা দিয়েছিল বলবন। বলেছিল, ওসব কথা এখন থাক।

বলেছিলাম, বেশ। তুমিও যাবে।

গিয়েছিলাম। বাদশাহ আলমগীর, ভাইজান তখন দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করেছিলেন। বিশ্রাম বলতে, শুয়ে বসে কখনো সময় কাটান না তিনি, সব সময় কোন-না-কোন কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তা যত তুচ্ছ কাজ হোক না কেন। দেখতে পেয়েছিলাম, তিনি বসে টুপি সেলাই করছেন।

পদশব্দে চোখ তুলে একবার চেয়েছিলেন তিনি। মৃদু হাসির একটা সূক্ষ্ম রেখা তাঁর ওষ্ঠে ফুটে উঠেছিল। আহ্বান জানিয়েছিলেন, এসো বহিন। বসো।

আমি আসন গ্রহণ করেছিলাম।

হাতের কাজটুকু অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ করছিলেন। বলেছিলেন, কেমন আছো ?

—ভাল আছি।

—লেকিন তোমাকে দেখে তা মনে হচ্ছে না।

—কি মনে হচ্ছে আপনার ?

—জরুর তোমার কিছু হয়েছে।

কি বলবো জহুরির চোখ! হয়তো তাই। প্রবাদ ঔরংজীব মানুষের ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পান। হবে হয়তো। মুখতো মনের আয়না। তবু শেষ চেষ্টা করেছিলাম, তবিয়ৎ ঠিক আছে ভাই জান্।

—ভাল। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন তিনি। এবার ঠাণ্ডা বড় বেশি। সাবধানে থেকো। আচ্ছা বহিন তোমার সেই বুড়ো বান্দাটার কি খবর ?

বলেছিলাম, বলবন আমার সঙ্গে এসেছে।

—বহুৎ উমর হল। শাহানশা আকবর শাহকে দেখেছে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর সম্রাট···। হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিলেন তিনি।

বলেছিলাম, শাজাহান আর বাদশাহ আলমগীর। চার পুরুষ।

—হ্যাঁ তাই। মৃদু কণ্ঠস্বর তাঁর। চিন্তা করলে আশ্চর্য হতে হয়

—শাহাজাদী জাহানারা আজ এসেছিলেন। বলেছিলাম আমি।

—জানি। সময়েই খবর পেয়েছি। বলেছিলেন তিনি।

—তিনি কিছু আর্জি নিয়ে এসেছিলেন আমার কাছে।

বাদশাহ আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

—আব্বাজানের ইন্তেকালের দেরি নেই।

—সম্রাট জিন্দা আছেন।

—সে কথা তিনিও বলেছিলেন।

—তবু?

একটু চিন্তা করেছিলাম। ধীর কণ্ঠে বলেছিলাম, আপার ইচ্ছা, সম্রাটের শেষ কাজ যেন যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে হয়। সেই মতো অনুমতি আপনি দেবেন।

বাদশাহ আলমগীরকে চিন্তিত দেখিয়েছিল। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুমিও কি তা চাওনা বহিন?

—আমি?

—আমারও তাই চাওয়া উচিৎ। সম্রাটের শেষ কাজ যথাযোগ্য মর্যাদাব সঙ্গেই হওয়া উচিৎ। আমারও সেই ইচ্ছাই আছে।

—আমি কি তাঁকে সে কথা জানিয়ে দেবো?

—নিশ্চয়ই জানাবে। ইচ্ছা করলে তুমি নিজে গিয়ে জানিয়ে আসতে পারো। জানবে, তোমাব কোন কাজে আমি কখনো বাধার সৃষ্টি করবো না।

কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠেছিল আমার।

ফিরে এসেছিলাম। সকাল থেকে বুকের মধ্যে যে পাষাণ ভার চেপে বসেছিল, সেটা অনেক হালকা হয়ে গেছে। নিশ্বাস নিতে যে কষ্টটা বোধ করছিলাম সেটা আর ছিল না। দিনটা শেষ হয়েছিল। রাত্রি নেমেছিল। শীতের রাত্রি। অনেক দিন পরে সে রাত্রে সুখনিদ্রা হয়েছিল।

ঘুম ভেঙ্গে ছিল প্রতিদিনের মতই। স্নান শেষে নমাজ পাঠ করেছিলাম। গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম পূবের বারান্দায়। পাখিদের ডাক শুনেছিলাম। দুচোখ ভরে দেখেছিলাম সূর্যোদয়।

নিচে নেমে এসে সকালের নাস্তা করেছিলাম। প্রতিদিনের মত বাইবের কক্ষে গরীব-দুঃখীদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় খালেদা বলেছিল, আজও তোমার দেখা করা হবে না।

—কেন? ওর মুখের দিকে চেয়েছিলাম।

খালেদা আমার হাতে জাহানারার সংক্ষিপ্ত পত্রখানা তুলে দিয়েছিল। জাহানারা আমাকে একবার যাবার জন্য লিখেছে।

গিয়েছিলাম। সেই প্রথম আর সেই শেষ। শাহবুরুজ প্রাসাদের দ্বিতলে সম্রাট শাজাহানের কক্ষে যখন প্রবেশ করেছিলাম সে কক্ষ তখন সূর্যের আলোয় আলোকিত। জীর্ণ শয্যায় শায়িত কঙ্কালসার এক বৃদ্ধ। শিয়রে স্তব্ধ পাষাণ প্রতিমার মত বসে আছে শাহাজাদী জাহানারা।

তারপর!

ধন্য তুমি বাদশাহ আলমগীর। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে সম্রাট শাজাহানের মৃত্যুর পর যোগ্য সমারোহে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হবে। সে কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলাম. ভাইজান, আপনিই তো আমাকে বলেছিলেন আব্বাজানের ইন্তে-

কালের পর তাঁর মৃতদেহ যোগ্য সমাদরে সমাধিস্থ করা হবে ?

তিনি বলেছিলেন, আমি ঠিক কথাই বলেছিলাম বহিন ।

—তাহলে ? জানতে চেয়েছিলাম আমি ।

—তাহলে কি বহিন ? প্রশ্ন করেছিলেন তিনি ।

—আমাদের আত্মীয়-পরিজন যাঁরা আছেন, শাহবুরুজে তাঁদের প্রবেশ অধিকার বন্ধ করেছেন কেন ?

মৃদু কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, প্রয়োজন আছে ।

অধৈর্য কণ্ঠে বলেছিলাম, কিন্তু কি সে প্রয়োজন ?

আমার কণ্ঠস্বরে বাদশাহ ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন । কি যেন চিন্তা করেছিলেন তিনি । এক সময় বলেছিলেন, বহিন তুমি শান্ত হও । আমাদের আত্মীয় যাঁরা আছেন, তাঁরা মৃত সম্রাটকে দেখে এসে কি করতেন, না, নিজেদের মধ্যে সমালোচনার ঝড় তুলতেন । আমি জানি সকলকে খুশি করা সম্ভব নয় । আব্বাজানও নিশ্চয়ই তা পারেন নি । তাঁর মৃত্যুতে সকলে ব্যথিত একথা তুমিও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না । সেই জন্যই আমি প্রবেশাধিকার বন্ধ করেছি ।

অকাট্য যুক্তি । আমি কথা বলতে পারি নি ।

তিনি বলেছিলেন, যোগ্য সমাদরেই আমি আব্বাজানের শেষ কাজের ব্যবস্থা করবো ।

নিজের গৃহে ফিরে এসেছিলাম । মনে হয়েছিল শাহবুরুজে যাই । আপার কাছে থাকি । যাই নি । যেতে ইচ্ছে করেনি । কেন যেন মনে হয়েছিল আমার, সম্রাট শাজাহানের মরদেহ রাজোচিত সমারোহে সমাধিস্থ হবে না ।

হয়েছিলও তাই । রাত্রির অন্ধকারে প্রাসাদের প্রাচীর ভঙ্গ করে আব্বাজানের মৃতদেহ কয়েকজন অজ্ঞাতনামা খোজা আর বান্দা তাজমহলের দিকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল । জাহানারা মৃত আব্বাজানের পারলৌকিক মঙ্গলার্থে কিছু অর্থ পথে দরিদ্র-ফকিরদের দেবার জন্য দিয়েছিলেন । বাদশাহ ঔরংজীব সে অর্থ দিতে দেননি ফকির-দরিদ্রদের । তাঁর যুক্তি বন্দীর কোন অর্থ নাই, ভিক্ষাদানের অধিকারও নাই, বন্দীর অর্থ-সম্পদ বাদশাহের প্রাপ্য । শুধু বাদশাহ ঔরংজীব অনুগ্রহ করে সম্রাট শাজাহানের মৃতদেহ আম্মাজান মমতাজের সমাধির পাশে সমাধিস্থ করার অনুমতি দিয়েছিলেন ।

তারপর !

৩

শবনম, বিশ্বাস করো, সেই রাত্রিটাকে আমার দুঃস্বপ্নের রাত্রি বলে মনে হয়েছিল । দিনভর অভুক্ত । ক্লান্ত-অবসন্ন দেহ মন । মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে

গিয়েছিল। বুকের মধ্যে কান্নার কুণ্ডলীটা বার বার পাক দিয়েছিল। কিন্তু কাঁদতে পারিনি।

মনে পড়েছিল দীর্ঘদিন আগের আম্মাজানের মৃত্যুর দিনটাকে। শৈশবের আবছা স্মৃতি। বেগম মমতাজ মহলকে মৃত্যুর পর বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। কি প্রশান্ত।

সিত্তীউন্নিসা আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা ভাই-বোনেরা শেষ দেখা দেখেছিলাম তাঁকে। তিনি আবার আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। খালেদা আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিল। আমি তার বুকে মুখ লুকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলাম।

অতীতের সেই স্মৃতি সেদিন রাত্রে বার বার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। কিন্তু কাঁদতে পারিনি আমি। আমি মুখ লুকাতে চেয়েছিলাম। কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় আমার অন্তরটা দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্রাট শাজাহানের বন্দী জীবনের জন্য আমিও তো পরোক্ষভাবে দায়ী। আমার অপরাধের তো শেষ নেই।

পার হয়েছিল কটা দিন। স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছিল কিছুটা। খবর রাখতাম জাহানারার। সে শাহবুরুজ প্রাসাদেই আছে। বাদশাহ ঔরংজীব নাকি তাকে জানিয়েছেন, তিনি শাহাজাদীর স্বাধীনতায় কখনই হস্তক্ষেপ করবেন না। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সব প্রয়োজন তিনি সাধ্যমত পূরণ করার চেষ্টা করবেন। শাহাজাদী যেন তাঁকে ভুল না বোঝেন।

সব সংবাদই আমার কাছে পৌঁছাতো। চিন্তা করতাম, কিছু একটা করা উচিৎ। কি করি বুঝে উঠতে পারতাম না।

একবার মনে হ'ত একবার যাই। গিয়ে দেখা করি।

পারতাম না।

যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। পার হয়েছিল রমজান মাসের বাকি দিনগুলো। এসেছিল শওয়াল (মাঘ মাস)। হিম আর কুয়াশার দিন। শরীরটা কদিন থেকেই বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না। একটু জ্বর-জ্বর ভাব। সমস্ত শরীরে ব্যথা। একটা অবসাদ। আহারে রুচি ছিল না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধহীন। খালেদা হেকিমের দাওয়াই খাওয়ার কথা বলেছিল। গা করিনি। মনে হয়েছিল দু'চার দিন একটু বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে।

সারল না। জ্বরে পড়লাম। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড কাশি। হেকিমের দাওয়াই খেতেই হল।

খালেদা বলল, তুমি কোন দিনই কথা শুনলে না। সেই বচপন থেকে একগুঁয়েমী করে নিজে জ্বললে, আমাকেও জ্বালালে।

নিজে জ্বললাম! খুব সত্যি কথা বলেছিল খালেদা। চিরদিন আমি জ্বলেছি। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছি। বঞ্চনার আগুনে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হয়েছি। সকলেই

আমাকে অবহেলা করেছে। দূরে ঠেলে দিয়েছে। একটু সহানুভূতি—একটু স্নেহের আশ্বাস আমি পাইনি।

শুধু আব্বাজান একটু প্রশ্রয় দিতেন। আমার বিরুদ্ধে অজস্র অভিযোগ। তিনি হাসি মুখে এড়িয়ে যেতেন। সেই ছিল আমার একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু আব্বাজানের মৃত্যুর পর থেকে দিনে দিনে পাল্টে যেতে লাগলেন তিনি। আমাদের বড় একটা খোঁজ-খবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করতেন না।

প্রাচুর্যের অভাব কোন দিন হয় নি। কিন্তু জীবনে প্রাচুর্যটাই কি সব? স্নেহ মায়া মমতার কি কোন মূল্য নেই?

দারিদ্র যে কি জিনিস জানি না। শুনেছি দারিদ্র্য জীবনের অভিশাপ। দারিদ্র্য মনুষ্যত্বকে নিঃশেষ করে দেয়।

কিন্তু প্রাচুর্যও তো মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায় না। লোভ লালসা হিংসা মুঘল বংশকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে? এ বংশের শেষ কোথায়?

শবনম। আমার এই সব কথা যখন পড়বে তখন হয়তো তোমার মনে হবে আমি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো তুমি। এসব কথা আমার বুকের মধ্যে তুফান জাগায়। এলোমেলো অজস্র চিন্তা ইদানীং আমার মাথার মধ্যে ঘোরা-ফেরা করে।

আব্বাজানের মৃত্যুর পরও এই রকম হয়েছিল আমার। কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল আমার কেউ নেই। আমি একা।

সেই সময়, আমার সেই বুখারের অলস একদিন সময় মধ্যাহ্নে যখন চুপ করে বসেছিলাম, বলবন এসে ছিল আমার কাছে। ইদানীং খুব একটা দেখা যাচ্ছিল না তাকে। খালেদার কাছে তার খোঁজ করলে শুনতাম, বুড়োটার ভীমরতি হয়েছে। কখন কি করে, কোথায় থাকে অনেকেই জানতে পারে না।

সেদিন বলবন এসে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখেছিলাম।

সে বলেছিল, কেমন আছো বেগম?

বলেছিলাম, এখন ভাল আছি। শুনলাম তুমি ভাল নেই।

—কোন বোলা? জানতে চেয়েছিল সে।

বলেছিলাম, কাকে যেন তোমার কথা জিজ্ঞাসা করতে সে বললে তুমি নাকি ভাল নেই। কি হয়েছে তোমার বুড়া?

—আমার তো কিছু হয়নি।

আমি তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। সে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল। বলেছিলাম সত্যি করে বলো বুড়া তোমার কি হয়েছে?

—কিছু হয়নি আমার। মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল সে।

—সচ বলছো?

উত্তরে কিছু বলতে পারে নি সে। মাথা নিচু করে নিয়েছিল।

একটু অপেক্ষা করেছিলাম আমি। তাকে সময় দিয়েছিলাম। এক সময় বলেছিলাম, তুমি কিছু বলবে?

মাথা নেড়েছিল সে।

--বল।

—বেগম।

—বল বুড়া।

সে বলেছিল, কাজটা বোধহয় ঠিক করনি তুমি।

--কি! চমকে উঠেছিলাম আমি।

—হ্যাঁ বেগম। মৃদু কণ্ঠে সে বলেছিল, শাহাজাদীর আর্জি নিয়ে জাহাঁপনার কাছে গিয়েছিলে ঠিক আছে। লেকিন, তারপর বাদশার ইন্তেকালের পর তোমার যাওয়াটা ঠিক হয়নি।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যে একটা শিহরণ বয়ে গিয়েছিল আমার। জাহানারার অনুরোধে আমি ঔরংজীবের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সম্রাট শাজাহানের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধি যেন রাজোচিত মর্যাদায় সম্পন্ন হয় তার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। সেটা ছিল জাহানারার অনুরোধ। কিন্তু আব্বাজানের মৃত্যুর পর আমি নিজেই গিয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম ঔরংজীব পছন্দ করেন নি আমার দ্বিতীয় বারের যাওয়া। আর বলবন নিশ্চয়ই এমন কিছু জেনেছে যার জন্যে সে আমাকে সতর্ক করতে চায়।

এর আগেও সে অনেকবার আমাকে সতর্ক করেছে। অনেক অঘটন এড়াতে পেরেছি তার কথা শুনে। শুধু মসনদ নিয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সময় নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারি নি। সে কিন্তু আমাকে অনেক আগেই সাবধান করেছিল।

বলেছিল, বেগম তুমি আগে থেকে হুঁশিয়ার হও।

হাসি মুখে সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিসের হুঁশিয়ারী তুমি আমাকে দিচ্ছো বুড়া?

—তা জানি না। তবে আমার মনে হচ্ছে তোমার সাবধান হওয়া উচিৎ। শাহাজাদা এতো ঘন ঘন তোমাকে পত্র পাঠাচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না।

—আব্বাজান অসুস্থ। সেই সংবাদ তিনি তাঁর পত্রে আমার কাছে জানতে চান।

—আর কিছু?

—আর? শুনে রাগ হয়েছিল আমার। একটু গম্ভীর ভাবেই বলেছিলাম, এবার যে পত্র ভাইজান পাঠাবেন তোমাকে পড়তে দেব।

শুনে করুণ হয়েছিল বলবনের মুখ। বলেছিল, আমি তো পড়তে জানি না বেগম।

—তা আমি জানি। কঠিন গলায় বলেছিলাম, ভাইজানের পত্র নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

—আমার যে বড় ভয় করছে বেগম।

—কিসের ভয় ?

—মনে হচ্ছে একটা ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে মসনদ ঘিরে।

—কে বললে একথা ?

—কেউ বলেনি আমাকে। মুখটা করুণ হয়েছিল তার। মৃদু গলায় বলেছিল, আমি এর আগেও দেখেছি। আমি বুঝতে পারি। তুমি সাবধান হও বেগম। আমার মনে হচ্ছে তোমাকেও জড়ানো হচ্ছে এর মধ্যে। তুমি তোমার ভাইজানের সব পত্রগুলো আবার পড়ে দেখো।

—লেকিন, একটা পত্রও আমার কাছে নেই।

—একটাও নেই ? কি হল ?

—পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলেছি।

—সে কি। তুমি পুড়িয়ে ফেললে কেন ?

কেন পুড়িয়ে ফেলেছিলাম সে কথা বলতে পারি নি। ভাইজানের নির্দেশ। চুপ করেছিলাম।

সে বলেছিল, এখন কি করবে বেগম ?

উত্তরে বলেছিলাম, বুড়া তুমি যা ভাবছো তা নয়।

—তবে কি ? কাতর গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল সে।

—তোমার ধারণাটা মিথ্যা, ভুল।

—মিথ্যা—ভুল ! সে মাথা নেড়েছিল। চলে গিয়েছিল নিঃশব্দে।

আর সেদিন বলবনের কথা না শোনার ফলে সত্য সত্যই আমি ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম। আমাকে জড়ানো হয়েছিল। আজ মনে হয়, চেষ্টা করলেও আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারতাম না।

দরবারের আমীর ওমরাহ ক্ষমতাবানের দল নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝেন না। তাঁদের পরিবারের বিবি কন্যা আর আত্মীয়রা হারেমে আসেন। হারেমের মেয়েদের তাঁরা বিভক্ত করেন। তাই করেছিলেন তাঁরা। বড় আপন সেজে আমাকেও সেই চক্রান্তের জালে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। বান্দা বলবনের সাধ্য কি আমাকে দূরে সরিয়ে রাখে !

যেদিন শেষ হল সেই হানাহানি, বলবনের সামনে দাঁড়াতে লজ্জা করেছিল আমার। সেও এড়িয়ে চলেছিল আমাকে দীর্ঘদিন। একদিন তার মুখোমুখি হয়েছিলাম। বলেছিলাম, বুড়া আমি ভুল করেছি।

সে বলেছিল, ও বাত ছোড় দিজিয়ে।

বলেছিলাম, তোমার কথা আমার শোনা উচিৎ ছিল বুড়া।

সে বলেছিল, আমি বান্দা।

—আমি বদনামী হয়ে গেলাম বুড়া। কঁকিয়ে উঠেছিলাম আমি।

—নসিব বেগম।

—লেকিন তুমি আমাকে সাবধান করেছিলে।

সে চুপ করেছিল।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি কি করে জানতে পেরেছিলে বুড়া।

—মেহেরবান খোদার দোয়ায়।

—সচ বলো বুড়া।

সে কথা বলেনি। বুঝতে পেরেছিলাম, স্ব-ইচ্ছায় কোন কথা না বললে কিছুই জানা যাবে না। সেই শিশুকাল থেকে মানুষটাকে দেখে আসছি। অদ্ভুত প্রকৃতি। সহজ সরল হাস্যময়। আবার কখনো গম্ভীর নিরাসক্ত। আবার কখনো কখনো কোথায় যে আত্মগোপন করে সে সময় তাকে খুঁজে বার করা মুস্কিল হয়ে ওঠে। যেন ইচ্ছা করে হারিয়ে যায়।

দরবার থেকে হারেম অবধি গতি ছিল বলবনের। বান্দা হলেও সে ছিল মুক্ত। বাদশাহ ঔরংজীবও তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন নি। কারণ সে ছিল মুঘল পরিবারের অতি বৃদ্ধ বান্দা। আর তার বিরুদ্ধে কখনো কোন অভিযোগ ওঠে নি।

আব্বাজানের মৃত্যুর পর সে আমাকে আবার সাবধান করেছিল।

বলেছিলাম, আমি কি করবো বুড়া?

—শোচ।

—চিন্তা করতে আর পারছি না আমি। আমার মনে হচ্ছে কোথাও পালিয়ে যাই।

—ডরসে।

—না, জীবনের ভয় আমার নেই।

—তব্?

—জিন্দেগীটার ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। এ জীবন আমি চাইনি।

—আমিও চাই নি বেগম।

—কি চাওনি তুমি?

—এই খোজা বান্দার জীবন। খোদা তো আমাকে সুস্থভাবেই দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। আদমীর লোভ আমাকে থাকতে দিল না। লেকিন, এও তো সেই মেহেরবান খোদার মর্জি। আমার নসিব। বাদশাহ জাহাঙ্গীর আমাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুই মুক্ত। তোর যেখানে ইচ্ছা চলে যা। যাই নি। কেন যাইনি জানো, খোদার বিশাল দুনিয়ায় খোজার কোন জায়গা নেই, যদি যেতাম লোভের শিকার হয়ে দাস বাজারে বিক্রী হতাম আবার। সেই জন্যই নিশ্চিন্ত আশ্রয় ত্যাগ করি নি।

বলেছিলাম, আমার যাওয়া আটকাচ্ছে কোথায়?

—আটকাচ্ছে।

—কেন?

—ভুলে যাচ্ছ কেন তুমি নিজের পরিচয়ের কথা।

সত্য তাই। পথ অবরুদ্ধ। আমি সাধারণ নারী নই। সম্রাট শাজাহানের কন্যা আমি। আমার ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার খুব একটা মূল্য নেই। আমি ইচ্ছে করলেই সব কিছু করতে পারি না। ঠিক যেন সোনার দাঁড়ে বসা একটা কাকাতুয়ার মত। পায়ে আটকানো শিকল। দেখতে সুন্দর কিন্তু মজবুত। ইচ্ছে করলেই পাখিটা যাতে ধারালো ঠোঁটে কাটতে না পারে।

মুঘল বংশের কন্যাদেরও সেই অবস্থা। দাঁড়ের পাখি। মহামতি বাদশাহ আকবর শাহ এই রীতির প্রবর্তক। তিনি আমাদের দাঁড়ের পাখি বানিয়ে গেছেন।

ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা পুরুষ। উদার প্রজাবৎসল। হিন্দু মুসলমান ছিল তাঁর চোখে সমান। কিন্তু বংশের কন্যাদের বিবাহ তিনি নিষিদ্ধ করে গেছেন। কারণ মসনদের দাবীদারের ঝামেলা এড়াতে চেয়েছেন! তাতে দু-দশটা শাহাজাদী জীবনভোর জ্বলে পুড়ে মরে তো মরুক না। কি এমন ক্ষতি হবে তাতে।

অবশ্য সম্পদের ব্যবস্থা করে গেছেন। সেই ব্যবস্থাই চলছে। রাজস্বের একটা অংশ পাই। সম্পদের শেষ নেই আমাদের। মণি মুক্তা হীরা জহরৎ অজস্র। সেই যেন খাও পিও জিও।

বলবন বলেছিল, কি হল চুপ করে রইলে কেন বেগম?

বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল! বলেছিলাম, মাঝে মাঝে মাথাটা বড় গরম হয়ে ওঠে বুড়া।

—দিমাক ঠিক রাখো বেগম!

—কোশিশ তো করি!

—করে যাও। ঔর…

—আর কি বুড়া?

—হুঁশিয়ার সে চল না।

—কেন বল তো?

—কিছুই বুঝতে পারছো না?

চিন্তা করেছিলাম। বলেছিলাম, সত্যি আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বলবন বলেছিল, বেগম, তোমার এখানে যারা খিদ্‌মদ খাটে তোমার কি মনে হয় সকলে তোমার লোক?

—কেন নয়। বলেছিলাম, অনেক দিন তো রয়েছে সকলে। আমিই তো সকলের দেখভাল করি।

—তবুও সকলে তোমার লোক নয় বেগম।

—একথা বলছো কেন তুমি?

—আমি যে জানি বেগম। আমি দেখেছি।

?

—তোমার লোকেরা জাহাঁপনার চরের কাজ করে। প্রতিদিন এখানকার সব খবর তাঁর কাছে পেঁছায়। তুমি কখন নিদ্ থেকে উঠলে। তারপর থেকে দিনভর কি করলে সব খবর জাহাঁপনা জানতে পারেন। তুমি যা কর না এমন কথাও হয়তো তাঁকে জানানো হয়। আগেও জানানো হ'ত, এখন আরো বেশি করে জানানো হয়।

সর্বনাশ। চমকে উঠেছিলাম। বলেছিলাম, লেকিন তুমি যা বলছো আমার তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না।

—তুমি বিশ্বাস নাও করতে পার। যা সত্যি আমি তাই বললাম।

—তুমি জানো কে একাজ করে ?

—এক জনতো নয়, বেশ কয়েকজন করে।

—তুমি তাদের জানো ?

—জানি বেগম।

—তুমি প্রমাণ করতে পারবে, এখানকার সব খবর ভাইজানের কাছে পেঁছে দেওয়া হয়।

—হাঁ বলো আমি তাদের কজনকে ধরে আনতে পারি।

—ধরে আনতে পার ? কথাটা শুনে শিউরে উঠেছিলাম। যারা আমার কাছে কাজ করে প্রায় সকলেই দীর্ঘদিন আছে। দীর্ঘদিনে তাদের কাজে কোন রকমের অবহেলা-ত্রুটি পাইনি। আমি বিশ্বাস করি তাদের। তবু তারা একি করছে ? কেন করছে বলেছিলাম, বুড়া একাজ তারা কেন করে ? অর্থের জন্য ?

—শুধু অর্থ নয় বেগম। আরো কিছু আছে।

—আর কি বুড়া ?

বলবন যেন একটু ভেবেছিল। আমাকে দেখেছিল। বলেছিল, গরীবের জানের ভয়টা বড় বেশি বেগম। দারিদ্র্য জীবনের অভিশাপ। গরীব সেই অভিশাপ মুক্তির পথ খোঁজে সব সময়। হতাশ হয়ে ভাগ্যের দোহাই দেয়। অর্থের প্রলোভনকে এড়ানো বড় কঠিন। তার চেয়েও প্রাণের দায় যে বড় বেশি। কে বেঘোরে প্রাণটা দেয় বলতো ? সকলের কথা বাদ দাও, আমিই কি দেব !

বলেছিলাম, এর মধ্যে তোমার কথা আসছে কেন ?

—নিজেকে বাদ দিই কেমন করে ?

—তোমার কাছে তাহলে .

বাধা দিয়ে বলবন বলেছিল, আমার কাছে তেমন কোন প্রস্তাব আসেনি। না আসার কারণ আমার উমর। আমি খরচের খাতায় চলে গেছি।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সেটা কি ?

—সেটা ? মুচকি হেসেছিল বলবন। বলেছিল, সকলেই মনে করে আমি কবরের দিকে পা বাড়িয়ে আছি।

—আর তুমি নিজে ?

—আমি কিছু ভাবিনা বেগম। কি হবে মিথ্যে ভেবে। তুমিই বল, জিন্দেগীতে খোদাতালার দয়ায় তো কম দেখলাম না। আদমী এই আছে, এই নেই। কি দাম আছে এ জিন্দেগীর ? আমি নিজের কাজ করে যাই। অনেকে আমার উমর নিয়ে দিল্লাগী করে। বলে, কবে কবরে যাবি বুড়া। হেসে তাদের বলি, কাল যাব। লেকিন, সেই কাল আর আসে না। কবরে যাবার সময় এলে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। আর কবরে যাবার ভয়ে বেতমিজের দল বুরা কাম করছে। সোচ মত। স্রিপ হুঁশিয়ার হও। দিল খুলো না কারো কাছে। আদমী দুশমন হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। ওই সব জেনানারা যারা খাপসুরত সেজে তোমার কাছে হেসে হেসে আসে, তোমার সহেলীর দল, ওদের কাছে হুঁশিয়ার।

কথাগুলো শেষ করে আর দাঁড়ায়নি বলবন। নিজের মনে গজ গজ করতে করতে চলে গিয়েছিল। আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল।

আমার বান্ধবীদের সম্পর্কে সাবধান করেছিল বলবন। কিন্তু আমার বন্ধু কোথায়। বিশ্বাস করো শবনম, জীবনে বন্ধু পেলাম না। আমীর ওমরাহের স্ত্রী এবং কন্যারা, যারা এক সময় জেনানা মহলে লাইন দিত, তারা যে সকলেই খারাপ বা ভাল বলবো না। তাদের মধ্যে সকলেরই যে কোন-না-কোন ধান্দা ছিল তাও নয়। কেউ আসতো নিজের খসম আর ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। কেউ সাজ-পোষাক দেখাতে বা হারেমের অমুক বেগম, অমুক শাহজাদীর সঙ্গে তার দোস্তী একথা আত্মীয়-পরিজন, পরিচিতদের মধ্যে জাহির করতে। আবার কেউ বা দায়ে পড়ে। হারেমে বাদশাহের জেনানাদের সঙ্গে পরিচিত না হওয়াটা যেন গুণাহের মধ্যে না পড়ে।

কদিনের অসুস্থতার মধ্যে ঝামেলা কম পোহাতে হয়নি। সংবাদ পেয়ে শুভার্থিনীর দল ঠিক হাজির। সমবেদনা, আরোগ্য কামনার বন্যা বইয়ে দিয়ে-ছিলেন তাঁরা। সুন্দরী এক ওমরাহ-বিবি বলেছিলেন, জানেন শাহাজাদী আপনি অসুস্থ শোনার পরই রোজ নামাজের সময় আপনার জন্য খোদার কাছে দোয়া মাগি। খোদাকে বলি শাহাজাদীকে শীঘ্র শীঘ্র আরাম করে দাও। তাঁর কঠিন বিমার তুমি সারিয়ে তোল খোদা। তাঁর মুখে হাসি ফোটাও।

সব পারি, ভনিতা সহ্য করতে পারি না। বলেছিলাম, খোদা আপনার মঙ্গল করুন।

তিনি কাতর কণ্ঠে বলেছিলেন, বিশ্বাস করুন শাহাজাদী, আমি শুধু আপনার মঙ্গল চাই। খোদার দোয়ায় জলদি আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন। শুনেছি, আপনার জন্যে জাহাঁপনাও খুব চিন্তিত। শুনলাম, দু একদিনের মধ্যে তিনি নাকি আপনাকে দেখতে আসছেন।

বলেছিলাম, কোথায় শুনলেন ?

—আমাদের উনি বলছিলেন। কার কাছে যেন শুনে এসেছেন।

—নিজে শোনেন নি তিনি ?

—না—না, ঠিক তা নয়। উনি তো এখন খুবই ব্যস্ত। জাহাঁপনা ওঁকে বাঙ্গলায় পাঠাচ্ছেন। কাজকর্ম সব তো বুঝে নিতে হচ্ছে। বাঙ্গলায় তো অনেক দায়-দায়িত্ব। আমার ইচ্ছে দিল্লীতেই থাকি। বলুন না, এখানে আছি বলেই না আপনাকে দেখতে আসতে পারলাম। বাঙ্গলায় চলে গেলে সেটা কি সম্ভব হ'ত ?

বলেছিলাম, খুব সত্যি কথা বলেছেন।

—তাহলেই বুঝে দেখুন। তিনি বলেছিলেন, আমি আমার খসমকে বললাম, দেখুন, শাহাজাদী অসুস্থ। এখন আমি রোজ তাঁর আরোগ্য কামনায় নামাজ পড়ছি। তিনি যতদিন না সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠছেন, ততক্ষণ আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। খসম বললেন, তাহলে উপায় ? বললাম, খোদা নিশ্চয়ই একটা পথ করে দেবেন। শাহাজাদীর জন্য নামাজ পড়ছি একথা শুনলে নিশ্চয়ই তিনি আমার ব্রত ভঙ্গ হতে দেবেন না। আপনি বলুন শাহাজাদী আমি আমার খসমকে ঠিক বলিনি ?

শুনে কিছুই বুঝতে বাকি থাকেনি। কি নির্লজ্জ তোষামোদ। স্বার্থসিদ্ধির জন্য খোদার দোহাই দিতেও দ্বিধা করছেন না মহিলা। নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কারণেই বাদশাহ মহিলার স্বামীকে সুদূরে বাংলায় পাঠাচ্ছেন। মহিলা এসেছেন আমার দ্বারা তাঁর স্বামীর বদলি রুখতে। তাঁর কাছে শাপে বর হয়েছে আমার অসুস্থতা।

মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি ক ওয়াক্ত নামাজ পড়েন ?

অম্লান বদনে তিনি বলেছিলেন, পাঁচ ওয়াক্ত শাহাজাদী। আমি খুবই নিষ্ঠাভরে নমাজ পাঠ করি। খুব ছোট বেলা থেকে আমি নামাজ পাঠ করছি। শুনলে হয়তো বিশ্বাস হবে না আপনার। নানা আমার নামাজ পাঠ দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, বিলকিস, একটা কথা তোমাকে বলছি শুনে রাখ, তুমি কখনো কারো জন্যে যদি খোদার কাছে প্রার্থনা করো খোদা নিশ্চয়ই তা পূর্ণ করবেন। নানা আমার খুব বড় ফকির ছিলেন। পরবর্তীকালে দেখেছি, তাঁর কথা কত সত্য। সেই জন্যই তো আপনার জন্য আমি খোদার কাছে প্রার্থনা করলাম শাহাজাদী।

কিন্তু নামাজ পাঠের কোন চিহ্ন আমার চোখে পড়েনি। যদিও বিলকিস বিবি উগ্র প্রসাধনে সজ্জিতা ছিলেন। বলেছিলাম, বাদশাহ কবে যেন আমাকে দেখতে আসবে বলছিলেন ?

একটু চিন্তা করে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, উনি বলছিলেন জাহাঁপনা একদিন আসবেন। ঠিক দিনটা উনি আমাকে বলতে পারেন নি।

মৃদু হেসে বলেছিলাম, আমার কথা তাহলে দরবারে আলোচনা হয় ?

বিলকিস বিবি একটু থতমত খেয়েছিলেন। বলেছিলেন, দেখুন ঠিক দরবারে নয়। উনি জাহাঁপনার খুবই ঘনিষ্ঠ এক ওমরাহের কাছে শুনেছেন। তিনি আমার খসমের ছোট বেলার দোস্ত।

— আপনার খসমের দোস্ত বাঙ্গলায় বদলিটা আটকাতে পারলেননা ?

—বদলিটা আটকানো ! তিনি একটু চুপ করেছিলেন। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, শাহাজাদী, বিশ্বাসী লোকেরা দুশমনী করে আমার খসমকে চোর সাজিয়েছে। সেই জন্যই···

—লেকিন আমি কি করতে পারি ? প্রশ্ন করেছিলাম।

—আপনি আমার খসমের বদলি রদ করুন শাহাজাদী। বাঙ্গলায় গেলে ভুখা মরতে হবে। চোখ দুটো ছল্ ছল করে উঠেছিল তাঁর। বলেছিলেন, ইচ্ছা করলে আপনি তা পারেন। আপনার কথা জাহাঁপনা নিশ্চয়ই শুনবেন। এটুকু দয়া আপনি আমাকে করুন শাহাজাদী। বিলকিস বিবি আমার দুটো হাত চেপে ধরেছিল।

একজন চোরের জন্য বাদশাহের কাছে দরবার করা। মনটা তিক্ততায় ভরে গিয়েছিল। আগে কারো জন্যে বাদশাহের কাছে অনুরোধ যে জানাইনি তা নয়। গুরুতর অপরাধে অপরাধী না হলে ভাইজান আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন। আর হুঁশিয়ার করে বলেছেন, বহিন একটা কথা তোমাকে বলছি, হুঁশিয়ার থাকবে, এই আমীর ওমারাহের বিবি বাচ্চাগুলো এক একটা কেউটে সাপ। এরা নিজেদের স্বার্থের জন্য সব পারে। নোকরী করে, মাইনে পায়, যে মাইনে পায় তাতে খানদানী বজায় রাখা যায় না। চুরি করে, ঘুষ নেয়। ধরা পড়লে নোকরী যাতে ছুটে না যায় সেই জন্যই হারেমে এসে দোস্তী করে রাখে তোমাদের সঙ্গে। বিপদের দিনে যাতে তোমরা বাঁচাতে পার।

বলেছিলাম, চোরগুলোকে পুষে রেখেছেন কেন ভাইজান ?

—চোরতো পুষে রাখিনা বহিন। তিনি বলেছিলেন, চোর বনে যায়। আচ্ছা আদমী দুচার মহিনা পরেই পাকা চোট্টা।

—তাহলে বলছেন, দরবারের সকলেই চোর ?

—না সকলে নয়। আচ্ছা আদমীও আছে। চোর জাদা। আর কম হলেও আচ্ছা আদমীর জন্যই দুনিয়ার কাম কাজ চলছে। দরবারের কাম কাজও।

বিলকিস বিবিকে বলেছিলাম, সে সাধ্য আমার নেই।

তিনি বলেছিলেন, জরুর আছে।

—আপনি ভুল করছেন। সত্য কথাই বলেছিলাম, একদিন আমার সে ক্ষমতা ছিল অস্বীকার করছি না। লেকিন, এখন কোন ক্ষমতাই আমার নেই।

—সচ ? বিস্মিতভাবে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন।

— মিথ্যে বলে লাভ কি ?

—লেকিন···একটু দ্বিধাগ্রস্ত দেখিয়েছিল তাঁকে। তিনি বলেছিলেন, আমি শুনেছি আপনার অনেক ক্ষমতা।

—অনেক ক্ষমতা আমার ? শুনে হাসি পেয়েছিল। বলেছিলাম, আমার অশেষ ক্ষমতার কথা কার কাছে শুনেছেন আপনি ?

বিলকিস বিবি যাঁর নাম করেছিলেন তিনি আমার পরিচিতা। কিছুটা স্নেহও তিনি আমাকে করেন আমি জানি। বলেছিলাম আপনি ভুল শুনেছেন। উনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন বলেই একথা বলেছেন আপনাকে। দেখা হলে তাঁকে আমার সালাম জানাবেন। আপনার জন্য কিছু করতে পারলাম না বলে ক্ষমা করবেন। কারণ, বাদশাহকে আমি কথা দিয়েছি।

ম্লান মুখে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন।

আমি চিন্তা করেছিলাম নিজের কথা। অনেকে ভাবে আমার অসীম ক্ষমতা, কিন্তু আমি জানি আমি নিজে কি? কোন ক্ষমতাই আমার নেই। কোনও দিন ছিল না। চাইনিও। মিথ্যা ক্ষমতার মোহে আমি কোন দিনই লালায়িত হইনি। রমজান মাসের আগে, সম্রাট শাজাহান যখন জীবিত ছিলেন তখন ভাইজান আমার কিছু কিছু অনুরোধ যে রাখেন নি তা নয়, কিন্তু তারপর থেকে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হয়তো তার জন্য আমিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। কিন্তু আমি তো কোন অন্যায় করিনি। যা করেছিলাম ঠিক করেছিলাম। তাতে বাদশাহ আলমগীর যদি আমার ওপর বিরূপ হয়ে থাকেন, আমি নাচার। আমি আমার কর্তব্য করেছিলাম।

আর আজ?

৪

শবনম, এ পত্র তোমার হাতে কোন দিন পৌঁছাবে কি-না জানি না। সমস্ত কথা আমি লিখে রেখে যেতে চাই। আমার জীবনের স্বীকারোক্তি।

আমি কি ভুল করেছিলাম! অন্যায়? ভালবাসা কি পাপ?

কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণের সেই আবেগ উচ্ছ্বাসের দিনতো কবেই শেষ হয়ে গেছে। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে পঙ্গু মন। তবু বসন্তের হাওয়া এসেছিল। দোলা জেগেছিল জীবনে, শরীরের শিরা উপশিরায়. সমস্ত সত্তায়। শবনব, আমি ভালবেসেছিলাম।

বাদশাহ ঔরংজীবের সেই বিধ্বস্ত মূর্তিটা আজও আমার চোখের সামনে ভাসে। করুণ আকুতি ঝরে পড়েছিল তাঁর কণ্ঠ থেকে, বহিন, এ তুমি কি করলে?

আমি তাঁর প্রশ্নের কোন উত্তর দিইনি।

তিনি বলেছিলেন, তুমি আমার চরম সর্বনাশ করলে।

সর্বনাশ? জানিনা। শুধু জানি আমার ভালবাসা একটা মহান আদর্শকে রক্ষা করেছে। জীবন আমার আজ কানায় কানায় ভরা। অতীতের সব গ্লানি ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেছে। আমি আজ তৃপ্ত। সার্থকতায় পরিপূর্ণ।

সেই জন্যই আজকের এই বন্দিনী জীবন। দুঃখ নেই। হতাশার অন্ধকার কেটে গেছে। অপেক্ষা করে আছি আগামী দিনের জন্য। ভাবছি বাদশাহ আলমগীর এবার আমাকে নিয়ে কি করবেন।

এল জাহানারা। বিশ্বাস করতে পারিনি। মনে হয়েছিল, জেগে স্বপ্ন দেখছি বোধ হয়।

খালেদা এসে আবার তাড়া লাগিয়েছিল, কি হল তোমার? তুমি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছো যে?

বলেছিলাম, খালেদা সত্য আপা এসেছে?

—আমি কি মিথ্যে বলছি?

—তা নয় খালেদা। আমি ভাবছি, এমন দিনে কেন সে এল?

—তার কাছে গেলেই সে কথা জানতে পারবে। বলেছিল খালেদা।

—সে কোথায় খালেদা? জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

—বসার ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন।

—দাঁড়িয়ে আছেন? তুমি কি তাকে বসতে বলনি?

—নিশ্চয়ই আমি তাঁকে বসতে বলেছি।

—তাহলে আপা দাঁড়িয়ে আছে কেন? আচ্ছা খালেদা··

—বল।

—আপা তো এখানেও আসতে পারে। পারে না? নিশ্চয়ই পারে। তুমি গিয়ে তাকে এখানে আসবার কথা বলবে। না থাক, আমিই যাচ্ছি। আচ্ছা…

—কি? খালেদা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

—আচ্ছা খালেদা আজ আমি এতো কথা বলছি কেন বলতো? জানতে চেয়েছিলাম খালেদার কাছে।

খালেদা উত্তর দেয়নি। মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম, কষ্ট পাচ্ছে সে। আমার জন্য বড় কষ্ট খালেদার।

আমারও কষ্ট হয়েছিল। জাহানারার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কেমন যেন ভয় করছিল আমার। অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

আমাকে দেখেছিল জাহানারা। অনেকক্ষণ। আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। অখণ্ড নীরবতা। সে নীরবতা সেই ভঙ্গ করেছিল। তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম, তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছো রোশনী।

এ যেন আম্মাজানের কণ্ঠস্বর। তাঁর সেই স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর দীর্ঘদিন পরে ধ্বনিত হয়েছিল জাহানারার কণ্ঠে। রোগা আর রুগ্ন ছিলাম আমি। টুকটাক প্রায়ই ভুগতাম। যখন সুস্থ থাকতাম দুষ্টুমি করতাম। আমার জন্য ব্যতিব্যস্ত হ'ত হারেমবাসিনীর দল। বিশেষ করে বর্ষিয়সী মহিলারা। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিলনা তাঁদের। তিতি বিরক্ত আম্মাজান শাসন করার জন্য ডাকতেন। কিন্তু আমাকে দেখে তাঁর রাগের মুখে বেদনায় ভরে যেত। কাছে টেনে নিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে বলতেন, রোশনি, তুই অনেক রোগা হয়ে গেছিস।

জাহানারার কণ্ঠেও সেই প্রতিধ্বনি। আমি অনেক রোগা হয়ে গেছি। উত্তরে

একটি কথাও বলতে পারিনি। নীরবে তার মুখের দিকে চেয়েছিলাম।

জাহানারা বলেছিল, আমাকে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেছো, তাই না বহিন?

মাথা নেড়েছিলাম। জানিয়ে ছিলাম সত্যই আমি আশ্চর্য হয়েছি।

ম্লান একটু হাসির সূক্ষ্ম রেখা জাহানারার ওষ্ঠে ফুটেই মিলিয়ে গিয়েছিল। বলে ছিল, রোশেনারা আমরা দুজনে কি দুজনের দুশমন?

প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে ছিলাম আমি। বলেছিলাম, খোদা কসম। জীবনে আমি একটি মুহূর্তের জন্যও তোমাকে দুশমন ভাবিনি।

—আমিও তাই। বলেছিল জাহানারা। আমিও তোমাকে দুশমন ভাবিনি বহিন। বিশ্বাস করো। তোমার আচার আচরণ আমি পছন্দ করতাম না। সেই ছেলে বেলা থেকে। দেখতাম, তুমি একগুঁয়ে, জেদী! হারেমের রীতি-নীতি মানো না। শাসনের তোয়াক্কা করোনা। সব কিছুকে অস্বীকার করো। বাইরে থেকে যেসব বাঁদীরা কাজ করতে আসতো হারেমে তাদের সঙ্গে আসা বাচ্চাদের সঙ্গে দিনের পর দিন খেলা করছো। তাদের সঙ্গে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছো এখানে ওখানে। মুখে তোমার অশ্লীল কথাবার্তা। পরনে নোংরা পোষাক, গায়ে ধুলো ময়লা। তোমাকে দেখলে কে বলবে তুমি সম্রাট শাজাহানের কন্যা। বংশ-মর্যাদা, আভিজাত্য ধুলায় লুটিয়ে দিতে তুমি। কারো শাসন, বাধা মানতে না! সেই জন্যই তোমাকে এড়িয়ে চলতাম। সিত্তীউন্নিসা, যিনি আমাদের ছোটবেলার অভিভাবিকা ছিলেন, তাঁর কাছে পর্যন্ত অভিযোগ করতাম।

একটু চুপ করেছিল জাহানারা। বলেছিলাম, আজ ওসব কথা থাকনা আপা!

জাহানারা বলেছিল, সত্যি বহিন, আজ এ সমস্ত কথার কোন প্রয়োজন নেই। হয়তো ভাবছো, এতদিন পরে আজ এসব কথা কেন বলতে এলাম। কি প্রয়োজন। না, কোন প্রয়োজন-ই নেই। রোশেনারা, দীর্ঘদিন আমি নির্জনে তোমার কথা চিন্তা করেছি। আম্মাকে তোমার কথা বললে তিনি উত্তর দিতেন, রোশনিকে নিজের মতো থাকতে দাও। আব্বাজানকে বলেছি। তিনি মৃদু হেসে বলতেন, মালুম হোতা লেড়কী ডাকু বনেগা জরুর। ওকে শাসন করা দরকার। সিত্তীউন্নিসা বলতেন, বহিন তোমাদের বংশের ধারা পেয়েছে। চিন্তা কোর না। ভালভাবে জ্ঞান হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আদব-কায়দা, আড়ম্বর, ঐশ্বর্য ওর ভাল লাগে না। আমি ওকে অনেক ভাবে দেখেছি। আর, ওর মনটা বড় স্পর্শকাতর, স্নেহের কাঙাল। সিত্তীউন্নিসার কথা শুনে অবাক হতাম। বুঝতে পারতাম তিনিও তোমাকে প্রশ্রয় দেন। তাই নিজেকে আমি গুটিয়ে নিয়েছিলাম। আর···

থেমেছিল জাহানারা। আমি তার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম।

আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছিল জাহানারা। বলেছিল, আরো শুনতে চাও?

লজ্জা পেয়েছিলাম। বলেছিলাম, কথাগুলো যেন স্বপ্নের মত।

—জীবনটাও যদি স্বপ্নের মত হোত। একটু চুপ করেছিল সে। কি যেন

ভেবেছিল। বলেছিল, আমি তোমার কাছে কেন এসেছি তা তো জানতে চাইলে না।

—কেন এসেছো? জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি।

—আমি হয়তো চলে যাব। বলেছিল সে। যাবার আগে বাদশাহের কাছে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়েছিলাম। বাদশাহ আলমগীর অনুমতি দিয়েছে। তুমি কি করবে রোশেনারা?

—আমি? ভেবেছিলাম। বলেছিলাম, আমি কি করি বলতো আপা?

—তুমি কি কিছু চিন্তা করনি?

- লাভ কি মিথ্যে চিন্তা করে। বলেছিলাম, বাদশাহ যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। আর আমি যা করেছি, তার মধ্যে কোন অন্যায় নেই।

—মহব্বতের জন্য তুমি ঠিকই করেছো বহিন।

মহব্বতের জন্য? জাহানারার কথা শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলাম, তুমি ভুল করলে আপা। আমি যা করেছি তা শুধু মহব্বতের জন্য নয়। আমার ভালবাসাকে আমি অস্বীকার করছিনা। আমি ভাল বেসেছিলাম। দেশ আর মানুষের প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ মানুষটিকে আমি অন্তর দিয়ে ভাল বেসেছিলাম আপা। সে ভালবাসায় আসক্তির পরিবর্তে ছিল শ্রদ্ধা। যখন শুনলাম, প্রাণ সংশয় হবে জেনেও তিনি দেশ আর দশের জন্য আলমগীরের দরবারে এসেছিলেন। এসেছিলেন শান্তির প্রত্যাশী হয়ে। শুনে অন্তর আমার কাণায় কাণায় আবেগে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আমিও তো হিন্দুস্থানের একজন। আমারও তো করণীয় কিছু আছে। সেই জন্যই নিজের বিপদ জেনেও তাঁর মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছিলাম। আমি কি কোন অন্যায় করেছি আপা?

জাহানারা কথা বলেনি। নিঃশব্দে আমার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়েছিল। দুজনেই স্তব্ধ নির্বাক হয়ে বসেছিলাম। বাইরে অগ্রহায়ণের দ্বিপ্রহর। মৃদু স্বরে পাখি ডাকছে।

অনেকক্ষণ পরে হেসে ফেলেছিলাম আমি। নিজের মনেই হেসেছিলাম।

জাহানারা বলেছিল হাসছো কেন?

বলেছিলাম, আমি কি স্বার্থপর দেখছো! তুমি এলে। বলছো, চলে যাবে। কেন যাবে? কোথায় যাবে?

জাহানারা বলেছিল, আমি বড় ক্লান্ত রোশেনারা। শাহবুরুজে আব্বাজানের অসংখ্য স্মৃতি দিন-রাত্রি আমার পিছনে ফিরছে। ভেবেছিলাম জীবনের বাকি দিনগুলো বুকে আঁকড়ে ওখানেই পড়ে থাকবো। আর পারছি না। ভাবছি সিক্রীতে চলে যাব। বাদশাহ অনুমতিও দিয়েছেন।

সিক্রী। ফতেপুর সিক্রী। মূর্ত হয়ে উঠেছিল অতীত।

দিল্লীর মসনদে তখন শাহানশাহ আকবর শাহ। মুঘল-সাম্রাজ্যের বনিয়াদ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে হিন্দুস্থানের বুকে। তাঁর সুশাসনে অরাজকতা দূর হয়েছে

কিছুটা। হিন্দু মুসলমানকে মৈত্রী বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। নিজে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন রাজপুত জাতির সঙ্গে। হিন্দুদের দরবারে উচ্চপদে নিয়োগ করেছেন।

বাদশাহ আকবরের সব আছে। নেই বংশধর। দিনরাত্রি অসংখ্য যন্ত্রণা তাঁর বুকের মধ্যে। যদিও প্রথম জীবনে তাঁর দুটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল, হাসান আর হোসেন। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে অকালে প্রাণ হারিয়েছিল তারা।

তারপর থেকে বাদশাহের বেগম মহলে বন্ধ্যার দিন শুরু হয়েছিল। না, বেগমরা বন্ধ্যা ছিলেন না। গর্ভবতী হতেন, পুত্র কন্যা প্রসব করতেন যথাসময়ে, কিন্তু তাদের আয়ু ছিল বড় কম। একদিন-দুদিন বা দু একমাস, তার পরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তারা। আবার কেউ কেউ মৃত সন্তানও প্রসব করে। হেকিমের দাওয়াই, ঝাড়ফুক মাদুলী তাবিজে কোন কাজ হয় না। হারেমের শিশু মৃত্যু রোধ করতে পারে না কোন শক্তিই।

বাদশাহের চোখে ঘুম নেই। সন্তানের আশায় তখন তিনি ঘন-ঘন আজমীরে যান। সেখানে বিখ্যাত সব সাধু ফকিরের বাস। বাদশাহ তাঁদের কাছে দোয়া চাইলেন। প্রণামী দিয়ে ভরিয়ে দিতে লাগলেন তাঁদের। কিছুতেই কিছু হল না। শেষে রাজকার্য মাথায় ওঠার উপক্রম। বাদশাহ সাধু ফকিরের সন্ধান পেলেই সব কাজ ফেলে ছোটেন।

এভাবে কিছুদিন কাটার পর বাদশাহের কাছে খবর এল রাজধানী থেকে মাত্র আঠারো ক্রোশ দূরে সিক্রী গ্রামে একজন ফকির আছেন, তাঁর নাকি অনেক ক্ষমতা। বহু দূর দূর থেকে গরীব-দুঃখীর দল তাঁর কাছে যায়। ফকির বড় উগ্রমেজাজী, মন-মেজাজ যখন ভাল থাকে, মাটির মানুষ। গরীব-দুঃখীদের কথা শোনেন, তাদের উপকার করেন। কিন্তু মেজাজ চড়া থাকলে তাঁর কাছে এগোয় সাধ্য কার। দিনের পর দিন মানুষকে ঘোরান। আর মজা এমনি, এমন বিশ্বাস মনে, নাছোড় হয়ে মানুষ ফকিরের কৃপা লাভের জন্য পড়ে থাকে।

শুনলেন বাদশাহ। ভাল করে সব সংবাদ সংগ্রহ করলেন। তারপর একদিন হাজির হলেন সিক্রীতে সেলিম চিশ্তির কুটিরে।

বাদশাহ আর তাঁর সঙ্গের লোকজন দেখে ভয় পেয়ে গেল সাধারণ মানুষ। ফকির তখন বাইরে বসে মানুষের কথা শুনছিলেন। দূর থেকে বাদশাহকে দেখতে পেয়ে উঠে ঘরে চলে গিয়েছিলেন। বাদশাহ পৌঁছাতে ভয়ে সাধারণ মানুষ স্থান ত্যাগ করেছিল।

সেদিন বাদশাহ ফকিরের দেখা পাননি। ফকির বাদশাহের সঙ্গে দেখা করেননি। গিয়েছিলেন আবার। না, দেখা মেলেনি। প্রমাদ গণেছিলেন বাদশাহ আকবর শাহ। গোপনে সংবাদ নিয়ে জেনেছিলেন প্রায় প্রতি দিনই সকালে এবং সন্ধ্যায় ফকির কুটির থেকে বাইরে বেরোন। মেজাজ ভাল থাকলে মানুষের সুখ-দুঃখের

কথা শোনেন, তাহলে তিনি ফকিরের দেখা পাচ্ছেন না কেন?

বাদশাহের লোক ফকিরের চেলাদের কাছে খোঁজ-খবর নিয়েছিল। তাদের নির্দেশ মত বাদশাহ এবার সাধারণ মানুষের একজন হয়ে ফকিরের কুটিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। দেখা পেয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন মনের বাসনার কথা।

শান্ত কণ্ঠে ফকির বলেছিলেন, ম্যায় খোদাকে বান্দা। কিছু করি সে ক্ষমতা আমার কোথায় শাহেনশা? তুমি খোদার দরবারে আর্জি জানাও। তিনি নিশ্চয়ই তোমার আর্জি শুনবেন।

চমকে উঠেছিলেন বাদশাহ। অন্যবার রাজপোষাকে এসে ফকিরের দেখা পাননি। সাধারণ পোষাকে এসেও ফকিরের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেননি! করুণ কণ্ঠে আকুতি জানিয়েছিলেন বাদশাহ আকবর শাহ। শক্তি সম্পদের অভাব নেই তাঁর। নেই শান্তি-সুখ। তাঁর অবর্তমানে কে বসবে মসনদে।

বাদশাহের আকুতিতে ফকিরের মন গলেছিল। বলেছিলেন, বাদশাহ, বিলাসিতার জীবন থেকে কষ্টের সংসারে এসে থাকতে পারবে কি তোমার কোন বেগম। যদি কেউ পারে তাকে সন্তান জন্মের কিছু দিন আগে এখানে এনে রেখে যেও। তবে জানিয়ে দিও, বাদশাহী খানা সে এখানে পাবে না, লেকিন দাল রোটী জরুর মিলবে।

দিল্লীতে ফিরে এসেছিলেন বাদশাহ আকবর শাহ। রাজধানী তখন দিল্লীতে। বহু অর্থব্যয়ে আগ্রার প্রাসাদ তখন তৈরি হচ্ছে। অম্বর-রাজ কন্যা, বিহারীমলের বোন মীর-উজ-জমানী (যোধবাঈ), তাঁর বেগমদের মধ্যে সব চেয়ে প্রিয়। তিনি তাঁকেই ফকিরের প্রস্তাব জানিয়ে ছিলেন। এক কথায় রাজি বেগম। যোধবাঈ গর্ভাবস্থায় সিক্রীতে সেলিম চিস্তীর আশ্রয়ে চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই যথা সময়ে জন্ম হয়েছিল পুত্র সন্তানের। সেলিম চিস্তীর দয়ায় পুত্র সন্তানের নাম রাখা হয়েছিল সেলিম। বাদশাহ আকবর সেলিম চিস্তীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ফতেপুর সিক্রীতে সেলিম চিস্তীর পণ কুটির বেষ্টন করে অপূর্ব নগর পরিকল্পনা করেছিলেন। একে একে তৈরি হয়েছিল রাজপ্রাসাদ, বেগম মহল, হিরণমিনার, বীরবল ভবন, সেলিম চিস্তীর শুক্তি মুক্তার মসজিদ এবং ইবাদৎখানা (প্রার্থনা গৃহ)।

জাহানারা সেই সিক্রীতে গিয়ে জীবনের বাকী দিনগুলো কাটাতে চায়। বাদশাহ অনুমতি দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপা কবে যাবে তুমি?

জাহানারা বলেছিল, ইচ্ছা, খুব শীঘ্র যাব।

—তুমি কি একাই যাবে?

—একটু চিন্তা করেছিল সে। আমাকে একবার দেখেছিল। মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, আমি তো একাই বহিন।

সত্যই তাই, জাহানারা আজ বড় একা। নিঃস্ব-রিক্ত। অথচ একদিন জাহানারার দাপটের অন্ত ছিলনা। অন্তরালে থেকে রাজনীতি পরিচালনা করেছে। বড় ভাই

দারা জাহানারার কথাতেই চলতেন। আব্বাজানও তার মতামতের মূল্য দিতেন। সে সময় আমীর ওমরাও, রাজ্যের উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীর বিবি এবং আত্মীয়ার দল সব সময় জাহানারাকে খুশি রাখার চেষ্টা করতেন। শুনেছি, নানান অছিলায় মূল্যবান উপহার সামগ্রী তুলে দিতেন। জাহানারার কোন আপত্তিই তাঁরা কখনো গ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। পরবর্তীকালে সেই তাঁরাই জাহানারার সমালোচনায় মুখর হতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি।

সংসারে মানুষ কত তাড়াতাড়ি স্বরূপ পরিবর্তন করতে পারে দেখে আশ্চর্য হয়েছি। মানুষ চেনা বড় কঠিন কাজ। মুখ আর মুখোশে কোন তফাৎ নেই।

এই মুখোশ আমি আজও পরতে পারলাম না। কৃত্রিম অভিনয়ে বড় ঘেন্না আমার। ছলনা করতে আজও আমি শিখলাম না। আর সেই জন্যই জীবনে আমি এত দুঃখী! আমার একমাত্র অভিমান কেউ আমাকে বুঝল না।

জাহানারা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। চলে যাবে। ডাকলাম, আপা!

—বল।

তুমি আগ্রা ছেড়ে চলে যাবে, শুধু এই কথা বলার জন্যই কি বাদশাহের অনুমতি নিয়ে আমার কাছে এসেছো?

আমি যে এভাবে সোজাসুজি প্রশ্ন করতে পারি একথা বোধ হয় চিন্তা করতে পারেনি সে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটু দ্বিধাগ্রস্ত দেখিয়েছিল তাকে। এক সময় বলেছিল, না বহিন, ঠিক তা নয়।

—তুমি কি ভিন্ন কিছু আসা করে এসেছিলে?

—আশা। মাথা নেড়েছিল। বলেছিল, আমাকে ভুল বুঝনা বহিন। আগ্রা ছেড়ে চলে যাব একথা অনেক দিন থেকেই চিন্তা করছিলাম। মন স্থির করতে পারছিলাম না। কারণ দীর্ঘ সময় আগ্রার আকাশ বাতাস জল বায়ু ধূলিকণা পর্যন্ত জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। কত মধুর এবং তিক্ত স্মৃতি। ছেড়ে চলে যাব বললেই কি যাওয়া যায়! দ্বিধায় দ্বন্দ্বে দুলছিলাম। শেষকালে তোমার জন্যেই মন স্থির করতে পারলাম।

—আমার জন্যে! বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলাম আমি।

—হ্যাঁ বহিন। দৃঢ় কণ্ঠে সে বলেছিল, আমি তোমাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে চাই। ঔরংজীবকে আমি চিনি। আমাদের ছয় ভাই-বোনের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর। তার অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী, আয়ত চক্ষুদ্বয়, মৃদু সুন্দর বাচনভঙ্গি। কিন্তু তার মন? সে বোধ হয় নিজেকেও বিশ্বাস করে না। সন্দেহের দোলায় দিবা-নিশি দোলে তার মন। সন্দেহ তাকে সময় সময় কঠিন ভয়ংকর করে তোলে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায় সে। আজ সে তোমাকে গৃহবন্দিনী করে রেখেছে। কাল তোমাকে নিয়ে সে যে কি করবে তা সে নিজেও জানে না। সেই জন্যই আমি তোমাকে নিজের কাছে রাখতে চাই। আমি সে কথা তাকে জানিয়েছি। সে

জানিয়েছে আমি যদি রাজি থাকি, তার কোন অমত নেই।

স্পষ্ট হয়েছিল জাহানারার আগমনের কারণ। আমাকে তার নিজের কাছে রাখতে চায়। আব্বাজানকে যেমন সে দীর্ঘ আট বছর আগলে রেখেছিল, আমাকেও ঠিক সেইভাবে বাদশাহ ঔরংজীবের রোষ থেকে আগলে রাখতে চায়। কিন্তু...

মৃদু কণ্ঠে বলেছিলাম, আপা, মৃত্যুর ভয়ে তুমি আমাকে পালিয়ে যেতে বলছো?

—না বহিন, তা নয়। মাথা নেড়েছিল সে। বলেছিল, পালিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে রোধ করা যায় না একথা আমিও জানি, বিশ্বাস করি।

—তাহলে?

কাছে এসে আমার দুটো হাত সে তার শীর্ণ দুই হাতের মধ্যে তুলে নিয়েছিল। গভীর আর্তকণ্ঠে সে বলেছিল, রোশেনারা, আজ আমার কেউ নেই। শেষ অবলম্বন ছিলেন আব্বাজান। তিনি চলে যাবার পর আমি বড় একা হয়ে গেছি। এভাবে চললে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব। জীনের শেষ দিনগুলো আমি তোমাকে নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই বহিন। তোমার প্রতি আমার সব অন্যায় অবিচার ভুলে গিয়ে এইটুকু দয়া তুমি আমাকে করো।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ম্লান মুখ। চোখের কোলে কালিমা। বড় কষ্ট হয়েছিল আমার। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলাম, আপা, কটা দিন তুমি আমাকে একটু ভাবতে দাও।

চলে গিয়েছিল জাহানারা।

৫

শবনম, জাহানারা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ আমি স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম বড় কষ্ট হয়েছিল তার জন্যে। জীবনে কিছুই পেল না সে।

পেলাম তোমার পত্র। খালেদা এসে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল তোমার পত্রখানা। প্রথমটায় অবাক যে হইনি তা নয়। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি ভাবে পেলে এটা?

খালেদা বলেছিল, জাহাঁপনার খাস বান্দা এটা দিয়ে গেছে।

পত্র পাঠ করে অবাক। চিন্তা করতে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল সব কিছু। ধন্য তুমি ভাইজান। জাহানারা যা বলে গেছে, কি নির্মম সত্য সে কথা। সন্দেহের নাগপাশে আবদ্ধ তোমার মন। আমিই শুধু তোমাকে চিনতে পারিনি। তোমার সুন্দর রূপ, মার্জিত ব্যবহার, স্নেহের ছলনা আমাকে বারবার বিভ্রান্ত করেছে, ঠকিয়েছে, ভাতৃবিরোধের নোংরা রাজনীতিতে আমাকে জড়িয়েছে। তোমার স্নেহের ছলনায় ভুলে সেদিন গোপনে সাহায্য যদি না করতাম তাহলে দাক্ষিণাত্যেই তোমাকে

ফিরে যেতে হ'ত আবার, মসনদের স্বপ্ন তোমার কাছে চিরদিন স্বপ্নই থেকে যেত। এত হত্যা, রক্তপাত ঘটতো না। আমার ভুলের জন্য……

শবনম, বিশ্বাস করো তুমি। নিজের প্রতি মাঝে মাঝে আমার প্রচণ্ড রাগ হয়। ইচ্ছা করে কঠিন পাষাণে মাথা কুটে রক্তাক্ত করে ফেলি কপাল। পারি না। ব্যর্থ আক্রোশে শুধু গুমরে মরি।

তোমার এ পত্র যদি না পেতাম তাহলে চিরদিনের জন্য একটা ভুল ধারণা আমার মনে থেকে যেত। তোমারও। তুমি ভাবতে শাহজাদী ভুলে গেছে তোমাকে। দুদিনের খেয়াল মাত্র বন্ধুত্বের ছলনা।

বিশ্বাস করো শবনম। তোমাকে ভুলিনি। ভুলবো না।

গত রমজান মাসের পর থেকে তোমার কোন পত্রই আমি পাইনি। তুমিও পাওনি। অথচ নিয়মিত আমরা পরস্পরকে পত্র লিখেছি। এখন সব কিছুই স্বচ্ছ আমার কাছে। আব্বাজানের মৃত্যুর পর ভাইজানের সঙ্গে শেষ কাজ নিয়ে মতান্তর যদি না হ'ত, আমি তাঁর ইচ্ছায় যদি পূর্ণ সমর্থন জানাতাম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের এই পত্র বিনিময় বন্ধ হোত না।

কিন্তু আজ তোমার পত্র বাদশাহের খাসবান্দা কেন পৌঁছে দিয়ে গেল, সেটাই বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন গূঢ় কারণ আছে। ভাইজান বিনা কারণে কিছুই করেন না।

শবনম। মাঝে মাঝে বড় রাগ হয়। ছোটবেলায় যেমন কারণে অকারণে হঠাৎ হঠাৎ রেগে যেতাম। হাতের কাছে যা পেতাম তাই ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ভাঙতাম, আজও সেই রকম ইচ্ছা করে। তখন অনেকেই বলতো মেয়ে হলেও আমি কিছুটা বংশের ধারা পেয়েছি। আমার মধ্যে কিছুটা বন্যতা আছে।

বড় হয়ে জ্ঞানবুদ্ধি হবার পর অনেক চিন্তা করেছি আমার মধ্যেকার বন্য স্বভাব নিয়ে। সিত্তীউন্নিসাকে বহুবার প্রশ্ন করেছি। তার কাছে অতীতকে জানতে চেয়েছি। যদিও এই জানবার আগ্রহটা আমার হঠাৎ মনে উদয় হয়নি। তারও কারণ আছে।

আমার দুরন্তপনা এবং অত্যাচারে হারেমে আশ্রিতা বৃদ্ধার দল মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিল না তাঁদের। অতিষ্ঠ হয়েই তাঁরা অভিযোগ জানাতেন। আর তার জন্য শাস্তিও কখনো কখনো পেতাম। সিত্তীউন্নিসা আমাকে শাসন করতেন। তবে বেশির ভাগ সময়েই তিনি আমাকে উপদেশ দিতেন, বোঝাতেন। দৈহিক নির্যাতন এক রকম করেননি বললেই চলে। যদি কখনো তিনি একটু-আধটু দৈহিক নির্যাতন করতেন, পরে কাছে থেকে আদর করে ভুলিয়ে দিতেন আমার মনের বেদনা-অভিমান।

সিত্তীউন্নিসা গুণবতী মহিলা ছিলেন। বর্ষীয়সী বিধবা। বড় সুন্দর পবিত্র ছিল তাঁকে দেখতে। নির্মল ছিল তাঁর হাসিটি। শিক্ষিতা, অগাধ জ্ঞানের

অধিকারিণী ছিলেন। সেই সময় ধাত্রী বিদ্যায় পারদর্শিনী কোন মহিলা হারেমে ছিলেন না। সেবা-শুশ্রূষায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বিপদে-আপদে তিনি সকলের আগে এগিয়ে যেতেন। রোগশয্যায় শায়িতা আম্মাজানকে রাতের পর রাত জেগে সেবা করতে দেখেছি তাঁকে। তেমনি হারেমের একজন বাঁদীও গুরুতর অসুস্থ হলে তার শয্যাপার্শ্বেও তাঁকে ছুটে যেতে দেখেছি।

সেই সিত্তীউন্নিসা ছিলেন আমাদের শিক্ষিকা। জাহানারাও তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করেছে। যেটুকু শিক্ষা লাভ করেছি তা তাঁর কাছেই। আমার চঞ্চল আর অস্থির স্বভাবের জন্যে আমার সম্পর্কে সকলেই যখন হতাশ, সিত্তীউন্নিসা পরম ধৈর্য এবং মমতায় আমাকে পাঠগ্রহণ করিয়েছেন। আর কখনো তিনি আমাকে পাঠ গ্রহণের সময় শাসন করেননি। পরে বুঝতে পেরেছি, আমাকে তিনি কৌশলে আয়ত্তে এনেছিলেন। অনেক পরে আমার প্রশ্নের উত্তরে, হাসি মুখে, সে কথা স্বীকারও করেছিলেন। বলেছিলেন, কঠিন অনুর্বর ভূমিকে শস্য-শ্যামলা করতে গেলে ধৈর্য আর পরিশ্রমের প্রয়োজন। রোশেনারা, আমি সেই ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।

সেদিন অবাক হয়েছিলাম তাঁর কথা শুনে। বলেছিলাম, এ আপনি কি বলছেন ?

হাসিমুখে তিনি বলেছিলেন, ঠিকই বলছি বেটী। তোমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি। সকলে তোমার দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। আমি কিন্তু আশা ছাড়িনি। মরুভূমির রুক্ষতার মধ্যেই তো মরুদ্যানের স্বপ্ন লুকিয়ে থাকে। অনেকে তোমাকে ভুল বুঝলেও, আমি কখনো ভুল বুঝিনি। তোমার ওই দুচোখের গভীরে আমি যে তোমার মনের ছবি পড়তে পেরেছিলাম সেদিন। শিশুর দুরন্তপনাতো তার প্রাণপ্রাচুর্যের প্রকাশ। আমরা বুঝতে না পেরে ভুল করি। ভুল বুঝি। খোদা আমাকে রক্ষা করেছেন তোমার ক্ষেত্রে।

সিত্তীউন্নিসার সেদিনের কথাগুলো শুনে লজ্জা পেয়েছিলাম। জানি না আমার ঈষৎ চাপা রঙের মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠেছিল কিনা। তখন আমি বেশ বড় হয়েছি। আমার স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে। তবে একলা থাকতে ভালবাসি।

সিত্তীউন্নিসা বলেছিলেন, বেটী একটা কথা বলছি জীবনে সত্য বলে যা জানবে, তা থেকে একচুল নড়বে না। অন্যায়কে কখনো প্রশ্রয় দেবেনা।

সিত্তীউন্নিসা আজ আর নেই, কিন্তু তাঁর কথাগুলো আজও আমার মনে আছে। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে অন্যায়কেই প্রশ্রয় দিতে হয়েছিল। আমি ভুল করেছিলাম।

অতীতের দিকে চোখ ফেরালে মাঝে মাঝে আশ্চর্য হই। হারেমবাসিনী বৃদ্ধারা আমার দৌরাত্ম্যে অস্থির হতেন। অভিযোগ করতেন। নিজেদের মধ্যে আমাকে নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কেউ বলতেন, মেয়েতো নয় যেন চেঙ্গিজ খান।

কেউ বলতেন, সাক্ষাৎ তৈমুর লং হয়েছে মেয়েটা।

সিত্তীউন্নিসাকে বলতাম সে কথা। প্রশ্ন করতাম, কে তৈমুর লং? চেঙ্গিজ খানই বা কে?

তিনি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাকে একথা বলেছে ওঁরা। তুমি শুনেছো?

বলেছি, আমাকেই বলেছে। তবে আমি নিজে শুনিনি।

—নিজে না শুনেই তুমি ওঁদের নামে অভিযোগ করছো?

প্রকাশ করতে হয়েছিল সত্য। আমার যে চর আছে। তারা যে হারেমে ঘুরে বেড়ায় কোথাও কেউ আমার নামে কিছু বলছে কি-না জানার জন্যে, সে কথা তাঁকে জানিয়ে ছিলাম। শুনে গম্ভীর হতে গিয়েও তিনি হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, বেটী, তোমার চরেরা যে সবসময় তোমাকে সত্যি কথা বলছে, তার প্রমাণ কি? তারা তোমাকে খুশি রাখার জন্য মিথ্যা সংবাদও তো দিতে পারে।

বলেছি, মিথ্যা তারা বলবে না। তারা জানে, মিথ্যা কথা বলে যদি কখনো ধরা পড়ে তাহলে প্রচণ্ড মার খাবে।

—কেন, মার খাবে কেন? অবাক হয়েছিলেন সিত্তীউন্নিসা।

বলেছি, আমার চরেরা জানে মিথ্যা কথা বলা আমি একবারেই পছন্দ করি না। জিউ, এখন আপনি বলুন, ওই নামে ওরা আমাকে ডাকে কেন? কি সম্পর্ক ওঁদের সঙ্গে আমার?

সিত্তীউন্নিসাই একদিন বলেছিলেন।

দিল্লীতে তখন সুলতানী শাসন, ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালেই সুলতানী শাসনের দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। ফিরোজ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার ফলে সাম্রাজ্যের চারিদিকে চরম অরাজকতার সৃষ্টি হয়। সেই দুর্বলতার সুযোগে সমরখন্দের শাসক তৈমুর লঙ্ (১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন। হিন্দুস্থানের বিপুল ঐশ্বর্যই তাঁকে হিন্দুস্থানের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। তৈমুর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে হিন্দুস্থান আক্রমণ করে দিল্লী দখল করেন। তৈমুরের সৈন্যরা দিল্লীতে অমানবিক হত্যালীলা সংঘটিত করেছিল। দিল্লী পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপে। দিল্লীর পর তৈমুর মীরাট, হরিদ্বার আর জম্মু জয় করেন। প্রত্যেক স্থান থেকেই তৈমুর ধন-রত্ন লুট করে নিয়ে যান।

'মোঙ্গ' শব্দ থেকে 'মোঙ্গল' (নির্ভীক)। আজ তোমাদের বংশকে বলা হয় মুঘল বংশ। চীন দেশের সংলগ্ন মোঙ্গোলিয়া অঞ্চলে মোঘল জাতির আদি বাসভূমি ছিল। মোঘলরা প্রথমে পশুপালন ও মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো। দুর্ধর্ষ মোঘল জাতি এক সময় বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত ছিল। একটি উপজাতির নেতা ইয়েসুকাই অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর পুত্র তেমুচিন অসামান্য সামরিক প্রতিভা এবং সংগঠন শক্তির পরিচয় দেন। তিনি প্রতিবেশী তাতারদের পরাজিত করেন এবং অন্যান্য মোঙ্গল জাতিগুলি তাঁর বশ্যতা স্বীকার

করে। তিনি সমগ্র মোঙ্গল জাতির প্রধান নেতা (খান) নির্বাচিত হন (১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে)। তাঁর নতুন নামকরণ হয় চেঙ্গীজ খাঁ ('চেঙ্গীজ' শব্দের অর্থ অসাধারণ শক্তিশালী)। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মোঙ্গল জাতি দিগ্বিজয়ের পথে অগ্রসর হয়। উত্তরে সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণে জর্জিয়া এবং পূর্বে চীন থেকে পশ্চিমে রাশিয়া পর্যন্ত চেঙ্গীজ খাঁর বিশাল সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল। ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে তিনি খিভার সুলতানের পশ্চাদ্ধাবন করে হিন্দুস্থানের সীমান্তে উপস্থিত হন, কিন্তু ইলতুৎমিস খিভার সুলতানকে আশ্রয় না দেওয়ায় সীমান্ত থেকেই ফিরে যান।

চেঙ্গীজ খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য কটি অংশে ভাগ হয়ে যায়। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র চাখতাই-এর ভাগে পড়ে মধ্য এসিয়া। পরে চাখতাই রাজ্য দুভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিমভাগে তাতারদের সংখ্যাধিক্যের জন্য সে অঞ্চলে তাতার মোঙ্গল সংমিশ্রণ ঘটেছিল। এই মিশ্রিত মোঙ্গল তাতার জাতি থেকেই তৈমুর লঙ্গের উদ্ভব হয়।

এঁদের-ই বংশধর বাবর। বাবরের আব্বাজান মীর্জা ওমর শেখ ছিলেন সমর-খন্দের বিখ্যাত চাখতাই তুর্কবীর তৈমুরের পঞ্চম বংশধর ও আম্মা কতলখ নিগার খানুম ছিলেন কারাকোরামের মোঙ্গল বংশীয় বিখ্যাত চেঙ্গীজ খানের ত্রয়োদশ অধস্তন বংশধরের কন্যা। তৈমুর ছিলেন ধর্মে মুসলিম, চেঙ্গীজ ছিলেন শামানী বৌদ্ধ।

ইতিহাস নয় যেন রূপ-কথা। সিত্তীউন্নিসা তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে একটু একটু করে অনেক ঘটনাই শুনিয়ে ছিলেন আমাকে। জানবার আগ্রহ দিন দিন বেড়েছিল। আর সেই সঙ্গে পরিবর্তন এসেছিল আমার মধ্যে। নিজেই নিজের পরিবর্তন বুঝতে পেরেছিলাম। দস্যি মেয়েটা ক্রমশ শান্ত হয়ে যাচ্ছে। অন্তর্মুখী হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন।

তৈমুর আর চেঙ্গীজের রক্তধারা বইছে দিল্লীর বাদশাহদের ধমনীতে। সেই রক্ত-ধারার অধিকারিণী আমিও। হয়তো সেই জন্যই শৈশবে আমি ওই রকম বে-পরোয়া হয়ে উঠেছিলাম। সিত্তীউন্নিসা যদি না থাকতেন, আমার কি হ'ত বলা যায় না। তিনি আমাকে নতুন ভাবে গড়ে ছিলেন এবং সকলের অগোচরে। সিত্তীউন্নিসা ছিলেন যেন এক দক্ষ মৃৎশিল্পী, আর আমি একতাল নরম মাটি। তিনি আমার নতুন অবয়ব দান করেছিলেন।

আত্ম প্রশংসা ? না, আত্ম প্রশংসায় চিরদিনই আমার বিরাগ। অন্যের প্রশংসা আমার কাছে চাটুকারিতার নামান্তর বলে মনে হয়। প্রশংসার প্রত্যাশা আমার মনে কোন দিনই ছায়াপাত করেনি। আর প্রশংসার চেয়ে ঘৃণা, অবজ্ঞা, অবহেলা, অপমান আর বঞ্চনা জীবনে লাভ করেছি বেশি।

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েছি। প্রথম প্রথম খুবই মন খারাপ হ'ত। অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছি কত। ধীরে ধীরে সহ্য শক্তি বেড়েছে। অন্যের

আঘাতে তাই আর বিচলিত বোধ করিনি।

সিত্তীউন্নিসা বলতেন, বেটী খোয়াব দেখা ভাল। জীবনে স্বপ্ন মূল্যহীন নয়। যে স্বপ্ন দেখেনা সে তো মুর্দা। লেকিন, চলার পথেতো মখমলের গালিচা পাতা থাকবে না সব সময়। অনেক চড়াই উৎরাই পার হতে হবে। অনেক চোট আঘাত পাবে। আলো অন্ধকার। আঁখ খুলা রাখবে। সতর্কভাবে পা ফেলবে। দেখবে কঠিন বন্ধুর পথও পার হয়ে গেছো।

কতকিছু তিনি শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ভুল করলাম।

তিনি বলতেন, জিন্দেগী সুখ আর দুঃখ দিয়ে গড়া। দুটোকেই সমানভাবে নেবে। সুখের রাত্রি বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, লেকিন দুঃখের রজনী বড় দীর্ঘ। পার হতে চায় না। লেকিন, সুখ-দুঃখ দুটোকেই যদি সমান ভাবে নিতে শেখো দেখবে হতাশা মনকে আচ্ছন্ন করছে না। রাত্রি যতই দীর্ঘ হোক না কেন প্রভাতে সূর্যোদয় হবেই।

কত কথাই না মনে পড়ে। কত টুকরো স্মৃতি। এক একটা হীরক খণ্ডের মত। মুহূর্তে উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে।

সিত্তীউন্নিসাকেও তো আমি কম জ্বালাতন করিনি। আমার প্রতি তাঁর সেই অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়াটাকে সে সময় আমি সুনজরে দেখিনি। বলতাম, আপ হর রোজ এ্যায়সা করতা কিউ?

অবাক চোখে তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করতেন, আমি আবার কি করলাম তোমার?

—কি করলাম? আপনি সব সময় আমাকে নজরে রাখেন। আমি কি করছি না করছি আমার বন্ধুদের কাছে খোঁজ নেন। তাদের কাছে আমার প্রশংসা করেন। আমি কি ভাল যে আমার প্রশংসা করেন?

তিনি বলতেন, তুমি যা, তাই বলি তোমার বন্ধুদের। তোমরা বন্ধুরাও খারাপ নয়।

—মিথ্যা কথা। প্রতিবাদ জানাতাম, আমি, আমার বন্ধুরা সকলেই খুব খারাপ।

—তাই বুঝি! কৌতুকে হাসতেন সিত্তীউন্নিসা। বলতেন, নিজের সম্পর্কে বেশ সুন্দর ধারণাটা তোমার মনে তৈরি হয়েছে তো? তুমি বলছো, খারাপ তোমরা। কিন্তু কি খারাপ?

—অত জানিনা। আমাদের সকলে খারাপ বলে, ব্যাস্।

—সকলে খারাপ বলে বলেই নিজেকে তুমি অমনি খারাপ ভাবতে সুরু করলে। পরক্ষণে গম্ভীর ভাবে বলতেন, এমন কখনো ভেবোনা। ভাবতে নেই। নিজেকে খারাপ ভাবতে ভাবতে আদমী খারাপ হয়ে যায়, বেটী। নিজেকে কখনো হীন, ছোট ভেবো না।

বলেছি, যে বরবাদ হয়ে গেছে, সে যদি নিজেকে ভাল আর বড় ভাবে, সে কি তা হবে?

—কেন হবে না? যদি সে চেষ্টা করে, নিশ্চয়ই তা সম্ভব হবে।

—কেমন করে?

—নিজেকে জানতে হবে, চিনতে হবে। লক্ষ্য স্থির করতে হবে। বেটী, মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই।

মাতৃহারা জেদী একগুঁয়ে মেয়েটাকে সিত্তীউন্নিসা বড় ভালবাসতেন। সব সময় আগলে রাখার চেষ্টা করতেন। তাঁর ঋণ এ জীবনে কোনদিনই শোধ হবেনা।

৬

বাবরের কথা শুনেছিলাম সিত্তীউন্নিসার মুখে। বাবর, হিন্দুস্থানে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বাবরের জন্মস্থান ফরঘনা (বর্তমান পারস্য ও তুর্কীস্থানের মধ্যবর্তী অঞ্চল। জন্ম—১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর পিতা কিছুটা স্থূলবুদ্ধি হলেও পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তুর্কী ছিল বাবরের পিতৃভাষা; ফার্সী ছিল তাঁর অধীত ভাষা। বাবরের তুর্কী ভাষায় রচনা রসাল, ছন্দোময় গদ্য; ফার্সী ভাষায় রচনা গম্ভীর কিন্তু অস্পষ্ট। ছোট বেলা থেকেই বাবর ছিলেন দুরন্ত। নিজেকে জ্ঞানী বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতেন সব সময়।

হঠাৎ ওমর শেখের অপঘাতে মৃত্যু হল। বাবরের বয়স তখন মাত্র একাদশ বৎসর। পিতামহী আইসান বেগমের পরামর্শ ও ব্যবস্থায় বাবর বাদশাহের মসনদে বসলেন। কিন্তু সেই বাল্যকালেই তাঁর স্বপ্ন ছিল পূর্বপুরুষ তৈমুরের রাজ্য এবং সমরখন্দের মসনদ অধিকার করা। দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্যক্রমে বাবর তিনবার সমরখন্দ অধিকার করেন এবং তিনবারই বিতাড়িত হন। এবং ফরঘনা রাজ্যও তিনবার অধিকার করেন; তিনবার হস্তচ্যুত হয়। একমাত্র বাদকসান ভিন্ন মধ্য এশিয়ার কোন ভূখণ্ডই তাঁর অধিকারে ছিলনা। অবশ্য তিনি (১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে) কাবুল অধিকার করেছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কাবুল তাঁর হস্তচ্যুত হয়নি।

দীর্ঘদিন (১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে) বাবর প্রায় প্রতিবছর কখনো আত্মরক্ষার্থে, কখনো রাজ্য জয়ের প্রেরণায় মোঙ্গল, উজবেগ, পারসিক এবং আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। ফলে মধ্য এশিয়ায় জাতিবর্গের রণ-কৌশল তিনি আয়ত্ত করেন। পারসিকদের কাছ থেকে কামান, গোলা-বারুদের ব্যবহার শিক্ষা করেন। পারসিকরা তুর্কিদের কাছ থেকে কামানের ব্যবহার শিখেছিল। এবং তিনি ভাগ্যক্রমে ওস্তাদ আলী ও মুস্তাফা নামে দুজন তুর্কী গোলন্দাজের সাহায্য লাভ করেন। তাঁদের সহায়তায় তিনি কয়েকটি কামান, বন্দুক ও গোলা-বারুদ তৈরি করান এবং একটি গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করেন। এই গোলাবারুদের সাহায্যে তিনি পরবর্তীকালে পাণিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

কয়েক বছর পর তৈমুরের হিন্দুস্থান বিজয়ের কথা শুনলেন তিনি। হিন্দুস্থানকে তৈমুর কর্তৃক বিজিত রাজ্য রূপেই তিনি মনে করতেন এবং সেকথা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন। তিনি পাণিপথের যুদ্ধের পূর্বে পাঁচবার অভিযান করেছিলেন। প্রথমবারের (১৫০৫) অভিযানের লক্ষ্য ছিল কোহাট ও মুলতান, দ্বিতীয় (১৫০৭) মান্দাবার থেকে ফিরে যান। তৃতীয়বার (১৫১৯) সীমান্তবর্তী ইয়ুসুফ জাই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং বিজৌরের দুর্গ অধিকার করে ঝিলম নদীর তীরবর্তী ভেরা বিজয় করেন। তারপর দিল্লীর সুলতানের কাছে দূত পাঠিয়ে তৈমুর বিজিত হিন্দুস্থানের অংশ দাবী করেন। অবশ্য সে দূত লাহোর অতিক্রম করতে পারে নি। শীতে পেশোয়ারের দিকে যাত্রার সময় বাদকশানে বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে ফিরে যান তিনি।

একবৎসর পর (১৫২০) তিনি শিয়ালকোট জয় করেন। তারপর শাসনকর্তা দৌলত খান লোদীর আমন্ত্রণে (১৫২৪) তিনি লাহোর অধিকার করেন। কিন্তু দৌলত খানকে লাহোর ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন।

দিল্লীর শাসনকর্তা তখন ইব্রাহীম লোদী।

বাবরের সৈন্যরা দিল্লীর অদূরে পাণিপথের প্রান্তরে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। ইব্রাহিম লোদী এক লক্ষ সৈন্য, এক সহস্র হাতী এবং গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমজিতের রাজপুত বাহিনীসহ পাণিপথের প্রান্তে উপস্থিত হলেন (২১শে এপ্রিল, ১৫২৬ খ্রীঃ)। আটদিন দুপক্ষই চুপচাপ অপেক্ষা করলেন। পরদিন বাবরের কামান বাহিনী সামনের দিকে ও অশ্ব বাহিনী পিছন দিক থেকে আক্রমণ করলো। ইব্রাহীম লোদী বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করে পরাজিত ও নিহত হলেন। পঞ্চাশ হাজার রাজপুত আর আফগান সৈন্যের রক্তে পাণিপথের রণক্ষেত্র রঞ্জিত হল। বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণ দিলেন রাজা বিক্রমজিৎ। বিজয়ী বাবর দিল্লী অধিকার করলেন। হুমায়ুনের হাতে এল কোহিনুর।

হুমায়ুন অধিকার করলেন জৌনপুর, গাজীপুর। বাবর গোয়ালিয়র।

সংগ্রাম সিংহ ভেবেছিলেন বাবর দিল্লী লুণ্ঠন করে ফিরে যাবেন। যখন শুনলেন বাবর হিন্দুস্থান ত্যাগ করবেন না, তখন সংগ্রাম সিংহ আগ্রার অদূরে বায়েনা আক্রমণ করলেন। রাজপুত ও আফগানদের যৌথ বাহিনী আগ্রার আঠার ক্রোশ দূরে ভরতপুরের কাছে পর্বতের সানুদেশে খানুয়া নামক স্থানে মিলিত হল। এখানে দুদিনের (১৬-১৭ মার্চ, ১৫২৭ খ্রীঃ) যুদ্ধের পর রাণা সংগ্রাম সিংহ আহত ও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসারিত হলেন। আফগান ও রাজপুত বাহিনী শোচনীয় ভাবে পরাজিত হল।

তিন সপ্তাহের মধ্যে বাবর সগৌরবে মেওয়াটের রাজধানী আলোয়ারে প্রবেশ করলেন। অযোধ্যা ছাড়া প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত বাবরের ক্ষমতা স্বীকার করল।

সংগ্রাম সিংহের আত্মীয় মালবের রাজা মেদিনী রাও বিগত কয়েক বছরের পরিস্থিতির সুযোগে বুন্দেলখণ্ড ও চান্দেরী (ভূপাল) দুর্গ অধিকার করেছিলেন। সেই সঙ্গে বাবরের কয়েকজন শত্রুকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। একদিন (১৫২৮ খ্রীঃ) বাবর মেদিনী রাওয়ের দুর্ভেদ্য চান্দেরীর দুর্গ অবরোধ করলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুঘলদের বিরুদ্ধে দুর্গ রক্ষা অসম্ভব বিবেচনা করে রাজপুতরা দুর্গের সমস্ত নারীদের হত্যা করে মুঘল সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধে মেদিনী রাও পরাজিত ও নিহত হলেন। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল রাজপুত সৈন্য। সেই সঙ্গে বাবরের বহু মুঘল সৈন্যও নিহত হল। এর কিছুদিন পরেই মৃত্যু হল সংগ্রাম সিংহের।

বাবর হুমায়ুনকে বাদকশানে শাসনকর্তা রূপে পাঠিয়ে দিয়ে আফগান গোষ্ঠীর দিকে নজর দিলেন। উত্তর ভারতে ইব্রাহীম লোদী, মধ্যভারতে রাণা সংগ্রাম সিংহ বিজিত হলেও পূর্বভারতে আফগানরা বাবরকে স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করেনি। অযোধ্যার মামুদ লোদী পরাজিত হয়ে বাঙ্গলায় আশ্রয় নিয়েছেন। ইব্রাহীম লোদীর ভাই মামুদ লোদী খানুয়ার যুদ্ধের পর বিহারে প্রভুত্ব স্থাপন করে বাবরের বিরুদ্ধে বেনারস পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। বাবর ঘর্ঘরা ও গঙ্গার মিলন স্থলে মামুদ লোদীকে পরাজিত করলেন। বাঙ্গলার সুলতান নসরৎ শাহ বাবরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন। বাবর প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি নসরৎ শাহের রাজ্য সীমা কখনো অতিক্রম করবেন না। নসরৎ শাহও প্রতিশ্রুতি দিলেন, বাবরের শত্রুকে তিনি কখনো আশ্রয় দেবেন না। বিহারে মুঘল প্রভুত্ব স্থাপিত হল। স্বাধীন রইলো বাঙ্গলা। ঘর্ঘরার যুদ্ধই বাবরের জীবনে শেষ যুদ্ধ।

সিত্তীউন্নিসা বলেছিলেন, মধ্যযুগের ইতিহাসে বাবর এক অপূর্ব চরিত্র। কিশোরে পিতৃহীন, মধ্যজীবনে রাজ্যহীন, শেষ জীবনে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বাবর দোষে-গুণে মানুষ; তাঁর দোষ ছিল শত, গুণ ছিল সহস্র। বাবর তাঁর মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, মাতামহী ও মাতামহকে ভালবাসতেন, কিন্তু পিতার ব্যাপারে অনেক সময় পরিহাস করেছেন। তাঁর অসংখ্য বেগম ছিল, কিন্তু সকলের প্রতি তিনি সমান নজর দিতেন। পাণিপথ যুদ্ধে জয়লাভের পর বাবর তাঁর পারিবারিক উপাধি 'মীর্জা' ত্যাগ করে 'বাদশাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। দিল্লীতে তিনি হিন্দুস্থানের রাজধানী স্থাপন করেন। আগ্রায় তিনি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। এছাড়াও তিনি অসংখ্য প্রাসাদ নির্মাণ করান।

প্রথম জীবনে বাবর অন্যান্য মীর্জাদের মত সুরাসক্ত ছিলেন কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধের আগের দিন তিনি সুরাত্যাগের প্রতিজ্ঞা করেন। জীবনে আর সুরা স্পর্শ করেননি। অসম্ভব দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। মৃত্যুভয় তাঁর ছিল না। জীবনে বহুবার তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। আর যেমন ছিল তাঁর বন্ধু প্রীতি তেমনি সামান্য সৈনিকের প্রতি মমতা বোধ।

জীবনের পান-পাত্র তিনি আকণ্ঠ পান করেছেন। যুদ্ধের শেষে চন্দ্রালোকে

মুক্ত আকাশের নীচে বন্ধুবান্ধবসহ কাব্য, সংগীত আর সুরার সম্মেলনে সমবেত হতেন। কাব্য তাঁকে আনন্দিত। তাঁর তুর্কী রচনা ছিল সাবলীল ও নির্ভুল। তাঁর রচিত 'তুজুক' এক কথায় অপূর্ব। সেই সঙ্গে তাঁর তুর্কী কবিতা 'দিওয়ান' বড় মধুর-উজ্জ্বল। বাবর একদিকে ছিলেন শিল্পী অন্যদিকে নির্ভীক যোদ্ধা।

তিনি ছিলেন সুন্নী মুসলমান। কিন্তু পরধর্মদ্বেষী ছিলেন না। প্রয়োজনের সময় তিনি পারস্যের সুন্নী-বিরোধী সফাবী বংশীয় শিয়া সুলতানের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। আজীবন তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে আল্লার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। যুদ্ধে সফলতার জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা করতেন, বিজয় লাভে আল্লার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে কোরাণ নিষিদ্ধ সুরাপানের জন্য অনুশোচনা করেছেন, আল্লার অনুগ্রহের জন্য সুরা বর্জন করেছেন। বিধর্মী হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে তিনি ধর্মযুদ্ধ (জিহাদ) বলে ঘোষণা করেছেন। খানুয়ার যুদ্ধের পর বিধর্মী হত্যা করে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে 'গাজী' (বিধর্মী হন্তা) উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। মেদিনীরাও পরাজিত হলে তিনি দুর্গবাসী হিন্দুদের হত্যা করে আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি মুসলিম ফকিরের কবরে তীর্থযাত্রা করে পুণ্য অর্জন করতেন।

তিনি ছিলেন যোদ্ধু পরিবারের সন্তান। জন্মে সৈনিক। সৈনিকের রক্তধারা তাঁর রক্তস্রোতে নিত্য প্রবাহিত। তাঁর প্রতি শিরা-উপশিরা ছিল মুঘল বীর চেঙ্গিজ এবং তুর্কী বীর তৈমুরের রক্তধারায় উদ্বেলিত। মৃত্যুর সঙ্গে ছিল তাঁর চির বান্ধবতা।

সিত্তীউন্নিসার মুখে বাবরের জীবন কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু…

কয়েকদিন পরে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে তাঁকে বলেছিলাম, জনাব, একটা কথা বলবো আপনাকে ?

তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে সস্নেহে বলেছিলেন, জরুর বেটী।

—আচ্ছা মানুষতো এক-ই ?

তিনি আমার কথা শুনে উত্তর দিয়েছিলেন, জরুর বেটী।

—তবু ?

তিনি এবার ধন্দে পড়েছিলেন। আমাকে দেখেছিলেন। মৃদু গলায় বলেছিলেন, তুমি কি বলতে চাও বেটী ?

—আমি বলছি হিন্দু-মুসলমান খোদার দুনিয়ায় একই মানুষ। কেউ মুসলমান, কেউ হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করে নি। হিন্দু বা মুসলমান এসব হল ধর্মের পরিচয়। সমস্ত মানুষই একই রক্ত-মাংসে গড়া, সকলের শরীরেই একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তবে কেন এত হিংসা-দ্বেষ ? তবে কি এত সব কাটাকাটি মারামারি রাজসিংহাসনের লোভে ?

সিত্তীউন্নিসা সহসা আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারেননি। বহুক্ষণ তিনি

চোখ বুজে বসেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি চোখ মেলে চেয়েছিলেন। আমাকে কাছে টেনে নিয়ে চুপি চুপি বলেছিলেন, তুমি ঠিক কথাই বলেছো বেটী। খোদার দুনিয়ায় আমাদের পরিচয় মানুষ। ধর্ম আমার পরিচয় নয়। ধর্ম আমার অন্তরের সম্বন্ধ, আমার ভালবাসা, আমার ইচ্ছা। লেকিন...

আমি উৎসুকভাবে তাঁর দিকে চেয়েছিলাম।

তিনি বলেছিলেন, বেটী তুমি আজ আমার আঁখ খুলে দিলে। তুমি এই উমরে যা ভেবেছো, আমি আমার দীর্ঘজীবনে ভাবতে ভুলে গেছি বা একথা প্রকাশ করার সাহস আমার হয়নি। অল্লা আছেন। তাঁর দোয়ায় এই দুনিয়া চলছে। আমাদের ভাল মন্দ সবই তাঁর ইচ্ছা। লেকিন, আমাদের ঝোঁক তো সব সময় মন্দের দিকে। ভাল কাজ করলে বলি, আমি করেছি, আর বুরা কাজটা তাঁর ইচ্ছা বলে চালিয়ে দিই। বাদশাহ বাবর হিন্দু খতম করে গাজী হয়েছিলেন, সত্য। তবে তিনি কি নিজের ইচ্ছায় তা করেছিলেন, না জয়ের উল্লাসে তিনি যখন মত্ত সেই সময় তাঁকে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল? আমি জানি না বেটী। শুধু এইটুকু আমিও বিশ্বাস করি, মানুষের একমাত্র পরিচয় মানুষ।

তাঁর কথা শুনেছিলাম। তাঁর মনের কষ্টটা বুঝতে পেরেছিলাম।

তিনি বলেছিলেন, বেটী, অনেকদিন আগে এক হিন্দু সন্ন্যাসীর কথা শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, দুনিয়ায় কোন ধর্মই ছোট নয়। ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বিরোধ আমাদের মনে। ধর্ম নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করি। ছোট-বড়র বিচার করি। মুসলমানের খোদা, হিন্দুর ঈশ্বর। তিনি আরো বলেছিলেন, হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ বেদ বলেছে—

"জ্যায়ান্ পৃথিব্যা, জ্যায়ানন্তরীক্ষাৎ,
জ্যায়ান্ দিবো, জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ" ॥
সসাগরা পৃথিবীর চেয়ে বড়,
অনন্ত আকাশ মণ্ডলের চেয়ে বড়
স্বর্গলোকের চেয়ে বড়,
অখিল সৃষ্টি সংসারের চেয়ে বড়,
॥ মানুষ ॥

কি অপূর্ব সুন্দর কথা বলতো। এবং সত্য। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, সত্যধর্ম, ন্যায়ধর্ম, মানবতাধর্ম, ভালবাসা ধর্ম। ভালবাসতে হবে নিজেকে এবং জীবজগৎকে। অন্যের সুখ-দুঃখকে ভাগ করে নিতে হবে। নিজেকে জানো, চেনো। তুমি কি এবং কেন? হিংসা, নিষ্ঠুরতা কখনোই ধর্মের অঙ্গ হতে পারে না।

শুনতাম আর মুগ্ধ হতাম। সিতাউন্নিসার কাছে অনেক কথাই শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে পড়ে সে সব কথা। মূর্ত হয়ে ওঠে অতীত। আমার স্বপ্নের দিনগুলো। কিন্তু ··

৭

গতরাত্রে আমি বোধহয় স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্ন যে অমন স্পষ্ট আর জীবন্ত হতে পারে, আমার ধারণাটা ছিল না। এখন এই অলস মধ্যাহ্নে শাবানের করোজ্জ রোদ্দুর গায়ে মেখে কাশ্মিরী শালে পা ঢেকে বসে আছি দ্বিতলের পশ্চিমমুখি বারান্দার শেষ প্রান্তে আমার অতি প্রিয় গোল গম্বুজের ধ্যান ঘরে। গোল গম্বুজ আমার নিজের বানানো। ধ্যান ঘর নাম দিয়েছিলাম নিজেই। খুবই সামান্য ব্যাপার। খুবই ছোট্ট জায়গাটা। মাত্র দুটি মেহগনি কাঠের তৈরি অতি সাধারণ বসার আসন। পশ্চিম বাদে তিনদিকে গোলাকার ভাবে ঘেরা। কখনো কখনো এখানে এসে বসি। যখন এখানে এসে বসি তখন কারো এদিকে আসার হুকুম নেই। হুকুমের তোয়াক্কা করে না শুধু খালেদা। নিতান্ত প্রয়োজন পড়লে আসতো বুড়ো বলবন।

গোল গম্বুজ বানিয়ে ছিলাম নিতান্তই খেয়ালের বশে। পরে হঠাৎ-ই কাজে লেগে গিয়েছিল। কখনো ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে এখানে এসেছি। কখনো আত্মীয়দের উৎপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য। আবার কখনো বা সত্যি কিছু ভাবার জন্য। আবার কখনো খেয়াল বশে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে যাওয়ার জন্য।

যে সময় এখানে থাকি কেউ আসে না। কোন আত্মীয়-বন্ধু শত চেষ্টা করেও তাদের উপস্থিতি জানান দিতে পারে না। শুধু বিশেষ কয়েকজনই যখন জানতে পারে আমি কোথায়, খালেদাকে জানায়। তবে রজবের পর থেকে তো সেসব বন্ধ হয়ে গেছে। আমার সহৃদয় দয়ালু ভাইজান ঔরংজীব আমার নিরাপত্তার কারণে আত্মীয়-বন্ধু এমন কি সাহায্য প্রার্থিনীদের পর্যন্ত এই ছোট্ট বাড়িটার আশপাশে ঘেঁষতে দেয় না। অবশ্য বিনা কারণে যে তিনি কিছু করেন নি তাও নয়। যথেষ্টই কারণ আছে। বুড়ো বলবন তো সেই ভোরবেলা মুখ থুবড়ে মরে পড়েছিল সামনের বাগিচার মধ্যে। ধারালো কোন অস্ত্র দিয়ে তার মাথাটা দু ফাঁক করে দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয় তার শরীরের মাংসও খণ্ড খণ্ড করে কেটে ছড়িয়ে দিয়েছিল চারিদিকে। কি বিভৎস। সে দৃশ্য দেখে সহ্য করার ক্ষমতা আমি প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলাম সেদিন। ছোট ছেলেটা। বান্দা মীর পাশ থেকে ফিস্‌ফিস করে সতর্ক করেছিল সেদিন, জনাব হুঁশিয়ার। ভাগ যাইয়ে।

মীরের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে আমার যেন তরঙ্গ বয়ে গিয়েছিল। ষষ্ঠেন্দ্রিয় আমাকে মুহূর্তে সতর্ক করে তুলেছিল। নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলে কঠোর চোখে মীরের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, বুড়া মরচুকা। তো ম্যায়নে

বোলায়ী কিউ বেওকুফ কাহাকা ? যাও ভাগো হিঁয়াসে।

কথাগুলো বলেই আমি ফেরার জন্যে চলতে সুরু করেছিলাম। ভয় পাওয়া কুকুরছানার মত মীর হাঁনিয়ে বিনিয়ে কথা বলতে বলতে আমার পিছু পিছু আসছিল। হঠাৎ রসুইখানার বাঁদী বাদলবানু পাশে এসে বিনীত ভাবে বলেছিল, জনাব, খোজাকা বাচ্চেকো মাফ কর দিজিয়ে।

বাদলবানু। অনেক দিন আছে আমার কাছে। আধা বয়েসের কিছু বেশি হবে। ধীর স্থির নম্র স্বভাব। যৌবনের ঢল শুকিয়ে গেলেও লাবণ্য মরেনি। এক সময় হারেমে ছিল। কার দাক্ষিণ্য লাভ করেছে জানার ইচ্ছা কোন দিনই হয়নি। বড় বাধ্য এবং কাজের। লক্ষ্য করে দেখেছি কাজ ভিন্ন আর কিছু বোঝে না। আমিও তাই পছন্দ করি একটু। বলেছিলাম, যাও ভাগো।

বাদলবানু হঠাৎ মীরকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যেতে বলেছিল, জনাব তুকো মাফ করদিয়া। বেটা তু বাঁচ গিয়া।

হঠাৎ কি যেন ঘটেছিল। বাদলবানু আর্তনাদ করে বসে পড়েছিল। আর সকলের মধ্যে দিয়ে পাশ কাটিয়ে বাড়ির মধ্যে ছুটে গিয়ে ঢুকেছিল মীর। আর বাঁদী বান্দা যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের অনেকেই আতঙ্ক আর শোকের কথা ভুলে হেসে উঠেছিল। সেই সঙ্গে সুরু হয়েছিল বাদলবানুর চিৎকার করে কান্না আর গালাগালি। শান্ত স্বভাবের বাদলবানুর তখন ভিন্ন মূর্তি। মীরকে পেলে সেখানেই শেষ করে দেবে।

মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। নিজের কক্ষে ফিরে গিয়েছিলাম। ভাইজান আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করেছিলেন সেদিন থেকেই। খোজারাই বলবনের ব্যবস্থা করেছিল। আর আশ্চর্য ব্যাপার দিন দুই মীরের কোন খোঁজ পাইনি। খালেদাকেও বোধ হয় একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে সে বলেছিল, খোঁজার জন্যে দরদে যে শাহাজাদীর বুকটা টাটিয়ে উঠেছে দেখছি।

ঘাঁটাতে ইচ্ছা করেনি আর ওকে। মনের অবস্থা ভাল নয়। খালেদার মুখের লাগাম নেই। মিছি-মিছি মাথা গরম করে ফেলবো। মনটা বিষন্ন হয়েছিল। বলবনকে মারলো কে ? কেন ?

অপ্রত্যাশিত ভাবে দুদিন পরে উত্তর পেয়ে গেলাম।

সেদিন ভোরর আলো ফোটার আগে থেকেই বৃষ্টি সুরু হয়েছে। আগের দিন প্রচণ্ড গুমোট ছিল। হাওয়ার চিহ্ন মাত্র ছিল না। বড় কষ্ট গেছে দিনভর। গুলরুখ থাকলে ঠিক বলতো, ফুফি, দিল্লী বাঙ্গলা দেশ হয়ে গেল। কথাটা মনে হতেই বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠেছিল। মেয়েটা বড় সরল ছিল। বড় ভালবাসতো আমাকে। কিন্তু আজ ওকথা বলার কেউ নেই। গোয়ালিয়র দুর্গে হতভাগিনী কিছু দিন আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

গুলরুখ বানু। মেজভাই শাহাজাদা সুজার মেয়ে। অমন বিলাসী বাবার

পবিত্র নিষ্পাপ মেয়ে কি করে জন্মায় ভেবে পাই না। যদিও শুনেছি এবং বিশ্বাস করি, আমাদের জন্মের জন্য আমরা কেউ-ই দায়ী নই। জন্মটা কি মুহূর্তের ভুল না এই বিশ্ব সংসারের যিনি পরিচালক সেই খোদাতালার ইচ্ছার ওপর সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করছে? বুঝতে পারি না। কঠিন প্রশ্নটার উত্তর খুঁজি। সমস্ত চিন্তা শক্তি কেমন যেন গুলিয়ে যায়। যন্ত্রণা বাড়ে অসহায় বোধ করি নিজেকে।

বড় সোজা সরল পবিত্র আর নিষ্পাপ মেয়ে ছিল গুলরুখ। মিষ্টি মুখের মিষ্টি মেয়ে। হাসিতে ছিল ঝর্ণার কলতান। ডাগর দুটো কালো চোখে সুদূরের আহ্বান। বাঙ্গলার জলবায়ু আকাশ প্রকৃতি যেন নিজেকে উজার করে দেওয়া ভাল-বাসার মন্ত্র দিয়েছিল ওর মরমে গেঁথে। তাইতো মুহম্মদকেও চোখের আড়াল করতে চায়নি। ঔরংজীব পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন ওর যুক্তির কাছে হার মানতে। গুলরুখ স্পষ্ট বলেছিল, কারাবাসের কষ্ট থেকে রেহাই দিতে হারেমের স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে দিন যাপনের অনুরোধ করছেন জাহাপনা। আপনার এই মহানুভবতা তুলনাহীন। লেকিন, নারী হলে বুঝতেন, কি কঠিন এবং বেদনাময় শাস্তি আপনি দিতে চাইছেন আমাকে। হারেমের নরক বাসের চেয়ে কারাবাস আমার কাছে অনেক মধুর হবে এই জন্য-ই, সেখানে আপনার পুত্রের কাছে থেকে তার সেবা করতে পারবো, তার যন্ত্রণা, তার কষ্ট, তার হতাশার অংশের ভাগি হতে পারবো। দয়া করে আপনি আমাকে গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

ঔরংজীব তাই করেছিলেন। সেখানে··· । না, সে কথা এখন থাক। ভাবলে কষ্ট হয় সে কথা। মনে হয়...। না-না গুলরুখের কথা এখন ভাববো না। মেয়েটার কথা ভাবলে আমার যন্ত্রণা বাড়ে।

বলবনের মৃত্যুর পর দুটো দিন কেটে গিয়েছিল কি ভাবে মনে করতে পারিনা। দুটো দিন বড় অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কেটেছে। বুড়োর মর্মান্তিক মৃত্যুটার চেয়েও ভাবিয়েছে আমাকে চারিদিক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়ি এবং বাড়ির বাইরে ফটকে বাদশাহ ঔরংজীবের সতর্ক প্রহরা, সেখানে আততায়ী কিভাবে ভেতরে ঢুকে একটা বৃদ্ধকে নির্মম ভাবে খুন করলো? শুধু তাই নয়, পৈচাশিক উল্লাসে শরীর থেকে মাংস কেটে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। কিসের ইঙ্গিত? চিন্তা করেছি দুটো দিন। স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছাতে পারিনি।

সেই সঙ্গে মীরের কথা মনে পড়েছে। ছেলেটা দুটো দিন গেল কোথায়? ছোট্ট বাড়িটা। ওপর নিচে মিলে কক্ষের সংখ্যা খুব বেশি নয়। যদিও সব জায়গায় আমি যাই না। বাঁদী বান্দা আর অন্যান্য কাজের লোকেদের থাকার ব্যবস্থা পূর্বদিকের পাঁচিলের ধার ঘেঁসে কিছু কক্ষ। দুভাগে ভাগ করা। রাতে মাঝখানের লোহার দরোজা বন্ধ হয়ে যায়। বান্দারা বাইরে দিকে থাকে। কিন্তু ইচ্ছে করলে তারাও বাইরে বেরুতে পারে না। যতক্ষণ না মাঝখানের লোহার ফটক খুলে দেওয়া হচ্ছে। এবং আরো একটা ফটক আছে বাইরে বেরুবার। তবেই

বাইরে বেরুতে পারবে তারা।

বাঁদীদেরও সেই রকম ব্যবস্থা। আমার মাত্র কয়েকজন বাঁদী ছাড়া মহলে বাড়িতে কেউ-ই থাকেনা। বলবনের থাকার কোন ঠিক ঠিকানা ছিলনা। সে কখন কোথায় থাকতো কেউ জানতো না। এমনও দেখা গেছে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দুপুরে বাইরে যখন লু বইছে ছিতলে ওঠার সিঁড়ির নিচে কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে দিব্য ঘুমাচ্ছে সে। আবার প্রচণ্ড শীতের সন্ধ্যায় ইঁদারার জল ঢেলেই চলেছে মাথায়। সকলের প্রিয়পাত্রও ছিলনা। যারা ওকে দেখতে পারতো না, তারা আড়ালে বলতো, বুড়োটা সাক্ষাৎ ইবলিশ।

আর নিয়ম মানে না মীর। গুলরুখ ওকে দিয়েছিল আমাকে। তখন বয়েস ছিল বছর চারেক। বাঙ্গলা থেকে নিয়ে এসেছিল। বোম্বেটে মগেরা কোন মায়ের বুক থেকে দুধের শিশুকে ছিনিয়ে এনে খোজা বানিয়ে ছিল। খোজার বান্দার ভাল দর পাওয়া যায়। সুজার টহলদারী সেনারা মগ দস্যুদের নৌকো থেকে উদ্ধার করেছিল ছেলেটাকে। সুবেদারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। দিলরুখ খেলার সঙ্গী করে নিয়েছিল। একদিন পাঠিয়ে দিয়েছিল আমাকে। আজ বছর সাতেক আমার কাছে আছে।

ছিপছিপে শ্যামলা রঙ। একমাথা কালো কোঁকড়া চুল। একটু লম্বাটে ধরনের মুখ। নাক চোখ পরিষ্কার। উচ্চতায় একটু কম যেন। দেখলে ছয়-সাতের বেশি মনে হয় না। একটু বোকা বোকা। উদাস প্রকৃতির। কথা বলে না বললেই চলে। দশটার জবাবে একটা উত্তর দেয়। কিন্তু কোন কাজের হুকুম করলে সঙ্গে সঙ্গে করে। এতদিন বুড়োকে খুঁজে বার করার ভার দিতাম মীরকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বলবনকে হাজির করে দিত সামনে। আবার কখনো সামান্য পরেই এসে বলতো, জনাব আভি বুড্ডাকো মিলেগা নেহি।

বলতাম, কেন, পাওয়া যাবেনা কেন?

—ক্যা মালুম। হাত দুটো উল্টে দেখাতো ছেলেটা।

বলতাম, তুই কি করে জানলি এখন পাওয়া যাবে না?

সেই একই উত্তর, ক্যা মালুম।

এই ক্যা মালুম ওর না পাওয়ার উত্তর। সব ব্যাপারেই এবং অন্যকেও বলবনের খোঁজে পাঠিয়ে দেখেছি, সে বহু খোঁজাখুঁজি করে অনেকক্ষণ পরে ঘুরে এসে জানিয়েছে, বলবনকে পাওয়া গেলনা। আর ভেবে অবাক হয়েছি, মীর যেখানে কয়েক মুহূর্ত পরে ঘুরে এসে জানাল না পাওয়ার কথা, সেখানে অন্যের সময় লাগলো অনেক। ছেলেটার পক্ষে এত তাড়াতাড়ি জেনে আসা সম্ভব হল কি করে?

অথচ দেখেছি মীরের আমার কাছে আসার দিন থেকেই বলবন ওকে একবারেই পছন্দ করে না। কখনো ছেলেটা কোন কারণে বুড়োর সামনে পড়লেই রাগে

মুখ বিকৃত করে গর্জায়। ছেলেটা তখন খুবই ছোট ছিল। খুব একটা বুঝতো না। পরে জ্ঞান বুদ্ধি হতে এড়িয়ে চলতে দেখেছি। অবশ্য মীরাকে না পছন্দের কারণ বার কয়েক জিজ্ঞাসা করেছি বুড়োকে। উত্তরে বলেছে, ডাকু, শয়তান!

মীরাকে কোন দিনই পছন্দ করতো না বলবন। মীর আছে। বলবন চলে গেছে। আজ দুটো দিন মীরকেও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বলবনের মৃত্যুর দুদিন পরে প্রচন্ড গুমোট দেখা দিয়েছিল। সমস্ত দিন, সন্ধ্যা মাঝরাত্রি পর্যন্ত প্রচন্ড গুমোট ছিল। তারপর বাইরে একটু যেন ঝড়ের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। ভোর থেকে সুরু হয়েছিল বৃষ্টি। আকাশ গুলোচ্ছে। অঝোরে বৃষ্টি ঝরে চলেছে। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝলসে উঠেছিল বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ-উজ্জ্বল চাবুক। সব কিছু যেন এলোমেলো করে দিয়েছিল।

সকাল থেকে দুপুর। অঝোর বর্ষণ একটু স্তিমিত হয়েছিল। দ্বিপ্রহরে আহারের পর কিছুক্ষণ শয্যায় শুয়ে এপাশ ও-পাশ করেছিলাম। দিবা-নিদ্রার অভ্যাস কোন দিনই নেই। হঠাৎ গোল গম্বুজে যাওয়ার ইচ্ছাটা মনের মধ্যে উঁকি মেরেছিল। অনেক দিন ওখানে গিয়ে বসিনি। বসবার মত পরিস্থিতিও নেই। বেশ কিছুদিন ধরেই জীবনটা ভিন্ন সুর-ছন্দে বয়ে চলছে। একটা অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে দিনগুলো পার হচ্ছে। অবসরের মুহূর্ত জীবন থেকে বেশ কিছুদিন হল হারিয়ে গেছে।

গোল গম্বুজের চাবিটা নির্দিষ্ট জায়গায় পাইনি। কোথায় গেল! খালেদাকে ডাকলাম। বললাম, খালেদা, চাবি কোথায়?

খালেদা নিজের পোষাকের মধ্যে থেকে চাবিটা বার করে দিল।

একটু অবাক হলাম। বললাম, চাবিটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছো কেন?

উত্তরে একটি কথাও না বলে নিজের কাজে চলে গেল।

খালেদার ব্যবহারে রাগ হয়েছিল। ব্যথাও পেয়েছিলাম। অসীম ধৈর্যে নিজেকে সংযত করেছিলাম। ওপরে উঠে চাবি খুলেছিলাম। তারপর···। বিস্ময়ে বহুক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। বিস্ময় বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করেছিল। কি করবো কিছুই ভেবে পাইনি। ঠিক সে সময়ে কে যেন পাশ থেকে ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল. চিৎকার কোর না। ওর কাছে সব জানতে পারবে।

কথাগুলো বলেই খালেদা সরে গেল পাশ থেকে।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম স্থাণুর মত। তারপর নিজেকে সামলে ছোট্ট ঘরটার পুবের জানালাটা খুলে দিলাম। একটু বোধহয় আওয়াজ হয়েছিল। সেই আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল ছেলেটার। চোখ পিট পিট করে একটু দেখল আমাকে। মুখে হাসি ফুটলো। ধীরে সুস্থে উঠে বসলো।

আমি নিজের আসনে বসলাম চুপচাপ। বার কয়েক দেখলাম ছেলেটাকে। চিন্তা করতে চাইলাম গোটা ব্যাপারটা। যা-যা ঘটে গেছে। কিন্তু ঠিক ঠিক চিন্তা করতে

পারলাম না। ছেলেটাই প্রথম কথা বলল। ডাকলো, জনাব।

বললাম, তুই এখানে দুদিন লুকিয়ে আছিস তাহলে?

মীর বলল, হ্যাঁ, জনাব।

—কিঁউ?

মীর বলল, খালেদা বিবি আমাকে যদি এখানে লুকিয়ে না রাখতো, তাহলে জরুর ওরা আমাকে কোতল করে দিত।

খালেদা বিবি? সম্বোধনটা নতুন শুনেছিলাম মীরের মুখে। যদিও তার কিছু-কিছু কারণ আমার চোখেও পড়েছে। খালেদার ওপরের ব্যবহারটা সব সময়েই বেশ রুক্ষ। কাটা কাটা কথা বলে। রেগে গেলে গালি-গালাজ। বুড়ো বলবনকে যদি সে কখনো চোটপাট করতো, বুড়োর মন মেজাজ ভাল থাকলে বলতো, এত্‌না গুস্‌সা কিঁউ বিবি। ম্যায়তো তুমকো বচন দিয়া মওকা মিল য্যায়িতো জরুর তুমকো বেহেস্তকো বেগম বানাউংগা। শুনে খালেদা চিৎকার শুরু করে দিত। ছেলেটাও তাই শুনে শিখেছে।

বললাম, মীর, কারা তোকে কোতল করবে? কেন করবে? সব আমাকে বল।

মীর বলল, জনাব আমি সব জানি। ওরা নিশ্চয়ই সে কথা জানতে পেরেছে।

— কি জানিস তুই? কারা জানতে পেরেছে? আমি তোর কোন কথাই বুঝতে পারছি না।

মীর বলল, আমি জানি খালেদা বিবি বেশিদিন আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না। আপনিও আমাকে বাঁচাতে পারবেন না। আর মরতেও আমার ভয় নেই। জনাব আলি আমাকে বলেছিল, বেটা আদমী জিন্দেগীতে একবারই মুর্দা বনে। লেকিন, খোজা তো আদমী নয়, মুর্দা বনে তবে সে খোজা হয়েছে। তার জীবন বা মৃত্যু বলে কিছু নেই। তার আনন্দ বা দুঃখ নেই, নেই ভালবাসা-ভবিষ্যৎ। ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধটাও তাকে ভুলতে হবে। শুধু কাজ করে যাবি। কর্তব্যে কখনো অবহেলা করবি না। কষ্টে যদি বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চায় কখনো, দুম-দুম করে ঘুঁসি মেরে কলিজাটাকে ফাটিয়ে দিয়ে কষ্টটাকে কমাবার চেষ্টা করবি। খবরদার নিজের আঁসু নিজে কখনো দেখবি না। খোজার আঁসু থাকতে নেই।

ওকে বাধা দিয়ে বললাম, তুই কার কথা বলছিস?

—আপনি বুঝতে পারলেন না জনাব?

—আমি সত্যই তোর কথা বুঝতে পারছি না। তুই কি ভুল বকছিস মীর?

—না জনাব। ভুল আমি বকিনি। শান্ত কণ্ঠে মীর বলল, ওরা আমার জনাব আলিকে যখন চারদিক থেকে ঘিরে ধরে মারছে, একজন বুড়ো যখন অতজনের সঙ্গে সমানে লড়ছে, তখন তো আমি ছাদের কার্নিশের পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছি সে দৃশ্য। ইচ্ছে হয়েছিল লাফিয়ে পড়ে বাধা দিই ওদের। লেকিন, জনাব আলি আমাকে কসম খাইয়েছিল আগেই। বলেছিল, খবরদার, আমার যদি কিছু হয় দেখিস, ভুলেও

সেদিকে যাবি না। চোখ ঘুরিয়ে নিবি। শাহজাদীর ওপর নজর রাখাই তোর কাজ। রাতে নিদ্ যাবি না। যদি নিদ্ আসে, চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে নিদ্ তাড়াবি।

শুনেছিলাম। একটু একটু করে জেনেছিলাম সব কথাই। এ যেন রূপকথার গল্পকেও হার মানায়। মীরকে সকলের সামনে দেখতে পারে না, গোপনে তাকে নিজের মনের মত করে গড়ে তোলে শুধু মাত্র আমার নিরাপত্তার জন্যে আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, খালেদা সব জানে। সেই দুদিন কাদের শ্যেন দৃষ্টির হাত থেকে আড়াল করে লুকিয়ে রেখেছে আমার গম্বুজ ঘরে। কারা তারা? না বাইরে থেকে তারা আসে নি। আমার দাস-দাসীদের মধ্যেই তারা আত্মগোপন করে আছে। বাদশাহ ঔরংজীব দীর্ঘদিন আগে থেকেই তাদের আমার কাছে রেখেছেন। তাদের চিনে বার করা আমার সাধ্যের বাইরে।

বললাম, মীর, বাদল বানুর হাত কামড়ে দিয়েছিলি কেন?

মীর চুপ করে রইলো। বুঝলাম আমার কোন প্রশ্নের উত্তরই ওর কাছ থেকে পাওয়া যাবে না।

দরোজায় তালা দিচ্ছি। মীর আমার দিকে চেয়ে আছে। বললাম, কিছু বলবি?

বলল, বিল্লিগুলো সব ঠিক আছে তো জনাব?

শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যেটা ধক্ করে উঠলো। বেশ কয়েকটা সুন্দর বেড়াল আছে আমার। যদিও বেড়াল খুব একটা পছন্দ করি না। বছর দুই আগে দুটো বাচ্চা বেড়াল বলবন এনেছিল। তারাই বংশ বৃদ্ধি করেছে। সংখ্যায় বেড়েছে। এখন আমার আহার্য বস্তু তাদেরই কেউ না কেউ প্রথম গ্রহণ করে। ছেলেটা আমার নিরাপত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দিল আবার। এর নাম কি বেঁচে থাকা। জীবন এত যন্ত্রণাময়!

৮

গোল গম্বুজে এসে বসেছি আজ। বাইরে অলস মধ্যাহ্ন। এক টুকরো রোদ্দুর এসে পড়েছে আমার কাশ্মীরী শালে ঢাকা পায়ের ওপর। ভাবছি গতরাত্রে দেখা আমার স্বপ্নের কথা। কিন্তু স্বপ্ন বলে মেনে নিতে চাইছে না মন। চোখ বুজলেই ফুটে উঠছে সেই দৃশ্য। সেই কণ্ঠস্বর এখনও আমাকে আবিষ্ট করে রেখেছে।

তির তির করে বয়ে চলেছে ছোট্ট নদীটা। পাহাড়ী নদী। একদিকে সার সার পর্বতমালা। দিনের সূর্য অস্তাচলের পথে। পাখিরা ডাকতে ডাকতে ফিরে চলেছে রাতের আশ্রয়ে। সেই নির্জন নদীর ধারে জলের বড় কাছাকাছি বসে একটা মেয়ে। সে আমি। বসে আছি নিথর পাষাণ প্রতিমার মত। দৃষ্টি নিবদ্ধ নদীর

স্রোতের দিকে। দিনের সূর্য একটু-একটু করে পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল। নেমে এল সন্ধ্যা। গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল চারিধার। আমিও হারিয়ে গেলাম সেই অন্ধকারে। কিন্তু ভয় পেলাম না। অচেনা বন্য পরিবেশ, অন্ধকার, নির্জনতা কোন কিছুই আমার মনে রেখাপাত করতে পারল না। শূন্য দৃষ্টিতে জলের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। আমাকে ঘিরে জোনাকিরা আলোর মালায় নেচে বেড়াতে লাগলো। কিছুটা দূরে কারা যেন এল সার বেঁধে, জল খেয়ে গেল। হঠাৎ হঠাৎ রাত-চরা পাখির দল তীব্র চিৎকারে কাঁপিয়ে তুলতে লাগলো পরিবেশ। আমি বসে আছি তো বসেই আছি। আমি জীবিত না মৃত সে বোধ হারিয়ে ফেলেছি। ক্ষুধা তৃষ্ণার কোন লক্ষণ নেই আমার শরীরে। নেই ক্লান্তি—অবসাদ। আমি যেন জড় পদার্থে পরিণত হয়েছি।

সেইভাবে প্রহরের পর প্রহর পার হল। অন্ধকার আকাশে ম্লান তারারা ফুটে ছিল। এক ফালি চাঁদ উঠলো এক সময়। সেই সঙ্গে ধেয়ে এল দমকা বাতাসের একটা ঢেউ আর তীব্র আলোর একটা ঝলকানি। সেই প্রথম অসহ্য বোধ হল। সেই আলো সহ্য করতে পারলাম না। দুচোখ বন্ধ করে ফেললাম। আর মনে হল আমি বেঁচে আছি।

কানে এল মৃদু গম্ভীর কণ্ঠস্বর। কেউ যেন ডাকছেন আমাকে, বেটী!

আমি চোখ মেলে চাইলাম। আমার দুচোখে বিস্ময়। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক গৌর কান্তি সৌম্য মূর্তি গেরুয়া বসনধারী বৃদ্ধ। আমি তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

স্মিত কণ্ঠে তিনি বললেন, বেটী শোচ মৎ। শোচনা কো কোই জরুরৎ নেহি। তুম যো কিয়া আচ্ছাই কিয়া। আল্লা কো দোয়া জরুর মিলেগা।

তাঁর কথা শুনলাম। তাঁকে দেখলাম। আমার কণ্ঠে ধ্বনিত হল প্রশ্ন, আপ কৌন হো?

—আমি? হাসলেন তিনি। বললেন, আমাকে চিনতে পারলে না? দেখতো ভাল করে আর একবার।

দেখলাম। একি দেখছি আমি! কোথায় গেলেন গেরুয়া বসনধারী বৃদ্ধ, এ যে আমি। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আর এক আমি! একি সম্ভব? আমি কি ঘুমিয়ে আছি, স্বপ্ন দেখছি না আমার মনের ভ্রম?

শুনতে পেলাম কণ্ঠস্বর, তুমি যা দেখলে ঠিকই দেখলে বেটী। এর মধ্যে কোন মিথ্যা নেই, ভুল নেই। তোমার এই কষ্ট, লাঞ্ছনা, অপমান একটা জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে। তোমার আত্মত্যাগ মিথ্যা যাবেনা বেটী। রাত্রির অন্ধকার কেটে যাবে। সূর্যোদয়ের পথে হবে তোমার যাত্রা। সে দিন আগতপ্রায়।

—লেকিন, আমি কি পেলাম? যেন চিৎকার করে উঠেছিলাম।

—কি পেলে? সেই শান্ত কণ্ঠস্বর। বেটী, পাওয়ার ইচ্ছাটাই স্বাভাবিক।

কামনা-বাসনা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু সকলেই কি পায়? ভোগের পঙ্কে যদি সকলে নিমজ্জিত থাকে, তাহলে ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করবে কারা? আর তুমি যা পেয়েছো, তা কজন পায়, বেটী? একটা জাতিকে তুমি নবজীবন দান করেছো। একটা জাতির আদর্শকে তুমি রক্ষা করেছো, একি কম পাওয়া তোমার কাছে?

তিনিও তাই বলে গেছেন। বিদায় মুহূর্তে তিনি আমার দুটি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে ধীর কণ্ঠে বলেছিলেন, শুধু আমি নই শাহাজাদী, মারাঠা জাতি তোমার কাছে চির ঋণী রইলো। তুমি আমি চিরদিন থাকবো না। হিন্দুস্থানের বুকে মারাঠাজাতি যতদিন থাকবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার মতই তোমাকেও তারা বিস্মৃত হবে না।

আমার পরম প্রাপ্তি। সার্থকতা। আমি মুখ তুলে চেয়েছিলাম। দেখতে পাইনি তাঁকে। তিনি কি ছিলেন? আমি পূবের আকাশে সূর্যোদয় দেখতে পেয়েছিলাম। রাত্রির অন্ধকার দূর করে নতুন দিনের সূর্য উঠছে।

শবনম, গতরাতে আমি যা দেখেছি, তা কি স্বপ্ন? স্বপ্ন বলে বোধ হয় না আমার। তোমার কি মনে হবে জানি না। তুমিও কি স্বপ্ন বলবে, না আমার এই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দিনগুলোর দুর্বলতার প্রতিফলন। জানি না, তুমি কি মনে করবে।

শবনম, তোমার কাছেই আমি প্রথম দাদাজী কোণ্ডদেবের কথা শুনেছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁকেই আমি স্বপ্নে দেখেছি। আমার পরম সৌভাগ্য, তিনি আমাকে দেখা দিয়েছেন। এ আমার মনের দৃঢ় বিশ্বাস। হিন্দু সন্ন্যাসী, শুধু হিন্দু সন্ন্যাসী কেন, সিত্তীউন্নিসার কাছে শুনেছিলাম, মুসলমান ফকিররাও দেখা দেন।

শবনম, তোমার কাছে শুনেছিলাম মহারাষ্ট্রের কথা। দেশটার ভৌগোলিক অবস্থানের কথা জানা ছিল। দেশটার পশ্চিমে আরব সাগর। পূর্বে অন্ধ্র প্রদেশের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, সাতপুরা আর বিন্ধ্য পর্বতমালা মহারাষ্ট্র দেশে বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। আরব সাগর ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ উপকূলভূমি কোঙ্কন নামে পরিচিত। পর্বত সঙ্কুল মহারাষ্ট্র দেশ স্বভাবতঃই যোদ্ধৃ জাতির জন্মভূমি। এখানকার ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম, তাই মারাঠারা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু।

জানা ছিলনা মহারাষ্ট্রের ইতিহাস। শুনেছিলাম তোমার কাছে। তুমি বলেছিলে, প্রাচীনকালে দেশটা সাত বাহন ও চালুক্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে মহারাষ্ট্রে যাদব বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়। বাহমনী রাজ্যের পতনের পর আহম্মদনগর ও বিজাপুরের সুলতানরা মহারাষ্ট্রে রাজত্ব করেন। মুসলমান সুলতানের আমলে বহু মারাঠা জায়গীরদার উচ্চ পদলাভ এবং সামরিক শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। শাসনকার্যে ও যুদ্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতা মারাঠা জাতিকে শক্তিশালী

করে। এছাড়া পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে কয়েকজন ধর্ম সংস্কারক মহারাষ্ট্রে নতুন জাতীয় ভাবের সঞ্চার করেন। একনাথ, তুকারাম এবং রামদাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রভাবে মারাঠারা স্বধর্ম রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনে স্বাধীনতা লাভের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়।

শবনম, আমি যখন শাহাজাদা ঔরংজীবের পরিবারের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যাই (১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) তখন দাক্ষিণাত্য মোটামুটি শান্ত। তবু আব্বাজান আবার তাঁকে দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়ে ছিলেন। আমার মনে হয় দাক্ষিণাত্যের প্রতি আব্বাজানের একটু বিশেষ দুর্বলতা ছিল। দাক্ষিণাত্য থেকেই তিনি দিল্লীর মসনদে বসে ছিলেন। ভাইজান ঔরংজীবও তাই।

এছাড়া আব্বাজান সম্রাট শাজাহান বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও আকবর শাহের মতই মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন বাড়াবার চেষ্টা করেন। আর দাক্ষিণাত্য শাসন করা শুধুমাত্র শক্তি নয়, সেই সঙ্গে যথেষ্ট বুদ্ধিরও প্রয়োজন। সেই জন্যই আমার মনে হয় তিনি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে শাহজাদা ঔরংজীবকেই দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিযুক্ত করেছিলেন।

আব্বাজান তাঁর রাজত্বকালে কম যুদ্ধ করেননি। তাঁর রাজত্বকালে পূর্ব সীমান্ত-স্থিত অহোমদের সঙ্গে মুঘল শক্তির দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধ হয়েছিল। অহোম জাতির পরাজয়ে আসামের এক বিস্তীর্ণ অংশ মুঘল অধিকারভুক্ত হয়েছিল।

দিল্লী সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত কান্দাহার ছিল ভারতের বহির্ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহের ক্ষেত্র, বাণিজ্যের কেন্দ্র এবং সামরিক সেনাবাস। কান্দাহারকে কেন্দ্র করে মুঘল এবং পারস্যের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক বিরোধ। আকবরের রাজত্বের প্রারম্ভে গোলযোগের সুযোগে পারস্যরাজ কান্দাহার পুনরুদ্ধার করেন; কিন্তু দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছরের চেষ্টায় আকবর শাহ কান্দাহারকে আবার নিজের অধিকারে নিয়ে আসেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পারস্যরাজ শাহ আব্বাস মুঘল বাহিনীকে পরাভূত করে কান্দাহার হস্তগত করেন। জাহাঙ্গীরের পক্ষে কান্দাহারকে নিজের অধিকারে আনা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিন পরে সম্রাট শাজাহান (১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) আলী মর্দান নামে পারস্যরাজের এক বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীর সাহায্যে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু এর এগারো বছর পরেই পারস্য সম্রাট কান্দাহার পুনরুদ্ধার করেন (১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে)। শাজাহান তারপর তিনটি অভিযান পাঠিয়েও কান্দাহার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করতে পারেননি। শুধু তাই নয়, এই ব্যর্থ অভিযানের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের বিপুল অর্থব্যয় ও লোক ক্ষয় হয় এবং মুঘল রাজ্যের সামরিক শক্তির প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়।

শাজাহান মধ্য এশিয়ার পূর্বপুরুষদের অধিকৃত প্রদেশ সমূহ জয় করার চেষ্টা করেন। ভাইজান শাহাজাদা মুরাদের পরাক্রমে হিন্দুকুশ পর্বত ও অক্ষুনদীর মধ্যবর্তী লামখান ও বদখসান মুঘল অধিকার ভুক্ত হয়। কিন্তু উজবেগ জাতির মুহু-

মুহুর্মুহু আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে মুঘল বাহিনী দুটি জায়গা থেকেই সরে আসতে বাধ্য হয়।

কান্দাহারে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা ব্যর্থ হলেও শাজাহান দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তারে সফল হয়েছিলেন। বাদশাহ আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় আহম্মদনগর রাজ্যের কিছু অংশ মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকারে ছিল। দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে থাকার সুযোগে শাজাহান দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এক সময় গৃহ-বিবাদের ফলে আহম্মদনগর হয়ে পড়েছিল শক্তিহীন; বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ছিল মুঘল শক্তি প্রতিরোধে অসমর্থ। সুযোগ-সন্ধানী শাজাহান (১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) নিজামশাহী শক্তির কেন্দ্র দৌলতাবাদ অধিকার করেন এবং নাবালক সুলতানকে বন্দী করেন। এর ফলে আহম্মদনগর চিরতরে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল।

আহম্মদনগর বিজয়ের পর স্বাধীন বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার প্রতি দৃষ্টি দেন শাজাহান। শুনেছি এছাড়া ভিন্ন কারণও ছিল। যদিও এই কারণটা আমার কাছে কোনদিনই মূল্যবান মনে হয়নি। আব্বাজান ছিলেন সুন্নী মুসলমান। আর বিজাপুর আর গোলকুণ্ডার সুলতানরা ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। সেই সময় নাকি দরবারের কিছু প্রভাবশালী কর্মচারী প্রতিনিয়ত বাদশাহকে বিজাপুর আর গোলকুণ্ডা নিয়ে উত্তেজিত করতেন। শেষে একরকম বাধ্য হয়েই তিনি যুদ্ধ যাত্রা করেন।

দাক্ষিণাত্যের ছোট্ট রাজ্য গোলকুণ্ডা। শক্তি সামর্থ্য নেই বললেই চলে। মুঘল বাহিনীর আগমন সংবাদে গোলকুণ্ডার শাসনকর্তা ভীত হলেন। বিনাযুদ্ধে বার্ষিক আট লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন।

প্রমাদ গণলেন বাদশাহের প্রভাবশালী সুহৃদের দল। গোলকুণ্ডার সঙ্গে সন্ধিতে সন্তুষ্ট হলেন না তাঁরা। তাঁরা যুদ্ধ চেয়েছিলেন। কারণ যুদ্ধে অনেক মজা। লাভবান হওয়ার মওকা মেলে। যুদ্ধ শেষে লুটপাট করার সুযোগ পাওয়া যায়। বিশেষ করে নারী এবং অর্থ।

তারা বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধে প্ররোচিত করতে লাগলেন জাহাঁপনাকে। অনেক কৌশল অবলম্বন করলেন। যুদ্ধ করলেন বিজাপুরের সুলতান। নামেই যুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরাজিত হলেন। চলল সন্ধির সর্ত নিয়ে দর কষাকষি। শেষে কুড়ি লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে সন্ধি করলেন বিজাপুরের সুলতান। আহম্মদনগর রাজ্যের কিছুটা অংশ বিজাপুরের সুলতানের হাতে তুলে দেওয়া হল, বাকিটায় মুঘল প্রাধান্য স্থাপিত হল (১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে)। আর এই বছরই আব্বাজান অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক ভাইজান শাহজাদা ঔরংজীবকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার (শাসনকর্তা) নিযুক্ত করলেন।

ঔরংজীব প্রথমবার নয় বছর দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। এই নয় বছরের মধ্যে তিনি দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের মধ্যবর্তী বালগানা প্রদেশ অধিকার করেন এবং দৃঢ় করেন

মুঘল শাসন।

ঔরংজীব দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হলেন। শাসনকার্য ও সামরিক বাহিনীর রক্ষার ব্যয়-নির্বাহের পক্ষে দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব অপ্রতুল ছিল। এই কারণে তিনি রাজস্বের উন্নতি বিধানে মন দিলেন। এই কঠিন কাজে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন ধর্মান্তরিত ভারতীয় কর্মচারী মুর্শিদকুলী খান। জরীপ, রাজস্ব নির্ধারণ এবং যোগ্য কর্মচারী নিয়োগে তিনি টোডরমলের প্রথা অনুসরণ করেছিলেন। কৃষকদের রাজকোষ থেকে ঋণদানে সাহায্য করার ফলে বছর দুইয়ের মধ্যেই কৃষিতে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

শবনম, একজনের কথা তোমার মনে আছে কি? বুঝতে পারছো না নিশ্চয়ই কার কথা বলছি। পাদুকা ব্যবসায়ী মীরজুমলাকে মনে আছে তোমার?

মনে পড়বে নিশ্চয়ই। কথাটা তাহলে মিথ্যা নয়, খোদা যাকে দেন ছপ্পর ফুঁড়ে দেন। যদিও মীরজুমলা তখন মীরজুমলা হন নি। তিনি তখন মুহম্মদ সাইদ। শুনেছিলাম তোমার কাছেই। ভাগ্য ফেরাবার জন্য পারস্য থেকে হিন্দুস্থানে এসেছিলেন মুহম্মন সাইদ। গোলকুণ্ডার বাজারে পাদুকার ব্যবসা সুরু করেছিলেন। পাদুকা ব্যবসায়ী রূপে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। সুলতানের সঙ্গে পরিচিত হন। জহুরী যেমন জহর চেনে, সুলতানও মুহম্মদ সাইদকে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে নিজের মন্ত্রিসভায় স্থান দেন। এবং মীরজুমলা গোলকুণ্ডায় নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করে শক্তি বৃদ্ধি করেন।

সে সময় ঔরংজীব দাক্ষিণাত্যের শেষ দুটি স্বাধীন রাজ্য গোলকুণ্ডা আর বিজাপুর নিজের অধিকারে আনার জন্য সুযোগ সন্ধান করছেন। গোলকুণ্ডার সুলতানের কাছে বেশি হারে কর দেবার আদেশ পাঠিয়ে অপেক্ষা করছেন। গোলকুণ্ডার সুলতান বেশি কর দিতে পারবে না বলে জানিয়েছেন।

ঠিক এমনি দিনে মীরজুমলা এসেছিলেন ঔরংজীবের কাছে। সামান্য মন্ত্রী থেকে তিনি তখন গোলকুণ্ডার প্রধানমন্ত্রী। তার ছেলের সঙ্গে গোলকুণ্ডার সুলতানের মনোমালিন্য হয়েছে। প্রতিকারের আশায় এসেছেন তিনি ঔরংজীবের কাছে।

বিশাল প্রাসাদের একদিকে ছিল সুবাদারের বিভিন্ন দপ্তর। তখন বিকাল। আমি আর তুমি বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ কাউকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে তুমি। আমার অনুমতি নিয়ে বাঁদীকে ডেকেছিলে। তাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে আমাকে নিয়ে বাগিচার অন্যপ্রান্তে চলে গিয়েছিলে। তোমার ব্যবহারে বেশ অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু কোন প্রশ্ন করার অবকাশ তুমি আমাকে দাওনি। যেখানে তুমি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলে সেখানে প্রাচীরের কিছু অংশ ভাঙ্গা।

কিছুক্ষণ পরে একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ সেই ভাঙ্গা প্রাচীরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তুমি ওড়নায় মুখ ঢেকে নিজেকে আড়াল করে বলেছিলে, সালাম আলেকুম

গোলকুণ্ডার প্রধান মন্ত্রী।

উত্তরে প্রাচীরের ওপাশ থেকে কোন উত্তর শোনা যায়নি।

তুমি বলেছিলে, কি হল কোন কথা বলছেন না কেন আপনি ?

এবার পুরুষ কণ্ঠ প্রশ্ন করেছিল, আপনাকে আমি চিনতে পারছি না।

—লেকিন, আমি আপনাকে চিনি। আপনি আমাকে এখন আর দেখলেও চিনতে পারবেন না। আমি গোলকুণ্ডার মেয়ে। এক সময় আপনার দোকান থেকে অনেক পাদুকা কিনেছি। তখন আপনি গোলকুণ্ডার সুলতানের মন্ত্রী হননি। আমি যখন আপনার দোকানে পাদুকা কিনতে যেতাম তখন আপনার ছেলে আমার পায়ের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতো। পরে সে আমাকে সাদী করতে চায়।

ওপারের কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করেছিল, কে আপনি ?

তুমি বলেছিলে, না, বলে লাভ নেই। চিনতে পারবেন না। কারণ আপনার ছেলে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তাকে সাদী করতে চাইতো। এখনও কি তার সে বিমার আছে না আরাম হয়েছে ?

ওপার থেকে কোন উত্তর আসেনি। মনে হয়েছিল চলে গেছেন মীরজুমলা। পুত্রের কলঙ্কের কথা কোন পিতা শুনতে চায় ? তোমার কাছে শুনেছিলাম সব। জেনেছিলাম ভাইজানের কাছে মীরজুমলার আসার কারণ। গোলকুণ্ডার সুলতানের সঙ্গে মীরজুমলার পুত্রের চরম মনোমালিন্য ঘটে। মীরজুমলা ঔরংজীবের সাহায্য প্রার্থী হন। ঔরংজীব মীরজুমলার পক্ষ অবলম্বন করে অতর্কিতে গোলকুণ্ডার রাজধানী হায়দরাবাদ আক্রমণ করেন। কিন্তু শাজাহান দারার পরামর্শে ঔরংজীবকে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ পাঠালেন। বন্ধ হয়েছিল যুদ্ধ। শুধু তাই নয়, মীরজুমলাকে তিনি দিল্লীতে পাঠিয়ে দিতে বললেন ঔরংজীবকে।

কিছুদিন পরে (১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) বিজাপুরের সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহের মৃত্যু হল। অবশ্য তখন আমি আগ্রায় ফিরে এসেছি। বিজাপুরে প্রচণ্ড গোলমাল। সেই সুযোগে ঔরংজীব মীরজুমলার সহায়তায় বিজাপুর আক্রমণ করলেন। বিদর, কল্যাণী এবং আরো কয়েকটি দুর্গ মুঘল বাহিনী অধিকার করে নিল। এবারও আব্বাজান ঔরংজীবকে যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ পাঠালেন এবং বিজাপুরের সঙ্গে সন্ধি করতে ঔরংজীবকে বাধ্য করলেন (১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে)। অবশ্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিজাপুর রাজ্যের কিছু অংশ মুঘল অধিকারভুক্ত হয়েছিল।

ঔরংজীবের গোলকুণ্ডা আক্রমণের সময় ছিলাম দাক্ষিণাত্যে। কিন্তু বিজাপুর অধিকারের সময় আগ্রায় ছিলাম। যদিও দারা এবং জাহানারার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ একরকম ছিল না। কিন্তু কোন সংবাদই আমার কাছে গোপন ছিল না। গোলকুণ্ডা আর বিজাপুর ঔরংজীবের হাতে এলে তাঁর শক্তিবৃদ্ধি হবে—সম্ভবত এই আশঙ্কায় দারা ও জাহানারা ঔরংজীবের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রথমটায় রাজি হতে পারেন নি আব্বাজান। বলেছিলেন, গোলকুণ্ডা অধিকারের

সময় আমি তোমাদের কথা শুনেছিলাম। কোন প্রশ্ন তুলিনি। বিজাপুর যদি মুঘল অধিকারে আসে ক্ষতি কি ?

দারা কোন উত্তর দিতে পারেননি। তাঁর মত শান্ত নির্বিরোধী মানুষ সংসারে বিরল। রাজনীতির ঘোর প্যাচ তিনি কোন দিনই বুঝতে চাননি। তাঁকে চিরদিনই শ্রদ্ধা করে এসেছি।

আব্বাজানের প্রশ্নের উত্তরে জাহানারা বলেছিল, ঔরংজীব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার। তাঁকে আপনি দেশটা শাসন করার জন্যই সেখানে নিশ্চয়ই পাঠিয়েছেন ?

আব্বাজান তাঁর জ্যেষ্ঠা এবং প্রিয়তমা কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, সে তো নিশ্চয়ই। ঔরংজীব দাক্ষিণাত্যকে সুশাসনে রাখুক সেই জন্যই আমি তাকে সেখানে পাঠিয়েছি।

—আব্বাজান, আপনি বাদশাহ। জাহানারা বলেছিল. আপনি কি সুবাদারকে কোন রাজ্য আক্রমণের অনুমতি পত্র দিয়েছেন ?

না তো।

তাহলে আপনার বিনা অনুমতিতে সে অন্যের রাজ্য আক্রমণ করে কেমন করে ? বিশেষ করে সেই রাজ্য যখন বার্ষিক কর দেয় বাদশাহকে।

আব্বাজান নীরব ছিলেন। কোন উত্তর তিনি দিতে পারেন নি।

জাহানারা বলেছিল, যদি বুঝতাম গোলকুণ্ডা বা বিজাপুর সুবাদারকে আক্রমণ করেছে কিংবা বহিঃশত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষতির চেষ্টা করছে সে ক্ষেত্রে কিছুই বলার থাকতো না। কিন্তু দুটি কারণের কোনটাই রাজ্য দুটি করে নি। সে সামর্থ্যও তাদের নেই। তাহলে দুর্বলরাজ্য দুটিকে অযথা আক্রমণ করা হল কেন ?

জাহানারার সে অভিযোগের কোন উত্তর দিতে পারেননি আব্বাজান।

জাহানারা বিরত হয়নি। বলেছিল, গোলকুণ্ডা বা বিজাপুর আক্রমণের পূর্বে ঔরংজীবের উচিৎ ছিল আপনার অনুমতি নেওয়া।

আব্বাজান অস্বীকার করতে পারেন নি। বলেছিলেন, হ্যাঁ, সেটা তার কর্তব্য ছিল।

—লেকিন, তা সে করেনি। জাহানারা বলেছিল, সে কি ধরেই নিয়েছে তার যা ইচ্ছা তাই সে করবে ! ভাল মন্দ কোন কাজের জবাবদিহির দায় তার নেই। গোলকুণ্ডার সঙ্গে কিছু কিছু ব্যাপারে তার মতান্তর চলছে। রাজ্যের কাছে বেশি রাজস্বের দাবী সে জানিয়েছে। তা সে চাইতেই পারে। কারণ দাক্ষিণাত্যের আয় অত্যন্ত কম। সেই আয়ের মধ্যে সব খরচ চালিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু গোলকুণ্ডার সুলতান বেশি রাজস্ব দেবেন না একথা কিন্তু বলেন নি। জানিয়েছেন, অনাবৃষ্টির দরুণ ফসল কম হয়েছে, তার ওপর প্রবল ঘূর্ণি ঝড়ে বহু প্রজা গৃহহারা, প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব তো আদায় হয়ই নি, উল্টে সুলতানকেই প্রজাদের সাহায্য

করতে হচ্ছে, তাদের আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে ; এই অবস্থায় বাদশাহের বেশি রাজস্ব আদায়ের দাবী তাঁর পক্ষে কি করে পূরণ করা সম্ভব ? সুবাদার যেন তাঁর আর্জি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন।

বাদশাহ বলেছিলেন, একথা তো আমি জানি না। তুমি জানলে কেমন করে ?

জাহানারা বলেছিল, আব্বাজান, যে সমস্ত কর্মচারী দাক্ষিণাত্যে আছেন তাঁদের সকলেই স্বার্থের জন্য সুবাদার ঔরংজীবের স্তাবকতা করেন না। বিচক্ষণ কিছু কর্মচারী শাহাজাদাকে গোলকুণ্ডার জন্য বোঝাতে গিয়ে তার বিরাগভাজন হয়েছে। তাঁরাই প্রকৃত তথ্য জানিয়েছে।

—তাহলে তো ঔরংজীব উচিৎ কাজ করেনি। বলেছিলেন শাজাহান, প্রজারা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে তো কিছুই করার নেই।

- আর সেজন্যও কিন্তু ঔরংজীব গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেনি। বলেছিল জাহানারা।

বিস্মিত শাজাহান প্রশ্ন করেছিলেন, তাহলে কি জন্য গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেছিল ?

--একটা অন্যায়কে সমর্থন করার জন্য।

শাজাহান অনেকক্ষণ জাহানারার মুখের দিকে চেয়েছিলেন। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, তোমার কথা যতো শুনছি ততোই রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। সব ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। ঔরংজীবের গোলকুণ্ডা আক্রমণের মধ্যে প্রকৃত সত্য কি ছিল ?

জাহানারা মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, মীরজুমলার পুত্রকে রক্ষা করা।

বিস্মিত হয়েছিলেন শাজাহান। গোলকুণ্ডা যুদ্ধের পর ঔরংজীব মীরজুমলাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং উজীর পদে নিয়োগ করেন। তারপর থেকে মীরজুমলা কখনো আগ্রা, আবার কখনো দাক্ষিণাত্যে যাতায়াত করছেন, এবং বিগত প্রায় এক বছরের মধ্যে তিনি মীরজুমলার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়েছেন। সেই মীরজুমলা সম্পর্কে জাহানারার অভিযোগটা তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় নি। বলেছিলেন, লেকিন মীরজুমলা তো ·

বাধা দিয়ে জাহানারা বলেছিল, মীরজুমলা নন, মীরজুমলার পুত্রকে রক্ষা করার জন্যই ঔরংজীব গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেছিল। মীরজুমলা সৎ। তিনি পারস্য থেকে এসে হায়দরাবাদে পাদুকার ব্যবসায় সুরু করেন। কালে পাদুকা-ব্যবসায়ী মীরজুমলা গোলকুণ্ডা সুলতানের নজরে পড়ে সামান্য উজীর, সেখান থেকে প্রধান উজীরের পদ লাভ করেন। লেকিন, মীরজুমলার পুত্র ছোটবেলা থেকেই শুধু অসৎ নয় দুশ্চরিত্র। মীরজুমলা তাঁর পুত্রকে সংশোধনের অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। সুলতানকে ধরে একটা নোকরীও ঠিক করে দেন। গত বছর

ঘূর্ণি ঝড়ে যখন গোলকুণ্ডার মানুষ গৃহহারা হয়ে পড়ে সেই সুযোগে মীরজুমলার পুত্র তার দলবল নিয়ে মানুষের অসহায়তার সুযোগে অনেক কুকীর্তি করে। অভিযোগ যায় সুলতানের কানে। মীরজুমলার পুত্রের সঙ্গে সুলতানের মনোমালিন্য সুরু হয়। সেই মনোমালিন্য এক সময় চরম আকার ধারণ করে। পুত্রকে রক্ষা করার জন্য মীরজুমলা ঔরংজীবের শরণাপন্ন হন। ঔরংজীব যেন সুযোগের প্রত্যাশায় ছিল। কোন কিছু বিচার-বিবেচনা না করেই মীরজুমলার পক্ষ অবলম্বন করে অতর্কিতে গোলকুণ্ডার রাজধানী হায়দরাবাদ অধিকার করে। এখন আপনি বিচার করুন ঔরংজীব কি উচিৎ কাজ করেছিল? সেই যুদ্ধ বন্ধের অনুরোধ করেছিলাম আপনাকে। আপনার আদেশে ঔরংজীব যুদ্ধ বন্ধ করেছিল।

অনেকক্ষণ নিজের মনে চিন্তা করেছিলেন শাজাহান। প্রশ্ন করেছিলেন, লেকিন, এবার?

এই প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিল জাহানারা। বলেছিল, এবার তো আরো বড় অপরাধে অপরাধী সুবাদার ঔরংজীব। দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা সে। অন্যায়-অরাজকতা দূর করাই তার কর্তব্য হওয়া উচিত। সে কর্তব্য সে কোন ভাবেই পালন করছে না। আগ্রাসী ভূমিকা পালনে সে সদা ব্যস্ত। দিন দিন ক্ষমতার মোহে সে অন্ধ হয়ে পড়ছে। সে চায় ক্ষমতা। সেই জন্যই ন্যায়-নীতি তার কাছে গৌণ হয়ে পড়ছে।

—এ অভিযোগ কি সত্য? প্রশ্ন করেছিলেন শাজাহান। ভাল করে চিন্তা করো। কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করার আগে দশবার ভাবো।

বিনীত কণ্ঠে জাহানারা উত্তর দিয়েছিল, অনেক চিন্তা করেই তার সম্পর্কে আপনার কাছে এ অভিযোগ জানাচ্ছি আব্বাজান। বিজাপুরের সুলতান মুহম্মদ আদিলশাহের মৃত্যু হয়েছে সম্প্রতি। মসনদের অধিকার নিয়ে কিছুটা গোলমাল চলছে সত্য কথা। তাই বলে এই নয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলমালের সুযোগে সেই দেশটাকে নিজের অধিকারে নিয়ে আসতে হবে। এখানেও কিন্তু উজীর মীরজুমলা। তিনি যেন ঔরংজীবের অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এখনই যদি এসব বন্ধ করা না যায়, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দিল্লীর দিকে দৃষ্টি ফেরাবে ঔরংজীব; যখন মন্ত্রণাদাতার অভাব তার নেই।

শুনে শিউরে উঠেছিলেন শাজাহান। দিন দিন ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে চাইছে ঔরংজীব। পুত্রদের মধ্যে বুদ্ধিমান সে। ধীর স্থির সংযত। শুধু তাই নয় পুত্র-কন্যাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে সুন্দর। বিনয়ী। তবু……

দারা এবং জাহানারার প্রতি যেটুকু সন্দেহ তাঁর মনের মধ্যে জেগেছিল, সব দূর হয়ে গিয়েছিল। তিনি বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ জানিয়েছিলেন ঔরংজীবকে।

৯

শবনম, রাজনীতি আমার মাথায় কোনদিনই ঢোকেনি। তবু রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়েছিলাম। যা আমি সেই ছোটবেলা থেকে অপছন্দ করে এসেছি। বলতে গেলে রাজনীতিকে আমি ঘেন্না করি। সিত্তীউন্নিসা বলতেন, রাজনীতি সুস্থ মনকে অসুস্থ করে তোলে। রাজনীতি বিষাক্ত, সুন্দরকে অসুন্দর করে। নারী মনের চিরন্তন মাধুর্য নষ্ট করে দেয়। অথচ নসিবের এমনই দোষ আমার, সেই রাজনীতির আবর্তে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। দেখেছি, আমি যা চাইনি তাই পেয়েছি; যা চেয়েছি—পাইনি। একটু সুখ, একটু শান্তি, একটু নিশ্চিন্ত ভালবাসা, যা আমার কাঙাল মন চিরদিন চেয়ে এসেছে—পেল না।

শবনম, তোমার সঙ্গে আমার সেই প্রথম আলাপের দিনটার কথা মনে আছে? আমার বিশ্বাস তোমার মনে নেই। তোমার মন বড় ভুলো। তুমি কি আজও সেই রকম আছো? সেই সরল, সাধারণ, হাসিখুশি, প্রাণচঞ্চল? যার জন্যে তোমাকে আমার অত ভাল লাগতো। তুমি কি সেই রকমই আছো শবনম?

এখন মনে পড়ছে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিনটার কথা। দাক্ষিণাত্যে এসেছি প্রায় মাস তিনেক পার হয়ে গেছে তখন। এসেছিলাম সফরের (জ্যৈষ্ঠ) মাঝামাঝি, মাঝে রবিওয়াল (আষাঢ়) পার হয়েছে, চলে গেছে রবিউস্‌সানি (শ্রাবণ), শুরু হয়েছে জমাদিওয়াল (ভাদ্র)। তিনটে মাসে ভাল লাগার মত কিছু ঘটেনি বললেই চলে। প্রতিদিনের সেই একই চিত্র। আগ্রা আর দাক্ষিণাত্যের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সেই শেষ রাত্রি থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত একটা দিনকে পার করা। হারেমের সেই একই চিত্র। খাওয়া-দাওয়া, সাজ-গোজ, গালগল্প, ঔরংজীবের বিবিদের মধ্যে রেষারেষি। আর দুপুরে সুবেদারের দপ্তরের কর্মচারীদের বিবিদের তদবির তদারক করতে আসা। আগ্রাতে প্রতিদিনের এসব দৃশ্য অসহ্যবোধ হত বলেই পালিয়ে এসেছিলাম। এসে তিন মাসের অভিজ্ঞতায় দেখলাম, সেই একই জিনিস। নতুনত্ব বলে কিছু নেই। ভাবছিলাম, আর নয়। এবার ভাইজানকে বলে আগ্রায় ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে ভাষা নিয়ে খুবই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বাঁদীরা প্রায়ই স্থানীয়। ভাষা বুঝিনা। খালেদা আসেনি তাকে বলেছিলাম সঙ্গে আসার জন্য। সে বলেছিল, তোমার ইচ্ছে হয়েছে, যাচ্ছ যাও। আমাকে আবার দূর দেশে নিয়ে যাবার সখ কেন? যদি নিয়ে যাবার দরকার বোঝ তাহলে তোমার কি বাঁদীর অভাব? তাদের মধ্যে থেকে দু-দশটাকে সঙ্গে নিয়ে যাওনা কেন?

বলেছিলাম, আমি জানতে চাইছি তুমি যাবে কি-না?

খালেদা বলেছিল, এ যাত্রায় তোমাকে খুশি করতে পারলাম না গো।

বলেছিলাম, ভনিতা না করে সোজা কথা বলনা কেন, তুমি যাবে না।

খালেদা বলেছিল, ওমা, তা কি বলতে পারি? শাহাজাদীর হুকুম মানছি না, কথাটা যদি জাহাঁপনার কানে গিয়ে পৌঁছায় তাহলে কি আর রেহাই পাব ভেবেছো, বেয়াদপির জন্যে ঠিক কোতল করবেন।

বিরক্ত হয়েছিলাম। বলেছিলাম, তাহলে বলছো তুমি যাবে না?

– বাতের ব্যথাটা সত্যিই বড় বেড়েছে বুঝলে। খালেদা বলেছিল, বেতোরুগী নিয়ে খবরদার কখনো পথে বেরুতে নেই। বেতোরুগী শান্তি নষ্ট করে দেয়। যাচ্ছ যাও। সাবধানে থাকবে। রাতে ভাল করে শরীর ঢেকে শোবে। ঠাণ্ডা লাগা ধাত তোমার। খালেদা থাকবে না। রাতে সাতবার উঠে কি ভাবে ঘুমাচ্ছে দেখবে। আর যদি ইচ্ছে করো ফিরোজা ছুঁড়িটাকে নিয়ে যেতে পার। ছুঁড়ির একটু বার টান আছে ঠিক কথা, কাজ-কম্ম করে মন দিয়ে।

বলেছিলাম, থাক কারো জন্যে তোমাকে ওকালতি করতে হবে না। আমি কাউকেই সঙ্গে নিয়ে যাব না। নিজের কাজ নিজেই করে নেব।

—তা ভাল। নিজের কাজ নিজে করে নিলে শরীর ভাল থাকবে। কিছু না করে করেই তো শরীরে মেদ বাড়ছে। ওই যে সেলাই করো, লতা পাতা, ফুল পাখির নক্সা তোল, ওটা কাজ নাকি? রাস্তার ধারে বসে আজকাল মরদগুলোও ওসব করে। এমন কিছু করো শরীরটা যাতে ঠিক থাকে। শরীরটা ঠিক থাকলে মনটাও ভাল থাকবে। দিন দিন মনটা তোমার তিরিক্ষে হয়ে যাচ্ছে।

ভাল লাগেনি খালেদার অনর্গল কথা বলা। সরে গিয়েছিলাম। চলে এসেছিলাম নিজস্ব কোন বাঁদী না নিয়েই। সেজন্য তিনটে মাসে অসুবিধাও কম হয়নি। বিশেষ করে মাসের তিনটে দিন বড় কষ্ট হয়। সে সময় স্নেহময়ী মায়ের মত খালেদা সব সময় কাছে কাছে থাকে। দাওয়াই এনে দেয়। খেতে পারি না তিনটে দিন। জোর করে খাইয়ে দেয় খালেদা।

যদিও দাক্ষিণাত্যে আসার সময় খালেদা সব কিছু ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। বুঝিয়ে দিয়েছিল ভাল করে। কিন্তু তিনটে মাসের নটা দিন বড় কষ্টে কেটেছে। বার বার মনে পড়েছে খালেদার কথা। তাছাড়া আরো অনেক কারণে মনটা ভাল ছিল না। বড় একঘেয়ে লাগছিল। ভাবছিলাম আগ্রায় ফিরে যাব।

ঠিক সেই সময় তোমার সঙ্গে আমার দেখা।

সেদিন কোন একটা উৎসব ছিল। উৎসবটা যে কি আজ আর মনে করতে পারছি না। শুধু এইটুকু মনে আছে সেদিনটা ছিল জুম্মাবার আর সুবেদারের সব দপ্তর ছিল বন্ধ।

সকাল বেলাতেই তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভোরে উঠে নিজের কাজ সেরে নমাজ পড়ে বাইরের বাগিচায় গিয়ে বসেছিলাম। সকালের মিঠে রোদ উঠেছিল। পাখি ডাকছিল। বাগিচায় তখন অনেক ফুল ফুটেছিল। সেসব দেখতে দেখতে ভাল লাগা সকালটা পার হয়ে গিয়েছিল। এক সময় বাঁদী গিয়ে দাঁড়িয়েছিল কাছে।

জিজ্ঞাসা করতে জেনেছিলাম, নাস্তা করতে ডাকছে। কিন্তু সকালে নাস্তা আমি করি না। সেই ছোট বেলা থেকেই খেতে আমার খুবই কষ্ট হয়। মনে আছে এক সময় আমাকে জোর করে খাওয়ানো হোত। তারও আগে খুব ছোট বয়েসে একটু বেশি খেলেই বমি হয়ে যেত। তাছাড়া পরিমাণে খুবই কম খাই। সেই জন্যই বোধ হয় ছোট বেলার অত রোগা ছিলাম।

এখনও খাওয়ার আমার খুবই ঝামেলা। ঘি খাইনা। দুধ দেখলে গা গোলায়। মাংস খাই কখনো-সখনো দু-এক টুকরো। একটু আধটু ফল। দুটো চাপাটি। সামান্য চাউল। একটু দাল, ভাজি আর একটু আচার। খালেদা দুঃখ করে বলে, বাদশার মেয়ে হলে কি হবে, পেট তোমার গরীবের।

হ্যাঁ সেদিন বাঁদী আমাকে নাস্তা করার জন্য ডাকতে এসেছিল। অবাক হলেও উঠেছিলাম। হারেমে ঢোকার মুখে তোমার সঙ্গে দেখা। তুমি আমাকে দেখে সম্মান জানিয়ে হাসি মুখে একটু সরে দাঁড়িয়েছিলে পথ করে দিতে। তোমার সঙ্গে একটা ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে ছিল। সেও তোমাকে ধরে সরে দাঁড়িয়েছিল।

কৌতুহলী হয়ে উঠেছিল আমার মনটা। তোমাকে দেখেছিলাম। তোমার মুখের পবিত্র নিষ্পাপ ভাবটা আমার চোখে ধরা পড়েছিল। অথচ দেখতে তুমি অতি সাধারণ। প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কে?

মৃদু গলায় তুমি উত্তর দিয়েছিলে, আমি শবনম।

—শবনম! তোমার বাচ্চাটি খুবই সুন্দর দেখতে হয়েছে?

—জী, হাঁ, লয়লা ওর আব্বাজানের মতই দেখতে হয়েছে। মুখ টিপে একটু হেসেছিলে তুমি।

আর তোমার সেই হাসিটুকু আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। বলেছিলাম, তোমার পরিচয় কি?

—আমি কোতোয়ালের বিবি (নগরের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষক)।

—কোতোয়াল সাহাবের বিবি তুমি? হেসে ফেলেছিলাম আমি।

—আপনি হাসছেন জনাব? প্রশ্ন করেছিলে তুমি।

লজ্জা পেয়েছিলাম তোমার প্রশ্নে। বলেছিলাম, দেখো, কিছু মনে কোরনা তুমি। তোমাকে উপহাস করার জন্য আমি হাসি নি। নগর কোতোয়াল খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ। লেকিন, তুমি খুবই ছেলে মানুষ। কোতোয়ালের উমরও খুব একটা বেশি নয়। অথচ তোমার খসম যে পদে আছেন, শুনেছি সেসব পদে খুবই উমরওলা আদমী বসে।

তুমি বলেছিলে, আপনি ঠিকই শুনেছেন জনাব। মিয়াকে আমিও সে কথা বলি। বলি কোতোয়াল হবার উপযুক্ত তুমি নও। তোমাকে ওই পদে মানায় না। তুমি যদি 'মীর সামান' (সরকারী কারখানা সমূহের অধ্যক্ষ) হতে তাহলে তোমাকে মানাতো। বিশ্বাস করুন, আমি এতটুকু মিথ্যা বলছি না। মিয়ার আমার বুদ্ধি-

সাদি একবারেই ভাল নয়। কোই কাম কা নেহি।

তোমার বলার ধরনে হাসি পেয়ে গিয়েছিল। কোনরকমে হাসি চেপে বলেছিলাম শবনম, তোমাকে আমার বেশ ভাল লাগছে। তোমাকে তুমি বলছি বলে কিছু মনে কোরনা। আমার মনে হয় বয়েসে তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট। ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে কথা বলি। তুমি কি আজ দুপুরে আসবে?

তুমি আমার দিকে চেয়ে বলেছিলে, আজ্ঞে না দুপুরবেলা আমার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। সে সময় আমি খুবই ব্যস্ত থাকি। দেখুন না আজ তিনমাস হল সুবাদার এসেছেন। অনেকের বিবিই দুপুরে এসে দেখা করে গেছে। আমার সময় হয়নি। অথচ মিয়া বহুবার বলেছেন, একবার অন্তত দেখা করে যাবার জন্য। এটা নাকি নিয়ম। লেকিন, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কোথাও বেরুতে আমার একবারেই ইচ্ছা করে না। নেহাৎ আজ উৎসবের দিন। মওকা বুঝে দেখা করে গেলাম। দোষ কেটে গেল কি বলেন জনাব?

হাসি চেপে বলেছিলাম, তা অবশ্য ঠিক। লেকিন দুপুরে আসার তো মজা আছে। তোমার খসমের জন্য তদ্বির করতে পারতে।

—তদ্বির। কিসের তদ্বিরের কথা বলছেন জনাব? অবাক হয়েছিলে তুমি।

বলেছিলাম, তদ্বির বোঝ না?

—তা বুঝবো না কেন। তুমি বলেছিলে, দুপুরে যারা সুবাদারের বিবিদের কাছে আসে, কেন আসে জানি। কেউ কেউ আমাকেও তাদের সঙ্গে আসার জন্য বলে। বলে এই জন্য আমাকে তারা ভালবাসে। বলে, আমার সঙ্গে চল। ভাল-ভাবে পরিচয় হবে। একটু দহরম মহরম হয়ে থাকা ভাল। সময়ে অসময়ে কখন কি কাজে লাগে কে বলতে পারে। লেকিন আমার ভাল লাগে না।

—কেন ভাল লাগেনা, কেন?

—দুপুরে একটু নিদ্ না দিলে আমার চলে না। তাছাড়া মিয়াও পছন্দ করে না এসব। তিনি নোকরী করে যা পান তাতেই আমাদের বেশ আরামে চলে যায়। মিয়ার আমার লালচ বেশি নেই। আর আমিও রোজ একবার করে হুঁশিয়ার করে দিই। বলি, আমাকে যা ঠকানোর ঠকিয়েছো, লেকিন কোন আদমীকে ঠকাবে না। কোন আদমীর অযথা ক্ষতি করবে না। আল্লার দোয়া তাহলে পাবেনা।

বলেছিলাম, আল্লার ওপর তোমার এত বিশ্বাস?

—কেন বিশ্বাস হবে না জনাব? অবিশ্বাসের বিষে জর্জরিত না হয়ে বিশ্বাসের আলোয় বেশ তো পথ চলতে পারছি। তিনি কম কি দিয়েছেন। নসিবে যা লেখা আছে তার বেশি তো মিলবে না জনাব। মিথ্যে লোভের ফাঁদে তাহলে কেন পা দিই?

তোমার কথা শুনে খুবই ভাল লেগেছিল। তোমার দুচোখে আলো দেখেছিলাম, বলেছিলাম, আচ্ছা শবনম, এই যে আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কথা বলছো তুমি আমি কে তা তুমি জানো?

মুচকি হেসে তুমি বলেছিলে, জানি জনাব। আপনি সুবাদারের বহিন সম্রাট শাজাহানের কন্যা রোশেনারা!

বিস্মিত হয়েছিলাম। বলেছিলাম, তুমি আমাকে চিনলে কেমন করে? আমি তো অতি সাধারণ ··

বাধা দিয়ে হেসে তুমি বলেছিলে, আগুনকে কি চাপা দিয়ে রাখা যায় শাহাজাদী?

—তুমি কি আমাকে তোষামোদ করছো শবনম?

—ওই জিনিসটা এখনও আমি রপ্ত করে উঠতে পারিনি শাহাজাদী। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলে তুমি।

তোমার উত্তর শুনে হেসে ফেলেছিলাম। তোমাকে নিয়ে বাগিচায় গিয়ে বসেছিলাম আবার। তোমার কন্যা সেখানে খেলা করেছিল। তোমার সঙ্গে গল্প করেছিলাম।

এক সময় বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলে। বলেছিলাম, এবার যেদিন আসবে তোমার বাচ্চাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। বড় সুন্দর তোমার বাচ্চাটি।

মৃদু কণ্ঠে তুমি বলেছিলে, হ্যাঁ, বড় সুন্দর বাচ্চাটা শাহাজাদী। মাটি স্পর্শ করার আগে বৃষ্টির ফোঁটার মতই পবিত্র। তবে, লায়লার আম্মা যদি ছাড়ে নিশ্চয়ই ওকে সঙ্গে নিয়ে আসবো।

তোমার উত্তর শুনে আম স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। হাসি মুখে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলে তুমি।

১০

শবনম, বুকের গভীরে ক্ষত, সেখান থেকে প্রতিনিয়ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে, যন্ত্রণায় পাঁজর কাঁপিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু মুখে যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নেই। নির্মল হাসিতে সবসময় তুমি উজ্জ্বল। শবনম, তুমি কি? তোমাকে যত দেখেছি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। আত্মার আত্মীয় বলে মনে হয়েছে তোমাকে। মিল খুঁজেছি তোমার সঙ্গে। একাত্ম হতে চেয়েছি। প্রতিনিয়ত এক দুর্বার আকর্ষণে আকর্ষিত হয়েছি। তোমাকে আমি যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছিলাম শবনম।

শবনম, কিছুদিন হল নিজেকে নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে আছি আমি। আমার মনে অজস্র প্রশ্ন। কাকে জানাই. উত্তর খুঁজি। তোমার কথা তাই বড় বেশি করে মনে পড়ে। জানিনা এসব প্রশ্নের উত্তর তোমার জানা আছে কি না। আমি তো তোমাকে জানিয়ে হালকা হতে পারতাম। দুজনে মিলে উত্তর খুঁজতাম। আজ বোবার কান্নার মত অবস্থা আমার। বুকের গভীরে গুমরে মরি। চোখ ফেটে জল আসতে চায়, কাঁদতে পারি না। কাঁদতে পারলে মনে হয় বুকটা অনেকখানি

হালকা হয়ে যেত। তা নয়, যত দিন যাচ্ছে বুকের মধ্যে বোঝা বাড়ছে। কি যে করি আমি।

খালেদা বোধ হয় কিছু বুঝতে পারে। সেই ছোট বয়েস থেকে দেখছে। মুখ দেখে মাঝে মাঝে অনেক কিছুই অনুমান করে। সেদিন বলেছিল, মনটাকে শক্ত হাতে বাঁধো। বিপত্তি ঘটলে নিজে নিজেই কষ্ট পাবে। সংসারে যে যার। কেউ কারো নয়।

বলেছি, তুমি আছো কিসের জন্যে ?

—আমি ! খালেদা ঝঙ্কার দেয়নি। একটু যেন ভেবেছে। ম্লান গলায় বলেছে, না থাকলেই বোধ হয় ভাল হতো। এই কষ্ট আর আমাকে ভোগ করতে হতো না।

—কষ্ট ! কিসের কষ্ট তোমার খালেদা ? তুমি কি খুবই কষ্টে আছো ?

—খুব কষ্টে আছি কিনা জানি না। খালেদা বলেছিল, তবে কষ্ট পাই। কষ্ট পাই ছোটবেলার সেই ডাকাবুকো মেয়েটার কথা মনে পড়লে। যে মেয়েটা একদিন সবকিছু তছনচ করে দিত। যার ভয়ে সকলে তটস্থ থাকতো, সেই মেয়েটা আজ একি হয়ে গেলে বলতো ? রেগে গেলে চোখ দুটো তোমার জ্বলে উঠতো। দেখতুম, সেই বয়েসে তোমার চোখের দিকে কেউ তাকাতে পারতো না, তোমার মুখের ওপর কেউ কথা বলে এমন সাধ্যি কারো ছিল না সেদিন, সেই তুমি একি হয়ে গেলে ; এও আমাকে এই বুড়ো বয়েসে দেখতে হচ্ছে ?

বলেছিলাম, তুমি কি আমাকে এখনও সেই ছোটটি ভাব নাকি খালেদা ?

—ছোটটি ভাববো কেন ? খালেদা বলেছিল, তুমি যে অনেক বড় হয়েছো, তোমারও বয়েস হয়েছে তা আমিও জানি। অনেক ঝড়-ঝাপটা তোমার ওপর দিয়ে গেছে। অনেক কষ্ট, যন্ত্রণা সহ্য করেছো। সব সত্যি। কিন্তু, এ তোমার কি হয়েছে ?

—কি হয়েছে ?

—সেটাই তুমি বুঝতে পারছো না। এভাবে ভেবে ভেবে যে মরে যাবে। না, না, এভাবে দিন-রাত মুখ গোমড়া করে চুপ চাপ বসে থেকনা। কিছু একটা করো। অনুনয় ঝরে পড়েছিল খালেদার কণ্ঠে।

কি করি ? ভেবেছি অনেক। আমার যে কিছুই করার নেই। জীবনের এতগুলো বছর পার হয়ে গেল। কি করলাম ? কিছুই করিনি। কিছু করা হল না।

মনের এই অবস্থায় স্বপ্ন দেখলাম। বড় আশ্চর্য স্বপ্ন। এখন গোল গম্বুজের ধ্যান ঘরে বসে ভাবছি সে কথা। আমার দেখা আশ্চর্য স্বপ্নের কথাগুলো।

অলস মধ্যাহ্ন ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে অপরাহ্নের দিকে। পশ্চিমের আকাশটা লাল হয়ে উঠছে একটু একটু করে। কদিন হল উত্তুরে বাতাস মাঝে মাঝে হানা দিচ্ছে। শীত আসছে।

শবনম, মনে আছে তোমার? এমনি এক শীতের দিনে একজনের কথা শুনিয়েছিলে তুমি। একজন মানুষের কথা। তাঁর স্বপ্নের কথা। সার্থকতার পথ খোঁজা! অসম্ভবকে তিনিই তো সম্ভব করেছিলেন, স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন একটি শিশুর মনে। একটা জাতির উত্তরণের পথনির্দেশ করেছিলেন। দাদাজী কোণ্ডদেব!

শাহজী ছিলেন আহম্মদনগরের অন্যতম সেনানায়ক ও পুণার জায়গীরদার। সে সময় (১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) গৃহবিবাদের ফলে আহম্মদনগর শক্তিহীন। শাজাহান নিজামশাহী শক্তির কেন্দ্র দৌলতাবাদ আক্রমণ করলেন। মসনদে তখন নিজামশাহী বংশের নাবালক সুলতান। মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ হল আহম্মদনগরের সৈন্যদের। শাহজী ভোঁসলে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে অনেক চেষ্টা করেছিলেন দৌলতাবাদ রক্ষা করার। কিন্তু সম্ভব হল না। মুঘল সৈন্যদের আক্রমণে নিজামশাহী সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। দৌলতাবাদ অধিকার করলেন শাজাহান। বন্দী হলেন নাবালক সুলতান। আহম্মদনগর চিরতরে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে গেল।

শাহজী বসে রইলেন না। বিজাপুরের সুলতান মুহম্মদ আদিলশাহ শাহজীকে নিজের রাজ্যে আমন্ত্রণ জানালেন। সুলতানের সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন শাহজী। সুলতান তাঁকে কর্ণাটকে জায়গীর এবং উচ্চপদে নিয়োগ করলেন।

পুণা ত্যাগ করে চলে যাবার আগে শাহজী শেষবার শিবেন দুর্গে এলেন। দেখা করলেন পত্নী জীজাবাঈয়ের সঙ্গে। জন্মের পর প্রথম দেখলেন পুত্রকে। শিশু শুধু মাত্র আগন্তুককে একবার দেখেই খেলায় মন দিল। জন্মের পর থেকে (১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে) পিতা শিশুর কাছে অপরিচিত।

জীজাবাঈ সেদিন অনেক কষ্টে দীর্ঘশ্বাসটাকে বুকে চেপে রেখেছিলেন। দেবগিরির জায়গীরদারের কন্যা জীজাবাঈয়ের বাল্য কৈশোরের দিনগুলো সুখেই অতিবাহিত হয়েছিল। নিষ্ঠাভরে বার ব্রত পালন করেছেন। ভক্তিভরে মহাকালের পুজো করেছেন। যৌবন সমাগমে পাত্রস্থ করেছেন পিতা। ধন্য হয়েছেন জীজাবাঈ। জীবন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সুখের আবেশে ভরে গেছে দেহ-মন। কেটে গেছে দিন, মাস, বছর।

একদিন কিসের যেন অভাব অনুভব করেছেন জীজাবাঈ। স্বামী কখনো আহম্মদনগরে রাজকার্যে ব্যস্ত থাকেন, কখনো পুণায় শিবেন দুর্গে। যখন কাছে থাকেন, তখন স্বামীর সেবায় কিভাবে দিন-রাত্রির প্রহরগুলো কেটে যায় বুঝতে পারেন না। কিন্তু যখন দূরে থাকেন, তখন দিন কাটতে চায় না; রাত্রির প্রহরগুলো বড় দীর্ঘ মনে হয়। একাকী শয্যায় ঘুম আসে না। এলোমেলো চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মন। স্বামীকে বলেন, আমার ভাল লাগে না।

পত্নীর মুখের দিকে সস্নেহে চেয়ে থাকেন শাহজী। শান্ত কোমলা জীজাকে দেখেন। কৌতুক কণ্ঠে বলেন, কি ভাল লাগে না জীজা, আমাকে?

—আমি কি তাই বললাম ?

—কি ভাল লাগে না তোমার ?

—বড় ভয় করে আমার।

পত্নীকে কাছে টেনে নিয়ে শাহজী বলেন, এই তো আমি রয়েছি। কিসের ভয় তোমার ?

– কিন্তু তুমি যখন থাক না ?

সত্যি তো! চিন্তিত হন শাহজী। বলেন, তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে চাও জীজা। যদি তাই চাও তা হলে সেই মত ব্যবস্থা করি। আমি তোমাকে এবার তাহলে সঙ্গে নিয়ে যাব।

জীজা বলেন, আমি কি একবারও সঙ্গে যাবার কথা বলেছি।

অবাক হন শাহজী। বলেন, এই বললে ভাল লাগে না। আবার বললে, একা একা ভয় করে। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

– তুমি কিছুই বোঝ না। অভিমানে ঠোঁট ফোলান জীজা। পাঁচটা বছর কেটে গেল। এখনও···

বুঝতে পারেন শাহজী। জীজাকে দু হাতে কাছে টেনে নিয়ে গভীর কণ্ঠে বলেন, তাই বল। সান্ত্বনা দেন স্ত্রীকে, এত ব্যস্ত হবার কি আছে। আমরা কি বুড়ো হয়ে গেছি ?

—তা নয়। আমার ভয় করে, মনে হয় কোন দিন যদি আমি মা হতে না পারি। বলেন জীজাবাঈ। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ। শাহজী স্ত্রীকে বুকের গভীরে টেনে নিয়ে বোঝান। বাইরে রাত্রি বাড়ে।

এর কিছু দিন পরে জীজাবাঈয়ের শরীরে মাতৃত্বের লক্ষণ দেখা যায়। অভ্যন্তরে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেন তিনি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। ভগবান শঙ্কর তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। তিনি মা হতে চলেছেন।

সংবাদ গেল আহম্মদনগরে শাহজীর কাছে। অনেক দিন তিনি পুণায় আসেন নি। সংবাদ পাওয়ার কদিন পরে তিনি সকালে এলেন। কিন্তু জীজাবাঈ লক্ষ্য করলেন স্বামী গম্ভীর, কিছুটা অন্যমনস্ক। ভয়ে ভয়ে এক সময় জানতে চাইলেন, তোমার কি শরীর ভাল নেই ?

—শরীর ? স্ত্রীকে দেখলেন শাহজী। বললেন, না, শরীর ভালই আছে আমার।

—তাহলে ? উৎসুক নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন জীজাবাঈ।

একটু নীরব থাকার পর শাহজী বললেন, না সে সব কিছু নয়। এখন বল, জরুরী সংবাদ কেন পাঠিয়েছো ?

না, কোন কথাই বলতে পারলেন না জীজাবাঈ। ভাবলেন স্বামী যখন এসেছেন, তখন এক সময় বললেই হবে। কিন্তু বলার সময় জীজাবাঈ পেলেন না। আহারাদির

পর আহম্মদনগরে ফিরে গেলেন শাহজী। চলে যাবার কয়েক মুহূর্ত আগে, জীজাবাঈ সবেমাত্র আহার শেষ করেছেন, তিনি বললেন, জীজা, এখনই আমাকে আহম্মদনগরে ফিরে যেতে হবে।

বিস্মিতা জীজাবাঈ কোন কথাই বলতে পারলেন না। ফ্যাল ফ্যাল করে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শাহজী বললেন, দাদাজীর কাছে আমি সব শুনেছি। তাঁকে সব বলে গেলাম। তিনি তোমাদের দেখাশোনা করবেন।

চলে গিয়েছিলেন শাহজী। জীজাবাঈ স্থির পাষাণ প্রতিমার মত স্বামীর চলে যাওয়া পথের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়েছিলেন।

পার হয়েছিল দিন। মাস। যথা সময়ে শিবেন দুর্গে জীজাবাঈয়ের কোল আলো করে জন্মগ্রহণ করল এক পুত্র-সন্তান। দাদাজী কোণ্ডদেব নবজাতকের নাম রাখলেন শিবাজী।

দাদাজী কোণ্ডদেব। শাহজীর জনৈক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ কর্মচারী। বিপত্নীক বৃদ্ধ। সংসারে আপনজন বলতে কেউ নেই। শাহজীর জায়গীর দেখাশোনা করেন। কিছুটা আপনভোলা প্রকৃতির মানুষ। শাহজী তাঁর হেফাজতে গর্ভবতী স্ত্রীর দেখা-শোনার দায়িত্ব ভার তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। নবজাতকের দায়িত্বভারও তিনি স্বেচ্ছায় নিজের হাতে তুলে নিলেন। নতুন করে জড়িয়ে পড়লেন সংসারের বাঁধনে।

পার হতে লাগলো দিনের পর দিন। মাস। বছর প্রায় শেষ হয়ে এল।

একদিন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সামনে গিয়ে নত মুখে দাঁড়ালেন জীজাবাঈ।

বুঝতে পারলেন ব্রাহ্মণ। কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কিছু বলবে মা?

মৃদু কণ্ঠে জীজাবাঈ বললেন, শিবার কথা কি··। কথাটা শেষ করতে পারলেন না তিনি।

কোণ্ডদেব উত্তর দিলেন, যথা সময়েই পুত্র জন্মের সংবাদ আমি আহম্মদনগরে পাঠিয়ে দিয়েছি মা। আমার দিক থেকে কোন ত্রুটি রাখিনি।

—তাঁর কোন সংবাদ?

—তিনি ভাল আছেন। সুস্থ আছেন। বললেন কোণ্ডদেব। শাহজীর জন্য কোন দুশ্চিন্তা কোর না।

—তিনি কি পুণায় আসবেন?

জীজাবাঈয়ের প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলেন না তিনি। কিন্তু কতদিন নীরব থাকবেন? একদিন জীজাবাঈয়ের কাছে সত্য প্রকাশ করলেন দাদাজী কোণ্ডদেব। জানালেন শিবাজীর জন্মের আগেই শাহজী তুকাবাঈ নামের একটি মেয়ের সঙ্গে আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। শাহজী তাঁর নব পরিণয়ের কথা জীজা-বাঈয়ের কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেছিলেন। তাঁকে জীজাবাঈয়ের অভিভাবক নিযুক্ত করে সত্য প্রকাশের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষ কারণে এতদিন সে কথা তিনি প্রকাশ করেননি। তার জন্য জীজাবাঈয়ের তাঁকে মার্জনা করে।

বৃদ্ধের কথা শুনে অনেকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন জীজাবাঈ। নিজেকে সংযত করে শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন, কি এমন বিশেষ কারণ দাদাজী, যার জন্য এ সংবাদ এতদিন আপনি আমার কাছে গোপন রাখার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন ?

শান্ত কণ্ঠে দাদাজী উত্তর দিয়েছিলেন, তোমার গর্ভস্থ সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই আমি সত্য গোপন করতে বাধ্য হয়েছিলাম মা।

—আমার গর্ভস্থ সন্তানের ভবিষ্যৎ...।

—হ্যাঁ মা। বাধা দিয়ে দাদাজী বলেছিলেন, হঠাৎ আঘাত পেয়ে তুমি হয়তো নিজেকে সামলাতে পারতে না মা। কান্নাকাটি করতে। দুশ্চিন্তায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করতে। তাতে তোমার গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হ'ত মা!

অকাট্য যুক্তি। অস্বীকার করতে পারেন নি জীজাবাঈ। নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিলেন। দাদাজী বলেছিলেন, মা, মনকে শক্ত করো। মন-প্রাণ দিয়ে সন্তানকে মানুষ করে তোল। সন্তান তোমার একদিন সব দুঃখ দূর করবে। সন্তান গর্বে গর্বিতা জননী ভুলে যাবে সেদিন অতীতের সব মালিন্য।

তাই হয়েছিল। সব ব্যথা বেদনা রাগ অভিমান ভুলে গিয়েছিলেন জীজাবাঈ। শুধু মা আর সন্তান।

একটু একটু করে বড় হয়ে উঠতে লাগলো শিশু। হয়ে উঠতে লাগলো দুরন্ত। দাদাজী শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এতই দুরন্ত শিক্ষাগ্রহণের জন্য বসলে তবে তো।

চিন্তিত দাদাজী বলেন, শিবা, পড়াশোনা যে শিখতে হবে ভাই।

শিশু উত্তর দেয়, ওসব শিখে কিছু হবে না দাদু।

—কেন, কিছু হবে না কেন ?

—আমার ভাল লাগে না।

—তবু তোমাকে শিখতে হবে।

—যা আমার ভাল লাগে না তা আমি শিখবো না।

—তাহলে তুমি কি করবে দাদু ?

—আমি যুদ্ধ করবো। পড়া শেখার চেয়ে যুদ্ধ শেখা অনেক ভাল।

দাদাজী কোন মতেই শিশুকে পাঠগ্রহণে বসাতে পারেন না। জীজাবাঈকে বলেন। তিনিও চিন্তিতা। অথচ প্রতি রাত্রে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শোনা চাই। ঘুমে চোখ বুজে আসে। তবু বলে, তারপর কি হল মা ? ভীম সেন কি শেষ পর্যন্ত বক রাক্ষসকে বধ করতে পারল ?

সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর দাদাজী সিদ্ধান্ত নিলেন, জোর করে পুঁথির পাতা পাঠ করিয়ে কি লাভ, শিবাজী তার ইচ্ছা মতই বড় হয়ে উঠুক। বড় হয়ে যদি কোনদিন লেখাপড়া শেখার দিকে তার মন আকৃষ্ট হয়, তখন না হয় পাঠাভ্যাস করার ব্যবস্থা

করবেন।

এমন সময় আহম্মদনগর মুঘল অধিকারে চলে গেল। বিজাপুর সুলতানের অধীনে নতুন কর্মগ্রহণ করলেন শাহজী। বিজাপুর যাওয়ার পূর্বে শিবেন দুর্গে এসে জীজাবাঈয়ের সামনে দাঁড়ালেন।

দীর্ঘদিন পরে স্বামীকে দেখলেন জীজাবাঈ।

শাহজী বললেন, জীজা আমি তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি।

—কোথায়? শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন জীজাবাঈ।

শাহজী বললেন, আমি বিজাপুর সুলতানের কাছে নতুন কর্মগ্রহণ করেছি। সুলতান কর্ণাটকে নতুন জায়গীর দিয়েছেন। আমি সেখানেই তোমাদের নিয়ে যাব।

মৃদু কণ্ঠে জীজাবাঈ বললেন, আমরা এখানে বেশ ভাল আছি।

জীজাবাঈয়ের উত্তরে শাহজী একটু সংকুচিত হলেন। দীর্ঘদিন পরে তিনি স্ত্রীর মুখোমুখি হয়েছেন। তাকে দেখছেন। কি বিরাট পরিবর্তন হয়েছে সেই মেয়েটির। এ যেন তাঁর পরিচিতা সেই জীজা নন। কোন এক ধ্যানমগ্না যোগিনী যেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পরিবর্তন এসেছে চেহারায়, পরিচ্ছদে। তবু তিনি বললেন, আমি শিবাজীর কথা বলছিলাম।

—শিবা!

শাহজী বললেন, এই শিশু বয়সেই কিছু সঙ্গী নিয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। পাঠাভ্যাস করতে বসে না। এভাবে তো চলতে পারে না।

ক্লান্ত দৃষ্টিতে শাহজীর মুখের দিকে তাকালেন জীজাবাঈ। বললেন, শিবাকে নিয়ে কি করতে চান আপনি?

—আমি ওকে বিজাপুরে নিয়ে যেতে চাই।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো জীজাবাঈয়ের। মৃদু কণ্ঠে তিনি বললেন, সন্তান আপনার। সন্তানের মঙ্গলের জন্য আপনি যদি তাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চান, আমার আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন।

—আর তুমি? প্রশ্ন করলেন শাহজী। আমি যে তোমাকেও নিয়ে যেতে চাই।

—আমাকে? ম্লান এক টুকরো হাসির সূক্ষ্মরেখা জীজাবাঈয়ের ওষ্ঠে ফুটেই মিলিয়ে গেল। মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন, আজ আর তা সম্ভব নয়।

ব্যাকুল কণ্ঠে শাহজী বললেন, আমি যে অনেক আশা নিয়ে এসেছি জীজা!

নাম ধরে ডাক শুনে বুকের মধ্যটায় বারেক কেঁপে উঠেছিল জীজাবাঈয়ের। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিয়েছিলেন। তেমনি মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, আজ ওসব কথা থাক। পথশ্রমে আপনি ক্লান্ত। বিশ্রাম করুন। আমি আপনার আহারাদির ব্যবস্থা করি।

স্থানান্তরে চলে গিয়েছিলেন জীজাবাঈ।

শাহজী বসেছিলেন স্তব্ধ হয়ে। জীজাবাঈ নাম্নী সেই সরল অতি সাধারণ গ্রাম্য মেয়েটির এই পরিবর্তন কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। এই দৃঢ়তা, অনমনীয় মনোভাব কোথায় পেল? দীর্ঘ কয়েক বছরের বিবাহিত জীবনে দেখেছেন, ভীরুতা, কোমলতা, সরলতা। এ যেন অন্য জীজা। একে তিনি চেনেন না, কোন দিন দেখেন নি।

দাদাজী কোণ্ডদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন শাহজী। বললেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখছি না ব্রাহ্মণ।

দাদাজী স্মিত মুখে নীরব রইলেন।

শাহজী বললেন, আমি কোন মতেই রাজি করাতে পারলাম না।

দাদাজী প্রশ্ন করলেন, তাহলে কি করবেন?

জীজা তার পুত্রকে নিয়ে যেতে বলছেন।

—সেটা কি উচিৎ হবে?

—সেটাই স্থির করতে পারছি না। চিন্তিত শাহজী প্রশ্ন করলেন, আপনি কি বলেন?

—আমি! অসহায় বোধ করলেন দাদাজী। বললেন, স্ত্রী-পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভার আপনি আমাকে দিয়েছেন, আমি তা পালন করার চেষ্টা করছি। পুত্র আপনার নিরক্ষর থাকুক এটা চাই না বলেই আপনাকে জানিয়েছি। এটুকু জানি, জন্মের পর থেকে শিশু মা ভিন্ন কাউকে জানে না, চেনে না এবং প্রচণ্ড মাতৃভক্ত সন্তান আপনার। এখন আপনিই স্থির করুন কি করবেন। জীজা মা যখন সন্তানকে আপনার হাতে তুলে আপত্তি করেন নি, আপনি জোর করে তাকে নিয়ে যেতে পারেন।

শুনে চিন্তা করেছিলেন শাহজী। এক সময় বলেছিলেন, জোর করা আমার শোভা পায় না দাদাজী।

বিবেকের দংশন। নীরব ছিলেন তিনি।

এক সময় শাহজী বলেছিলেন, এখন শুনুন, আপনি কি করবেন। কর্ণাটকের জায়গীর পরিচালনার জন্য আপনার মত একজন বিশ্বস্ত মানুষের বড় প্রয়োজন আমার।

দাদাজী বলেছিলেন, শাহজী, আপনার প্রস্তাব আমি চিন্তা করে দেখেছি। যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার। আগের মত সে কর্মক্ষমতা আজ আর আমার নেই। এখন আবার নতুন করে কিছু করতে ভয় হয়। একটু নীরব থাকার পর হেসে ফেলেছিলেন। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, তাছাড়া এই বৃদ্ধ বয়সে একটু মায়ার বাঁধনেও বাঁধা পড়ে গেছি। আমি শিবার কথাই বলছি। ও এখন আমার অবসরের সঙ্গী। বড় দুরন্ত। জীজামা ঠিকমত সামলাতে পারে না। আমারও একটু কাজ বেড়েছে এখন।

লজ্জিত হয়েছিলেন দাদাজী। বুঝেছিলেন শাহজী। বিজাপুরে ফিরে

গিয়েছিলেন।

বড় হয়েছিলেন শিবাজী। শিশু হয়েছিল বালক, তারপর কিশোর। দাদাজী কোণ্ডদেব বালক শিবাজীকে অশ্বারোহণ এবং অস্ত্রচালনায় পারদর্শী করে তুলেছিলেন। মাওলি কৃষকদের নিয়ে নতুন সৈন্যদল তৈরি করেছিলেন শিবাজী।

দাদাজী কোণ্ডদেব দেখেন। ভয়ে বুক কাঁপে জীজবাঈয়ের। পুত্রকে প্রশ্ন করেন, সৈন্যদল গঠন করার কি এমন প্রয়োজন হল তোমার শিবা ?

শান্ত কণ্ঠে শিবাজী উত্তর দেন, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মা।

—শুধুই আত্মরক্ষা ? উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেন না জীজাবাঈ। বলেন, আমাকে সত্য বল শিবা। কি তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ?

মাকে দেখেন শিবাজী। মৃদু শান্ত কণ্ঠে বলেন, মা, মিথ্যা বলার শিক্ষা তুমি আমাকে দাওনি। সৈন্যবাহিনী আমি সৎ উদ্দেশ্যেই গঠন করেছি। মারাঠারা বড় দরিদ্র, বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত তাদের কঠিন সংগ্রাম করতে হয়, শরীরের রক্ত জল করে অনুর্বর জমিতে তারা ফসল ফলায় কিন্তু সেই ফসলের অধিকার থেকে বঞ্চিতও হয় তারা ; বিজাপুর সুলতানের সৈন্যরা কর বাবদ তাদের পরিশ্রমের ফসলের প্রায় সবটাই কেড়ে নিয়ে যায়, কেন ? এর প্রতিকার হওয়া দরকার।

—সুলতানের সঙ্গে তুমি কি বিরোধ করবে ?

—না মা। বিরোধের পথে আমি যাব না। চাষীরা কর নিশ্চয়ই দেবে, কিন্তু উৎপন্ন ফসলের সবটা নয়।

—তাহলেই তো তুমি সুলতানের সঙ্গে বিরোধ করতে চাইছো ?

—না মা। তা আমি মোটেই চাইছি না। যারা ফসল ফলাবে, সেই ফসলের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিতও হয়ে থাকবে এতো চিরদিন হতে পারে না মা। এর একটা সুষ্ঠু সমাধান হওয়া প্রয়োজন। সেই চেষ্টাই আমি করতে চাই। এর জন্য সংঘর্ষের পথে যদি যেতে হয়, তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই আমি সৈন্যদল গঠন করেছি।

দাদাজীর কাছে সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উতলা জননী অভিযোগ করেছেন। বলেছেন, দয়া করে আপনি ওকে নিবৃত্ত করুন ?

শান্ত কণ্ঠে বৃদ্ধ প্রশ্ন করেছেন, কেন মা, কি করেছে শিবা ?

বলেছেন জীজাবাঈ। সব শুনে স্মিত কণ্ঠে তিনি বলেছেন, তুমি শান্ত হও মা। উতলা হওয়ার মত কোন কারণ আমি দেখছি না। শিবা তো কোন অন্যায় করতে যাচ্ছে না।

কাতর কণ্ঠে জীজাবাঈ বলেছে, এতে যে সুলতানের সঙ্গে বিরোধ বাঁধবে।

—তা নাও তো হতে পারে মা।

—আমার মন বলছে নিশ্চয়ই বিরোধ বাঁধবে। বলেছিলেন জীজাবাঈ, সুলতানের সৈন্যরা নিশ্চয়ই তাদের কাজে বাধা দিলে তা মেনে নেবে না।

দাদাজী বলেছিলেন, আমারও তাই মনে হয়। এতদিন সুলতানের কর আদায়ের অছিলায় সৈন্যরা চাষীর সর্বস্ব লুঠ করেছে। লুঠের সবটাই সুলতানের কাছে নিশ্চয়ই পৌঁছায় নি। মাঝ পথে তা ভাগ হয়েছে। এখন বাধা পেলে সুলতানের সৈন্যরা নিশ্চয়ই সে বাধা বরদাস্ত করবে না। তবে শিবা যা করতে যাচ্ছে তার মধ্যে আমি কোন অন্যায় দেখছি না। দেশের স্বার্থে উচিৎ কাজই সে করতে যাচ্ছে।

জীজাবাঈ শুধু বলেছিলেন, আপনিও!

স্মিত হেসে দাদাজী বলেছিলেন, সত্যকে অস্বীকার করার সাধ্য যে আমারও নেই মা!

তাই হয়েছিল। চাষীদের সঙ্গে ফসলের ভাগ নিয়ে সুলতানী সৈন্যদের বিরোধ বাঁধতে দেরি হয়নি। গরীব নিরীহ চাষীদের কাছে প্রথম বাধা পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল সুলতানী সৈন্যদল। পর মুহূর্তে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে ক্ষিপ্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গরীব মানুষের ওপর। লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ। গরীব মানুষের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিল সুলতানী সৈন্যের দল।

আর প্রতিবাদ নয়, এবার আক্রমণ, যুদ্ধ। অত্যাচারী সৈন্যরা রাত ভোর আনন্দোৎসবের পর সবে মাত্র ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে সেদিন। আকাশে উঁকি দিয়েছে শেষ হেমন্তের সূর্য। পাখি ডাকছে। সুরু হচ্ছে একটা নতুন দিন। শিবাজী বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত তোরণা দুর্গ আক্রমণ করলেন (১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে)। ক্লান্ত সৈন্যরা বাধা দিল মারাঠা সৈন্যদের কিন্তু সে বাধা প্রহসনে পরিণত হল। অত্যাচারী সৈন্যদের দুর্গ থেকে বার করে দিয়ে তোরণা দুর্গ অধিকার করলেন শিবাজী। কয়েক দিন পরেই তোরণা দুর্গের কাছেই নতুন দুর্গ নির্মাণের কাজ সুরু করলেন। নতুন দুর্গের নাম রাখলেন রাজগড়। এর কিছুদিন পরে বিজাপুর সুলতানের এক অত্যাচারী প্রতিনিধির কাছ থেকে কেড়ে নিলেন কোণ্ডনা।

মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল শিবাজীর নাম। মানুষ ছুটে আসতে লাগলো দলে দলে। অন্যায় আর অত্যাচারের ভাষা গর্জে উঠতে লাগলো এখানে-সেখানে। গরীব মানুষের দল মনে বল পেল, ভরসা পেল। একজন মানুষ তাদের সঙ্গে আছে। তার নাম শিবাজী।

ঠিক এমনি দিনে দাদাজী কোণ্ডদেব পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন (১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে)।

সেদিন শেষ রাত্রি থেকে অঝোর ধারায় বর্ষণ সুরু হয়েছে। অকাল বর্ষণ। মাসটা ফাল্গুন। বসন্তের দিন। বেলা যত বাড়তে লাগলো বৃষ্টির বেগ ততোই প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো। সেই সঙ্গে দামাল হাওয়ার মাতামাতি। মনে হতে লাগলো সেদিনই যেন পৃথিবীর শেষদিন।

কদিন থেকেই দাদাজীর শরীরটা খুব একটা ভাল যাচ্ছিল না। কারো সঙ্গে বড়

একটা কথা বলছিলেন না। সব সময় নিশ্চুপ ভাবে কখনো বসে—শুয়ে থাকছিলেন। দশটা কথার উত্তরে একটা কথা বলছিলেন।

প্রভাতেই জীজাবাঈ মুমূর্ষুর শয্যার পাশে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভাল বোধ করেন নি। শিবাজী তখন রাজগড়ে। বৃদ্ধ বার বার কাকে যেন খুঁজে ছিলেন। জীজাবাঈ প্রশ্ন করে উত্তর পাননি। শেষে গোপনে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন পুত্রকে।

শিবাজী যখন শিবেন দুর্গে এলেন তখন মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। বৃষ্টি আর ঝড়ের তাণ্ডব তখন আরো বেড়েছে। সেই দুর্যোগের মধ্যেই তিনি এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন বৃদ্ধকে। হাহাকার ধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে গেল তাঁর অন্তর।

শিবাজীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মৃত্যুর পথযাত্রীর চোখ-মুখ। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে জীজাবাঈয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে মৃদু কণ্ঠে বললেন, মাতৃ অন্তর তুমি লাভ করো শিবা।

ইসারায় শিবাজীকে তিনি কাছে ডাকলেন। বললেন, শিবা কটা কথা তোমাকে বলে যেতে চাই। শোন, আমার জ্ঞান এবং বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী এতদিন যে শিক্ষা তোমাকে দিয়েছি তা যে অভ্রান্ত, এ ধারণা মনে আঁকড়ে থেকনা। জীবনের চলার পথে ভুলকে সংশোধন করে নিও। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ। ধর্মকে রাজনীতির বাইরে রাখবে। সত্য মানুষ। জীবনে সত্যভ্রষ্ট হয়ো না। চলার পথে বহু বাধা-বিপত্তি আসবে। ধৈর্য অবলম্বন করবে। দেখবে সব বাধা দূর হয়ে যাবে।

জীজাবাঈ বললেন, আপনি এবার একটু বিশ্রাম করুন।

—বিশ্রাম! বৃদ্ধের মুখে ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়লো। শান্ত কণ্ঠে বললেন, জীবনের শেষ বিশ্রামের লগ্ন আমার সমাগত মা।

শিবাজী ডাকলেন, দাদাজী!

বৃদ্ধ সস্নেহে দীপ্ত বলিষ্ঠ তরুণের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, আত্মসুখ নয়, দরিদ্র, নিরন্ন, অসহায় মানুষের কল্যাণ কামনাই হোক তোমার জীবনের মূল মন্ত্র। আশীর্বাদ করি জীবন-যুদ্ধে তুমি জয়ী হও।

চোখ বুজলেন তিনি। আর কথা বললেন না। বাইরের তুমুল ঝড়-বৃষ্টি অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল। চির নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন দাদাজী কোণ্ডদেব। অভিভাবকহীন হলেন শিবাজী।

দাদাজী কোণ্ডদেবের মৃত্যুর পর প্রথমটায় দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন শিবাজী। নির্জনে একাকী বসে থাকতেন চুপচাপ। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। ভাল করে খেতেন না। ঘুমাতেন না। কি এক দুঃসহ যন্ত্রণায় সব সময় ছট্‌ফট করতেন।

শিবাজী নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ায় বিজাপুরের সৈন্যরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। সাধারণ মানুষের ওপর আবার অত্যাচার সুরু করল তারা। অসহায়

মানুষের কাতর আর্তনাদে আবার আকাশ বাতাস ভরে উঠল। সাহায্যের আশায় ছুটে আসতে লাগলো মানুষ, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হল।

দূর থেকে দিনের পর দিন দেখলেন জীজাবাঈ। একদিন গিয়ে পুত্রের সামনে দাঁড়ালেন।

মাকে দেখলেন শিবাজী। বললেন, কিছু বলবে মা?

—একটা কথা জানতে এসেছি। বললেন, জীজাবাঈ।

উৎসুক নেত্রে জননীর মুখের দিকে তাকালেন শিবাজী।

মৃদু কণ্ঠে জীজাবাঈ বললেন, তুমি কি বধির হয়ে গেছো শিবা?

না, বধির হয়ে যাননি তিনি। শুনতে পেলেন অসহায় মানুষের কান্না। উঠে দাঁড়ালেন। ঝাঁপ দিলেন কর্ম যজ্ঞে। দেখতে দেখতে বিজাপুরের অধীন কয়েকটি স্থান অধিকার করলেন। বন্ধ করলেন নিরীহ মানুষের ওপর বিজাপুর সৈন্যদের অত্যাচার। মাত্র এক বছরের মধ্যে পার্বত্য দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত এক বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হলেন তিনি। এরই মধ্যে ার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এক সর্বত্যাগী মানুষ, রামদাস। নতুন মন্ত্রে শিক্ষিত করেছেন তিনি শিবাজীকে। শুধু অত্যাচারিত অসহায় মানুষের সহায় হলে হবে না! জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে হবে মানুষকে, সংগঠিত করতে হবে এক গোটা জাতিকে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে স্বাধীন মারাঠা রাষ্ট্র।

সেই পথেই এগিয়ে চলছিলেন শিবাজী। হঠাৎ বাধা এল। শিবাজীর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভীত সুলতান শাহজীকে কারারুদ্ধ করলেন। পিতাকে বন্দী করে পুত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

কারাগারে বসে লেখা শাহজীর পত্র পেলেন জীজাবাঈ। তোমার পুত্রের জন্য আজ আমি কারারুদ্ধ হয়েছি। আমার জীবন বিপন্ন। একমাত্র তুমিই পার তোমার পুত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে আমার জীবন রক্ষা করতে

পুত্রের হাতে সে পত্র তুলে দিলেন জীজাবাঈ। বললেন, তোমার পিতার পত্র।

-- জানি। মৃদু কণ্ঠে বললেন শিবাজী, তিনি তোমাকে লিখেছেন।

—হ্যাঁ। বললেন জীজাবাঈ, তোমার জন্য আমাকে পত্র লিখেছেন তিনি।

একটু নীরব রইলেন শিবাজী। মাকে দেখলেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, অপরাধ মাজ না করবে মা। আমি কি কোন অন্যায় করেছি?

না. কোন অন্যায় তুমি করনি। বললেন জীজাবাঈ।

– তাহলে তোমার আদেশ আমাকে জানাও।

—যদি কোন অন্যায় আদেশ আমি তোমাকে করি? পুত্রের মুখের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালেন জীজাবাঈ।

মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে শিবাজী বললেন, তোমার আদেশ, সে আদেশ অন্যায় হলেও বিচারের স্পর্দ্ধা আমার নেই। বল আমি কি করবো?

হেসে ফেললেন জীজাবাঈ। পুত্রের মাথায় হাত রেখে শান্ত কণ্ঠে বললেন, সেই

জন্যই আমি তোমাকে কোন আদেশ করবো না।

—মা! যেন চিৎকার করে উঠলেন শিবাজী।

শান্ত ধীর কণ্ঠে জীজাবাঈ বললেন, শিবা, তিনি তোমার জন্মদাতা। তিনি কি করেছেন সে তর্কে এখন না যাওয়াই উচিৎ। তিনি বিপন্ন। সাহায্য প্রার্থী। সিদ্ধান্ত নাও তুমি।

গুরু রামদাসের শরণাপন্ন হলেন শিবাজী। সব কথাই বললেন। জানতে চাইলেন, প্রভু, এখন বলে দিন আমি কি করবো?

শুনে হাসতে লাগলেন রামদাস। যেন জীবনে এই প্রথম তিনি এমন মজার কথা শুনলেন। বললেন, এতো অতি সহজ ব্যাপার বৎস। সমাধান তো তোমারই হাতে। এর মধ্যে এত উতলা হওয়ার তো কিছু দেখছি না আমি।

—কিন্তু আমি তো···।

—স্থির ভাবে চিন্তা করো বৎস। রক্তের সম্পর্ক তো অধিকার করা সম্ভব নয়। তুমিই বা তা করবে কেমন করে? একটু নীরব রইলেন তিনি। বললেন, পিতার এই বিপদের সময় পুত্রকে তার কর্তব্য পালন করতেই হবে। পিতা আগে বিপদ হতে মুক্ত হোন তারপর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করা যাবে।

গুরুর আদেশে শান্তভাবে কাল যাপন সুরু করলেন তিনি। বিজাপুর সুলতান শাহজীকে মুক্তি দিলেন এবং আগের কাজেই নিযুক্ত রাখলেন।

কারামুক্তির পর শিবাজীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন শাহজী। হয়তো সুলতানই তাকে পাঠিয়ে ছিলেন। জীবনে পিতা পুত্রের প্রথম মিলন ঘটলো। শিবাজী যথারীতি সম্মান জানালেন পিতাকে। শাহজী অপলক মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন পুত্রের দিকে। তাঁর বীর পুত্র!

১১

শবনম, তুমি বলতে পার আমি স্বপ্নে কাকে দেখেছি? কে তিনি? হিন্দু সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কথা শুনেছি। শুনেছি মুসলমান ফকিরদের সম্পর্কেও। শুনলে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। যুক্তি তর্কে হদিশ পাওয়া যায় না। কি করে সম্ভব আজও বুঝি না?

তোমার কাছে শুনেছিলাম হায়দরাবাদের বেঁটে ফকিরের কথা। একটা পাঁচ-ছয় বছরের শিশু যেন। মাথায় কাঁচা পাকা চুল, মুখে ইয়া দাঁড়ি তোমার ছোট বেলায় বহুবার তাকে দেখেছো। রাস্তার ধারে একটা বট গাছের নিচে বহুদিন আস্তানা গেড়ে বসেছিল। সঙ্গে একটা বিশাল কালো কুকুর। প্রথম প্রথম হায়দরাবাদের মানুষ পাত্তাই দেয়নি হঠাৎ আসা ফকিরকে। তারপর প্রথম গরীবের দল তার কাছে গিয়েছিল। তারপর দেখতে দেখতে ভীড় বেড়েছিল। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-

মুসলমান সব শ্রেণীর মানুষ ফকিরের কাছে দিন রাত্রি লম্বা লাইন লাগিয়েছিল। উচ্চবিত্তের দল নিজের নিজের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তুলতে চেয়েছিল। কত সেবা কত ভালবাসা।

তুমি বলেছিলে, আমাদের মহল্লার কাছে রাস্তার ধারে বটতলায় কালো কুকুরটাকে নিয়ে একটা বেঁটে মানুষ যখন প্রথম এসে আস্তানা গাড়লো, তখন আমরা অবাক হয়ে তাকে দেখেছিলাম। ওইটুকু মানুষ কিন্তু কি ইয়া দাড়ি! আর দেখবার মত ছিল কালো কুকুরটা। কি তেজি চেহারা আমরা খেলা ভুলে হাঁ করে দেখতাম। এক বার মানুষটাকে, একবার সঙ্গী কুকুরটাকে। সকাল হবার পর কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে মানুষটা কোথায় চলে যেত। ফিরে আসতো বিকাল হবার আগে। এসে আটা মাখতো, আগুন জ্বালিয়ে চাপাটি তৈরি করতো। কুকুরটাকে দিয়ে নিজে খেত।

কদিনের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে মানুষটার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। কাছে যাওয়ার সাহস আমাদের ছিল না। দূরে দাঁড়িয়ে আমরা তার সঙ্গে কথা বলতাম। আমরা তার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করতে সে আকাশটাকে দেখিয়ে ছিল। আমাদের অজস্র প্রশ্নের অদ্ভুত অদ্ভুত উত্তর দিত। আর হাসতো। আমরা মজা পেতাম তার কথায়। সে তার আস্তানায় ফেরার আগে লুকিয়ে কিছু কিছু জিনিস বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে রেখে দিতাম। সে কিন্তু সেসব পেয়ে মোটেই খুশি হ'ত না। বলতো, বাড়ি থেকে লুকিয়ে তোমরা কিন্তু এসব এনো না আমার জন্য। আমি কিন্তু বাড়িতে বলেই তার জন্য নিয়ে যেতাম। আমার আব্বা আম্মা ছিল না। দাদীকে বলে নিয়ে যেতাম আমি। দাদী কিন্তু কোনদিন আমাকে নিষেধ করেনি। তাকে বলতাম সে কথা। শুনে ছোট্ট মানুষটা বলতো, খুব দয়া তোমার দাদীর। ঠোঁট ফুলিয়ে বলতাম, আমি বুঝি ভাল নই? উত্তরে মানুষটা গম্ভীর ভাবে বলেছিল, তোমার খসম হবে খুব ভাল। যদিও সে বয়েসটা লজ্জা পাবার বয়েস নয়, তবু লজ্জা পেয়েছিলাম। আর আমাদের খেলার সঙ্গী সৈয়দ, সে ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট আর ফাঁকা। শুনে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল, দোস্ত, শবনমের তো খসম ভাল হবে, আমার খসম কেমন হবে বলতো?

শুনে ছোট্ট মানুষটা আকাশের দিকে চেয়ে বলেছিল, তোমার খসম হবে আমার মতই।

সেদিন ছোট্ট মানুষটার সব কথা বুঝিনি। বোঝবার মত বয়েসও আমাদের হয়নি তখন। কিন্তু পরবর্তী কালে ছোট্ট মানুষটার সব কথাই প্রায় মিলে গিয়েছিল। সন্তানহীনতার যন্ত্রণা আমি বুঝি। কিন্তু মানুষটা সেজন্য আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ে সন্তানের জন্য আবার সাদী করেনি। আমাকে আগলে রেখেছে। চোখের জলে আমি যাতে বুক না ভাসাই সেদিকে তার তীক্ষ্ম নজর। আর সৈয়দ? ছোট্ট সৈয়দ পরবর্তী জীবনে হয়ে উঠেছিল শহরের সেরা গুণ্ডা। তারপর কি যেন হল তার। একদিন সব ছেড়ে ফকিরি নিয়ে কোথায় চলে গেল। শুনেছি তারপর কেউ আর তার

সন্ধান পায়নি।

হ্যাঁ, কিছুদিনের মধ্যে একটু একটু করে ছোট্ট মানুষটার কাছে ভিড় বেড়েছিল। আমরা যাওয়া বন্ধ করেছিলাম। ধনীদের মধ্যে মানুষটাকে নিয়ে টানাটানি সুরু হয়েছিল। সকলেই যে যার নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে চায়।

ঠিক এমনি সময় ঘটেছিল সেই অলৌকিক ঘটনাটা। ভোর থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত প্রতিদিনই মানুষের ভীড় লেগে থাকতো। কুকুরটা হয় পাশে বসে থাকতো মানুষটার, নাহলে ঘুমতো শুয়ে শুয়ে। সেদিনও সকাল থেকে মানুষের ভীড় সুরু হয়েছে। কুকুরটা শুয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। হঠাৎ কি যেন হয়েছিল, কুকুরটা হঠাৎ উঠে তীরবেগে ছুটে গিয়েছিল মানুষের মধ্যে দিয়ে। ছোট্ট মানুষটি নির্বিকার। কিছুক্ষণ পরে একদল মানুষ ছুটে এসেছিল উত্তেজিত ভাবে। একটা শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে কালুয়া হাতীর পায়ের তলায় পিণ্ট হয়েছে। বড় রাস্তায় মরে পড়ে আছে।

শুনে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল মানুষটা। সকলের সঙ্গে বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ঠ কালুয়ার দেহ পড়ে আছে। একদলা মাংস পিণ্ড। অবোধ শিশুকে রক্ষা করে পিষ্ট হয়েছে কালু। হঠাৎ মানুষটা উবু হয়ে সেই মাংস পিণ্ডের পাশে বসে মাংস পিণ্ডে হাত রেখে বলেছিল, উঠ কালুয়া। চল।

প্রকাশ্য দিবালোকে অসংখ্য মানুষের চোখের সামনে গা ঝাড়া দিয়ে জীবন্ত কালুয়া উঠে দাঁড়িয়েছিল। তারপর লেজ নাড়তে নাড়তে কুকুরটা আস্তানায় ফিরে ছিল মানুষটার সঙ্গে। আগুনের হলকার মত সেই খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশি দেরি হয়নি। অবিশ্বাস নিয়ে তখনও যারা দূরে ছিল, তারাও ছুটে এসেছিল। মানুষটা সেদিন কিন্তু সকলকে বলেছিল, আজ নয়, কাল সকালে আসুন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন যে যার ঘরে ফিরে গিয়েছিল। পরদিন রাত্রি প্রভাত হবার আগেই মানুষ ছুটেছিল। কিন্তু বটতলা শূন্য। কেউ নেই সেখানে।

শবনম, এ কাহিনী তোমার মুখে শুনেছিলাম। অবিশ্বাস করি কেমন করে? তেমনি আমার দেখা স্বপ্নটাকে কি করে অবিশ্বাস করি! এখনও যে আমার সত্য বলে মনে হচ্ছে সব কিছুই। এমন স্বপ্ন আমি কেন দেখলাম শবনম? একি আমার মনের দুর্বলতা? কিসের ইঙ্গিত এই স্বপ্ন?

১২

গোল গম্বুজের ধ্যান ঘরে যখন এসে বসেছিলাম মধ্যাহ্নের সূর্যটা সবে মাত্র অপ-রাহ্নের দিকে বাঁক নিয়েছে। সংবিত ফিরতে দেখলাম আমাকে ঘিরে একরাশ অন্ধকার, একলা বসে আছি। এর আগে যে এমন হয়নি তা নয়, খালেদা এসে ডেকেছে। আজ কেউ আসেনি।

বেশ শীত করছে আমার। হেমন্ত শেষ হয়ে এল। শীতের কামড় বসাতে শুরু

করেছে। অন্ধকারেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কেউ জানতে চাইলো, জনাব, আলো আনবো?

—কে? আমার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো।

—জনাব, আমি মীর।

—মীর! তুই এখানে আছিস?

—হ্যাঁ জনাব। বিনীত কণ্ঠে মীর বলল, মালকীন বুড়ি এখানে থাকতে হুকুম দিয়েছে আমাকে।

খালেদা মীরকে আমার পাহারায় রেখেছে। বললাম, রাত হয়ে গেল। আমাকে ডাকিসনি কেন?

—হুকুম ছিলনা জনাব। তেমনি বিনীত গলায় বলল মীর। আলো আনবো জনাব?

আকাশের দিকে তাকালাম। অসংখ্য নক্ষত্র ফুটে উঠেছে সারা আকাশ জুড়ে খালেদা আমাকে কেন ডাকলো না বুঝতে পারছিনা। চারিদিকে তাকালাম। সব কিছু ছায়া ছায়া অন্ধকারে আমার কক্ষে পৌঁছাতে অসুবিধা হবে না। বললাম, আলোর প্রয়োজন নেই। আমি যেতে পারবো।

অন্ধকারেই বারান্দা পার হলাম। শীতে কাঁপছি। বললাম, মীর, ভাল করে দরোজা বন্ধ করে দে। কথাটা বলে এগিয়ে গেলাম। খালেদাকে দেখতে পেলাম আলো হাতে দাঁড়িয়ে আছে সে। সেই আলোয় তার মুখের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে খালেদার মুখটা গম্ভীর বলে মনে হল। কথা না বলে নিজের কক্ষে চলে এলাম।

রাতে শুনলাম খালেদার কাছে বাদশাহ ঔরংজীব এত্তেলা পাঠিয়েছেন। দু-এক দিনের মধ্যে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। যদিও শোনবার পর আমার মনে কোনরকম ভাবান্তর হলনা।

তবু রাতে ভাল করে ঘুমাতে পারলাম না। এ যেন বৃশ্চিক দংশন! অসহ্য জ্বালা। আমিও জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেলাম। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিলেন, বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান, কে নয়? আজ জ্বলছেন বাদশাহ আলমগীর। সেই সঙ্গে জ্বলছি আমি নিজে।

মাঝে মাঝে মনে হয় মুঘল বংশ অভিশপ্ত। অভিশাপ এ বংশকে আষ্টে পিষ্টে জড়িয়ে আছে। ক্ষমতা, দম্ভ, সম্পদের শেষ নেই, কিন্তু শান্তি? এ বংশের কোন পুরুষ শান্তি পেয়েছেন? পাননি।

হিন্দুস্থানে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর। সেই সঙ্গে রাজ-পরিবারের মধ্যে সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্বের পথও তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

ঘর্ঘরার যুদ্ধের পর আগ্রায় ফিরে রাজ্য শাসনে মনোনিবেশ করলেন বাবর। হঠাৎ বাদশাহের বিনা অনুমতিতে হুমায়ুন বাদকসানের কার্যভার ত্যাগ করে আগ্রায় ফিরে এলেন। রাজনীতির বিচারে বাদশাহের অনুমতি ভিন্ন শাসনকর্তার পক্ষে

কর্মস্থল ত্যাগ করা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ, সুতরাং, এই অপরাধে উজীর নিজামুদ্দিন খলিফা হুমায়ূনকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য বাদশাহকে পরামর্শ দিলেন। বাবরও হুমায়ূনের ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর মুখ দর্শন করতে অস্বীকার করেছিলেন। এবং অবিলম্বে তাঁকে তাঁর নিজস্ব জায়গীর সম্ভলে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

সম্ভলে ফিরে গেলেন হুমায়ূন আর সেখানে ফিরেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রোগ দিন দিন বাড়তে লাগলো। সংবাদ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বাবর। সম্ভল থেকে নৌকা যোগে আগ্রায় নিয়ে এলেন পুত্রকে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সব চিকিৎসাই ব্যর্থ হল। ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন হুমায়ূন।

প্রিয়তম পুত্রের আরোগ্যের জন্য বাবর তখন দিশাহারা। সে সময় আগ্রা থেকে কিছুদূরে আবু কা আকা নামে একজন ফকির থাকতেন। বাবর সংবাদ পেয়ে ফকিরের কাছে ছুটে গেলেন পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য। বললেন, ফকির সাহাব, আমার পুত্রকে আপনি রক্ষা করুন।

ফকির বললেন, জাহাঁপনা আপনার পুত্রের জীবন রক্ষা করা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়?

কাতর কণ্ঠে বাবর বললেন, পুত্রকে রক্ষা করার কি কোন উপায় নেই ফকির সাহাব।

ফকির বললেন, আল্লার কৃপা যদি হয় তাহলেই আপনার পুত্র রক্ষা পেতে পারেন।

বাবর জানতে চাইলেন, কি ভাবে আল্লার কৃপালাভ করা যাবে ফকির সাহাব?

ফকির বললেন, আপনার পুত্রের সর্বোত্তম সম্পদ যদি আল্লার নামে উৎসর্গ করা যায়, তাহলে পুত্র আপনার নিরাময় হবে।

বাদশাহ জানতে চাইলেন, আমার পুত্রের সর্বোত্তম সম্পদ কি ফকির সাহাব?

ফকির বললেন. সেটা আপনিই চিন্তা করুন জাহাঁপনা।

ফকিরের কাছ থেকে ফিরে এলেন বাবর। চিন্তা করতে লাগলেন পুত্রের সর্বোত্তম সম্পদের কথা। দিনের পর দিন এক চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুলতে লাগলো। ওদিকে হুমায়ূন ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। দূরে থেকে পুত্রকে দেখেন আর হাহাকারে অন্তরটা দীর্ণ হয়ে যায়। অবশেষে বিদ্যুৎ চমকের মত পুত্রের সর্বোত্তম সম্পদ দেখতে পান তিনি। আল্লার কাছে পুত্রের কল্যাণ কামনায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন বাবর। ছয় মাসের মধ্যে হুমায়ূন নিরাময় হলেন, আর বাবরের দেহে হুমায়ূনের রোগ সংক্রমিত হল। শয্যা গ্রহণ করলেন বাবর। মৃত্যু শয্যায় শায়িত বাবরকে উজীর নিজামউদ্দিন খলিফা হুমায়ূনকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য বার বার অনুরোধ জানালেন। বাবর খলিফার সে কথায় কর্ণপাত

করলেন না। হুমায়ুনকে কাছে ডাকলেন তিনি। বললেন, বেটা, আমার দিল্লীর মসনদ তোমার, লেকিন তোমার ভাই কামরান, আসকারী আর হিন্দালকে বঞ্চিত কোর না।

বাবরকে কথা দিলেন হুমায়ুন। শুনে চির নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন বাবর (২৬শে ডিসেম্বর ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে)। বাবরের মৃতদেহ প্রথমে আগ্রার আরামবাগে সমাধিস্থ করা হয়। পরে তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী কাবুলে মনোরম উদ্যানে সমাধিস্থ করা হয়।

শবনম, এ সমস্ত কথা তোমাকে কেন লিখছি জানি না। আমি কি মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনা করতে বসেছি ? না শবনম, এমন স্পর্ধা আমার কোন দিনই হবেনা। সে জ্ঞান আমার নেই। তাছাড়া বাদশাহরা নিজেরা লিখেছেন। এছাড়া লেখক ছিল। লিখেছেন তাঁরা। বাদশাহের গুণগান করেছেন। কত সুষ্ঠু এবং সুন্দর ভাবে রাজ্য পরিচলনা করতেন বাদশাহরা সেকথা লিখেছেন, লিখেছেন কত ভাল আর উদার ছিলেন তাঁরা। কত শৌর্য বীর্যের পরিচয় দিয়েছেন, কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। শুধু বাদশাহের প্রশংসা, তোষামোদে, সত্যকে আড়াল করার অপচেষ্টা।

হুমায়ুনের সুস্থ হয়ে ওঠা আর বাবরের মৃত্যু এর মধ্যে প্রকৃত তত্ত্ব এবং সত্য কতটুকু ? জানি না। জানা সম্ভবও নয়। অলৌকিক ব্যাপার। মন মেনে নিতে চায় না। যা শুনেছি, লিখলাম তোমাকে।

রাতে হুমায়ুনের কথা মনে পড়েছিল। সিত্তীউন্নিসার কাছে শুনেছিলাম হুমায়ুনের কথা। হুমায়ুনের আব্বা বাবর, আম্মা সাহাম বেগম, নাম নাসিরউদ্দীন হুমায়ুন। শৈশবে বাবরের শিক্ষা ব্যবস্থায় আব্বাজানের ভাষা তুর্কী, আম্মার ভাষা ফার্সী এবং ধর্মের ভাষা আরবী শিক্ষা করেন। এছাড়া হিন্দুস্থানী ভাষাও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। বাবর কৈশোর থেকেই হুমায়ুনকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। মাত্র বিশবছর বয়সে হুমায়ুন প্রথমে বাদকসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। পাণিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধে তিনি বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। খানুয়ার যুদ্ধের পর তিনি বাদকসানে ফিরে যান। কিন্তু মাত্র দুবছর পরে তিনি বাবরের বিনা অনুমতিতে আগ্রায় চলে আসেন। বাদশাহ অসন্তুষ্ট হন।

বাদশাহের অসন্তুষ্ট হওয়ার ভিন্ন কারণও অবশ্য ছিল। উজীর নিজামউদ্দীন খলিফা তখন যথেষ্ট প্রভাবশালী। তিনি বাবরকে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। এমনকি বাদশাহের বিনা অনুমতিতে বাদকসান ছেড়ে হুমায়ুনের চলে আসায় তার পরিবর্তে বাবরের ভগ্নীপতি মাহাদী খাজাকে দিল্লীর মসনদ দানের প্রস্তাব পর্যন্ত করেন। বাবর তখন ক্লান্ত, অসুস্থ। তবু নিজামউদ্দীনের উদ্দেশ্য তাঁর বুঝতে কষ্ট হয়নি। মৃত্যুর পূর্বে হুমায়ুনকেই তিনি দিল্লীর মসনদের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে যান।

বাবরের মৃত্যুর পর বিনাযুদ্ধে দিল্লীর মসনদে বসেন হুমায়ুন। উজীর নিজামউদ্দীন খলিফা তার দলবল নিয়ে চুপ করেছিলেন। মাহাদী খাজাও নীরব ছিলেন। হুমায়ুনের দিল্লী মসনদে বসায় কোন বাধা ছিলনা, কিন্তু বাধা ছিল তাঁর চারি পাশে, নিকটে এবং দূরে। বাবর বিস্তৃত ভূখণ্ড জয় করেছিলেন বটে কিন্তু সুশৃঙ্খল শাসন পদ্ধতি বা শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেননি।

হুমায়ুন যখন দিল্লীর মসনদে বসলেন, ইব্রাহিম লোদীর ভাই মুহম্মদ লোদী তখনও মুঘলের হাত থেকে আফগান সাম্রাজ্য পুনরধিকারের প্রয়াস ত্যাগ করেননি। সাসারামের জায়গীরদার-এর পুত্র শের খান বাংলা ও বিহারে বিচ্ছিন্ন আফগান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। বাংলার আফগান সুলতান নসরৎ শাহ আফগান জাতির পুনরুত্থানের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। আলম খান লোদী বাবরকে আমন্ত্রণ করেছিলেন কিন্তু বাবর দিল্লীর মসনদে বসায় আলম খান গুজরাটে বাহাদুর শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের থেকেও হুমায়ুনের প্রবল শত্রু ছিলেন তাঁর জ্ঞাতিবর্গ মীর্জা গোষ্ঠী। হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভগ্নীপতি মুহম্মদ জামান মীর্জা, তৈমুর বংশধর মীর্জা মুহম্মদ সুলতান, বাবরের ভগ্নীপতি মীর্জা মাহাদী খাজা। সকলেই লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন বাবরের বিজিত ভূখণ্ডের দিকে।

বাবরের দ্বিতীয় পুত্র কামরান ছিলেন কাবুল ও কান্দাহারের শাসনকর্তা। দিল্লীর মসনদের দিকে তাঁর লোভ ছিল প্রচুর। আসকারী আর হিন্দাল ছিলেন অপরিণত, স্বল্পবুদ্ধি, কলহপ্রিয়, অথচ উচ্চাভিলাষী; তাঁরা কূটবুদ্ধি আমীরদের হাতের ক্রীড়নক ছিলেন।

আর হুমায়ুন নিজে? নববিজিত শত্রুপরিবৃত বিচ্ছিন্ন শিশুরাজ্যের জন্য প্রয়োজন ছিল একজন অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, কূটনীতিজ্ঞ শাসকের। তা তিনি ছিলেন না। তাছাড়া মাত্র বাইশ বছর বয়সের অনভিজ্ঞ তরুণের কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করাও অন্যায়। তাছাড়া তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও চরিত্রের দৃঢ়তাও ছিলনা। সেই সঙ্গে নেশার দাস হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

হুমায়ুন প্রথমেই ভাই আর জ্ঞাতিদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিলেন। কামরানকে কাবুল ও কান্দাহার, আসকারীকে সম্ভল আর হিন্দালকে মেওয়াট (আলোয়ার), গুরগাঁও (পূর্ব-দক্ষিণ পাঞ্জাব) ও মথুরা। জ্ঞাতি ভাই সুলেমান মীর্জা বাদকসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। কামরান অল্পদিনের মধ্যে কাবুল থেকে পাঞ্জাব এবং হিসার-ই-ফিরুজ পর্যন্ত ভূখণ্ডে তাঁর অধিকার বিস্তার করলেন। কাবুল, কান্দাহার, পাঞ্জাব হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে নতুন সৈন্য সংগ্রহ করা মুশকিল হয়ে পড়লো হুমায়ুনের পক্ষে। তাছাড়া হিসার-ই-ফিরুজ হস্তান্তরের ফলে পাঞ্জাব ও দিল্লীর মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সেই সঙ্গে পিতৃ বন্ধু আর জ্ঞাতিদের খুশি করার জন্য প্রত্যেকের জায়গীরের সীমাবৃদ্ধি করলেন। ফলে প্রকৃত সাম্রাজ্যের

সীমা সংকীর্ণ হয়ে গেল।

হুমায়ুনের শাসন কালের প্রথম দশবছর (১৫৩০ থেকে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ) ঘটনা-বহুল। ঘটনার চাকচিক্য ছিলনা কিন্তু গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট—যেমন কালিঞ্জরের বিরুদ্ধে অভিযান (১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দ)। মামুদ লোদীর বিরুদ্ধে সফল অভিযান (১৫৩২ খ্রষ্টাব্দ)। ওই বছর শের খানের বিরুদ্ধে চুণার দুর্গ অবরোধ, শের খানের মৌখিক বশ্যতা স্বীকার ও হুমায়ুনের আগ্রা ফিরে আসা। নিজের অবস্থার কথা উপলব্ধি করতে পারেননি তিনি। চারিদিকে বিদ্রোহ, শত্রুরা শক্তি সঞ্চয় করছে। কোন দিকে না তাকিয়ে দিল্লীতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পান-ভোজনে মত্ত হয়ে রইলেন। সেই সঙ্গে দিল্লীর অদূরে দীন পানাহ্ (ধর্মের আশ্রয়) নামক নতুন নগর নির্মাণ আরম্ভ করলেন। অন্যদিকে পূর্বাঞ্চলে শের খান আর গুজরাটে বাহাদুর শাহ দ্রুতগতিতে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন।

মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের খানুয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের সুযোগে বাহাদুর শাহ (১৫৩১) খ্রীষ্টাব্দে) মালব ও রাইসিন দুর্গ অধিকার করে (১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে) চিতোরের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করলেন।

দিল্লীর মসনদে তখন বাদশাহ হুমায়ুন। চিতোরের রাজমাতা কর্ণাবতী এই বিপদে হুমায়ুনকে ভ্রাতা সম্বোধন করে তাঁর নিকট ভ্রাতৃত্বের চিহ্ন স্বরূপ রাখী পাঠালেন এবং বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

হুমায়ুন চিতোরের দূতের কাছ থেকে রাজমাতা কর্ণাবতীর পাঠানো রাখী গ্রহণ করে রাজপুত-রমণীকে ভগ্নীর সম্মান দান করলেন এবং দূতকে চিতোরের সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। বললেন, দূত, রাজমাতা আজ থেকে আমার ভগ্নী, তাঁকে বলবেন, ভগ্নীর বিপদে সব রকম সাহায্য আমি করবো।

আশ্বস্ত হয়ে দূত চিতোরে ফিরে গেলেন।

চিতোরের দূত বিদায় নেবার পর উজীর আমির বন্ধুবান্ধবের দল হাহাকার করে উঠলেন। বললেন, জাহাঁপনা এ আপনি কি করলেন?

বিস্মিত হলেন বাদশাহ হুমায়ুন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি করলাম?

উজীর বললেন, আপনি চিতোরের দূতকে জবান দিয়ে দিলেন জাহাঁপনা!

হুমায়ুন বললেন, জরুর। চিতোরের রানী আমাকে ভাইয়া বলে রাখী পাঠিয়েছেন। বিপদে সাহায্য চেয়েছেন, আমার তো সাহায্য করা উচিৎ উজীর সাহাব।

—লেকিন জাহাঁপনা, চিতোরের রানী কাফের।

—কাফের! ধমকালেন হুমায়ুন। বললেন, আমি যে চিতোরের রানীর রাখী নিয়েছি r দূতকে বলেছি, রানীকে আমি বহিন বলে মেনে নিলাম। তাঁর বিপদে সাহায্য করবো বলে জবান দিয়েছি।

উজীর বললেন, লেকিন জাহাঁপনা। বাহাদুর শাহ আফগান হলেও মুসলমান।

তাঁর সঙ্গে আমাদের দুশমনী নেই। তাহলে...

চিন্তিত হলেন হুমায়ুন। বললেন, তাহলে কি করবো উজীর সাহাব ?

—আমরা দূরে থাকবো। বললেন উজীর, দূরে থেকে দেখবো আমরা। তারপর অবস্থা বুঝে আমরা ব্যবস্থা করবো। লেকিন, চিতোরের জন্য আমরা বাহাদুর শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করবো না।

সকলের এক মত। হুমায়ুন মেনে নিলেন সকলের সিদ্ধান্ত।

—ওদিকে বাহাদুর শাহ তুর্কী সেনাপতি রুমী খান ও পর্তুগীজ গোলন্দাজদের সহায়তায় চিতোর আক্রমণ করলেন।

শবনম, হুমায়ুন চিতোরের সাহায্যের জন্য বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন. কিন্তু কার্যকালে 'রাখী-বন্ধ ভাই' হুমায়ুন মুসলিম সুলতান বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে কাফের 'রাখী-বন্ধ ভগ্নীর' রক্ষার জন্য সাহায্য করেননি। ভুল করেছিলেন হুমায়ুন, মারাত্মক ভুল, তিনি যদি চিতোরের ধর্মভগ্নীকে সেদিন ধর্মান্ধতায় অন্ধ না হয়ে সাহায্য করতেন, পরবর্তী কালে নিশ্চয়ই তিনি রাজপুতদের অকুণ্ঠ সহায়তা লাভ করতেন হয়তো বা শের শাহের বিরুদ্ধেও সফলতা লাভ করতেন। কিন্তু তা না করে তিনি যুদ্ধের সময় চিতোরের প্রান্তদেশে নিরপেক্ষ দর্শক-রূপে অবস্থান করলেন। চিতোরের পতন হল। রাজপুত নারীরা শত্রুর হাতে ইজ্জত খোয়ানো অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় বিবেচনা করে জহর ব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। জহর ব্রতের অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দিয়ে আত্মসম্মান রক্ষা করলেন।

চিতোরের পতনের পর বাহাদুরশাহকে মান্দাশোরের যুদ্ধে পরাজিত করলেন হুমায়ুন। বাহাদুরশাহ মাণ্ডু থেকে চম্পানীর, আহমদাবাদ ও কাম্বের পথে পালালেন। শেষে দিউদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। বিজয়ের মুহূর্তে হুমায়ুনের স্বরূপ প্রকাশ পেল, শত্রুর পেছনে ছোটা বন্ধ করে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠলেন।

ভাই আসকারীকে আহমদাবাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন হুমায়ুন। আসকারীও সুযোগ বুঝে কিছুদিনের মধ্যেই ষড়যন্ত্র আরম্ভ করলেন। বাহাদুরশাহ আসকারীর স্বাধীনতালাভের ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়ে দিউদ্বীপ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যাত্রা করলেন।

সংকট মুহূর্তে হুমায়ুন সংবাদ পেলেন, শেরখান বিহারে ক্ষমতা বিস্তার করছেন। পরিস্থিতি জটিল। গুজরাট ত্যাগ করে হুমায়ুন সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিহারের দিকে যাত্রা করলেন। হুমায়ুনের অনুপস্থিতিতে বাহাদুরশাহ গুজরাট ও মালব পুনরুদ্ধার করলেন। অবশ্য এর কিছুদিন পরেই বাহাদুরশাহ পর্তুগীজদের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

চুণার দুর্গ অবরোধ করলেন হুমায়ুন। ছয়মাসের চেষ্টায় চুণার অধিকার করলেন। কিন্তু শের খান এই ছয়মাসের মধ্যে মুঙ্গের ও গৌড় পর্যন্ত জয় করে নিয়েছেন। গৌড়ের সুলতান মামুদশাহ হুমায়ুনের শিবিরে আশ্রয়প্রার্থী হলেন।

এবার হুমায়ুন তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে গৌড়ের দিকে যাত্রা করলেন। হুমায়ুনের আগমন সংবাদে শের খান গৌড় ত্যাগ করে রোহতাস দুর্গে আশ্রয় নিলেন। বিনা বাধায় গৌড়ে প্রবেশ করলেন হুমায়ুন। দীর্ঘ আটমাস গৌড়ে বিজয় উৎসব পালন করলেন, সেই সঙ্গে গৌড় নগরীর নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখলেন 'জিন্নতাবাদ' (স্বর্গভূমি)।

একদিকে হুমায়ুনের উৎসব রজনী অন্যদিকে শেরখানের অনলস বিরামহীন পশ্চিমাভিমুখী অভিযান। শেরখান বিহার থেকে দিল্লী পর্যন্ত সুবিশাল ভূখণ্ডে প্রভাব বিস্তার করলেন। সেই সঙ্গে দিল্লী ও গৌড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলের যোগসূত্র ছিন্ন করে দিলেন। বারানসী অধিকার করলেন। জৌনপুর থেকে কনৌজ পর্যন্ত সমৃদ্ধ অঞ্চলের ধনসম্পদ লুঠ করলেন।

হুমায়ুন হিন্দালকে যোগাযোগ সংরক্ষণের জন্য বিহারের প্রান্তদেশে রেখে গৌড়ে গিয়েছিলেন। শেরখানের অগ্রগতির সংবাদে হিন্দাল আগ্রায় ফিরে এলেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণার আয়োজন করলেন। এবার নিজের অসহায় অবস্থা বুঝতে পারলেন হুমায়ুন এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে আগ্রার দিকে যাত্রা করলেন (মার্চ, ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

শেরখান কর্মনাশা নদীর তীরে চৌসায় হুমায়ুনের পথরোধ করলেন। তিনমাস পরস্পরের সৈন্যবাহিনী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো। ভাই আসকারী হুমায়ুনের সাহায্যে এগিয়ে এলেন না। বর্ষা আসন্ন। শেরখানের সামনে সুবর্ণ সুযোগ। সুরু হল বর্ষা। মুঘল শিবিরে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে গেল। নিরুপায় হুমায়ুন সন্ধির প্রস্তাব করলেন।

শেরখান হুমায়ুনের সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন না, আলোচনার প্রস্তাব পাঠালেন হুমায়ুনের কাছে। এইভাবে কিছুদিন সময় নিলেন শেরখান। তারপর তিনি প্রচার করলেন শাহাবাদ পার্বত্য অঞ্চলে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে অভিযানে যাচ্ছেন। মুঘল শিবিরে স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো। কিন্তু সেই দিনই রাত্রির গভীর অন্ধকারে শেরখানের সৈন্যরা তিনদিক থেকে মুঘল শিবির আক্রমণ করলো। অতর্কিত আক্রমণে বিভ্রান্ত মুঘল সৈন্যরা যে যেদিকে পারলো পালিয়ে গেল। যুদ্ধে মুঘল পক্ষের শোচনীয় পরাজয় ঘটলো। হুমায়ুন কোনরকমে গঙ্গা পার হয়ে জীবন রক্ষা করলেন। মুঘল শিবির লুণ্ঠিত হল। হুমায়ুনের অন্যতমা বেগম বেগাবেগম এবং মুঘল অন্তঃপুরিকারা শেরখানের হাতে বন্দিনী হলেন। মুঘল সৈন্যরা কিছু রাত্রিতে গঙ্গা পার হতে গিয়ে ডুবে গিয়েছিল, বাকি সৈন্যরা শেরখানের হাতে বন্দী হল। অনেক কষ্টে হুমায়ুন আগ্রায় পৌঁছালেন।

আগ্রায় পৌঁছে হুমায়ুন আবার শেরখানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। আসকারী আর হিন্দাল আফগান শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হুমায়ুনের পক্ষে যোগ দিলেন। হুমায়ুন চল্লিশ হাজার মুঘল সৈন্য নিয়ে কনৌজের

পথে শেরখানকে বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন। সে সময় শেরখানের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র পনেরো হাজার। শেরখানও কনৌজের পথে আগ্রার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি আসন্ন বর্ষার সুযোগ গ্রহণের জন্য খুব ধীর গতিতে আগ্রার দিকে এগুচ্ছিলেন। প্রকৃতি শেরখানের সহায় হল—সুরু হল প্রবল বর্ষণ। অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে মুঘল বাহিনীর কামান অব্যবহার্য হয়ে গেল। কনৌজের অদূরে বিল্বগ্রাম নামক স্থানে তুমুল যুদ্ধ হল। এবারও পরাজিত হলেন হুমায়ুন। রণক্ষেত্র ছেড়ে তিনি আগ্রার দিকে পালাতে লাগলেন। শেরখান কনৌজ অধিকার করে হুমায়ুনের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। হুমায়ুন আগ্রায় অপেক্ষা না করে লাহোরে পালিয়ে গেলেন। শেরখান দিল্লী-আগ্রা অধিকার করলেন।

হুমায়ুন লাহোরে উপস্থিত হলেন। কামরান তখন লাহোরের শাসনকর্তা। কামরান হুমায়ুনকে সাহায্য করতে রাজি হলেন না। হুমায়ুন সিন্ধুর পথে এগিয়ে গেলেন (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে)।

ভাই এবং বন্ধুদের কাছে আশ্রয়লাভে বিফল হয়ে হুমায়ুন সিন্ধুদেশে উপস্থিত হলেন। হিন্দাল হুমায়ুনকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু এই সময় হুমায়ুন হিন্দালের সুফীগুরু মীর্জা আকবর জামীর সুন্দরী কিশোরী কন্যা হামিদা বানুকে বিবাহ করে বসলেন। হিন্দাল অসন্তুষ্ট হলেন। সাহায্যের আশা দূরীভূত হল।

হুমায়ুন পারস্যের পথে অমরকোটে রাণা বীরশালের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। হামিদা বানু তখন আসন্ন প্রসবা। হিন্দুরাজা রাজ্যহীন বিপন্ন মুসলিম বাদশাহকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। অমরকোটেই বীরশালের আশ্রয়ে হুমায়ুনের পুত্র আকবর ভূমিষ্ট হলেন (২০শে নভেম্বর ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দ)। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বীরশালের সঙ্গে হুমায়ুনের মতান্তর হওয়ায় সিন্ধু ত্যাগ করে কান্দাহারে আসকারীর কাছে সাহায্যের জন্য উপস্থিত হলেন। এই সুযোগে আসকারী হুমায়ুনের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করলেন। হুমায়ুন কান্দাহার থেকে পালিয়ে গেলেন। উপস্থিত হলেন পারস্যের তরুণ সুলতান শাহ তাহমাস্পের কাছে। পারস্যের শাহ হুমায়ুনকে আশ্রয় দিলেন, সেই সঙ্গে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। শর্ত, হুমায়ুন শিয়া মতবাদ গ্রহণ করবেন এবং কান্দাহার বিজিত হলে পারস্যের শাহের হাতে তুলে দিতে হবে।

রাজি হলেন হুমায়ুন। পারস্যের সৈন্যদের নিয়ে হুমায়ুন কান্দাহার আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে পরাজিত হলেন কামরান। কাবুল ও কান্দাহার জয় করলেন হুমায়ুন (১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে)। পরাজিত কামরানকে অন্ধ করে দিয়ে তাকে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। আসকারীও মক্কায় চলে গেলেন। এবং হিন্দাল কিছুদিনের মধ্যেই নিহত হলেন।

সে সময় (১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) রাজস্থান অভিযান শেষ করে শের খান কালিঞ্জর

আক্রমণ করেছেন ; কিন্তু দীর্ঘ এক বছরের চেষ্টায় দুর্গ জয় করা হয়নি তাঁর পক্ষে। শেষে (মে, ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) কালিঞ্জর দুর্গ ধ্বংসের আদেশ দিলেন তিনি। দুর্গের দিকে মুখ করে কামান সাজানো হল। কামানে অগ্নি সংযোগের আদেশ দিলেন, কিন্তু একটি অগ্নিগোলক রুদ্ধ দুর্গদ্বারে প্রতিহত হয়ে পাশে রাখা বারুদের স্তূপের ওপর পড়লো। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। বারুদের আগুনে ঝলসে গেল তাঁর শরীর। সৈন্যরা তাঁর অচেতন দেহ শিবিরে নিয়ে এল। বহুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল তাঁর। তিনি জানতে চাইলেন দুর্গ জয় হয়েছে কিনা। শুনলেন জয়ের কথা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরম তৃপ্তিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ওদিকে হুমায়ুন কান্দাহার ও কাবুল জয় করার পর পারস্যের শাহকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির একটাই পূর্ণ করেছিলেন, তাহল শিয়া মতবাদ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিদিন তিনি পাঁচবার নমাজ পড়তেন, ফকিরের সমাধিতে তীর্থযাত্রা করতেন। হুমায়ুন ছিলেন সুন্নী। হামিদা বানু ছিলেন শিয়া। হুমায়ুন পারস্যের শাহের প্রেরণায় শিয়া মতবাদ গ্রহণ করেন এবং শিয়াদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। কিন্তু পারস্যের সুলতানের হাতে কান্দাহার তিনি তুলে দেননি।

শের খানের মৃত্যুর পর দেখতে দেখতে দশটা বছর পার হয়ে গিয়েছিল। কান্দাহারে বসে হিন্দুস্থানের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখেছিলেন হুমায়ুন। শের খানের উত্তরাধিকারীরা আত্মকলহে মেতে উঠেছিল। সুযোগসন্ধানী হুমায়ুন তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে কান্দাহার থেকে আগ্রার পথে যাত্রা করেছিলেন। পথে সরহিন্দে সিকন্দর শাহ শূর হুমায়ুনকে বাধা দিয়েছিলেন (১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে)। যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন সিকন্দর শূর। হুমায়ুন পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

এভাবে জীবনের শেষ দিকে তিনি হৃত সাম্রাজ্যের কিছু কিছু উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু দশমাস পরেই পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে)।

শবনম, হুমায়ুনের কথা তোমাকে লেখার কোন প্রয়োজনই ছিলনা। কেন লিখছি জান? সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর দেশ এটা। বাবর বুঝেছিলন, সেই জন্যই তিনি পুত্র হুমায়ুনকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর দেশে গো-হত্যা করে হিন্দুর মনে ব্যথা দিতে নিষেধ করেন, কারণ হিন্দুর সঙ্গে সদ্ভাব না রাখলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু হুমায়ুন কি বাবরের কথা শুনেছিলেন? না শোনেন নি। প্রকাশ্যে তিনি কাফের-বিদ্বেষী ছিলেন না, কিন্তু কালিঞ্জরের বিখ্যাত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। এছাড়া তিনি নিয়মিত জিজিয়া কর, তীর্থস্নান কর, কেশমুণ্ডন কর আদায় করতেন। অথচ মানুষটি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যানুরাগী এবং বন্ধুবৎসল। কর্মচারী, সৈনিক ও অনুচরবর্গের সঙ্গে সুখ-দুঃখ তিনি সমান ভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনি গুণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তুর্কী এবং ফার্সী ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তাঁর রচনা ছিল শব্দ বহুল অলংকারপুষ্ট।

সামাজিক ব্যবহারে হুমায়ুন ছিলেন মার্জিত-ভদ্র এবং মিষ্টভাষী। তাঁর দানশীলতা-উদারতা বন্ধুবান্ধবকে আকর্ষণ করতো। মুসলিম দর্শন, গণিত ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বহু গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। কিন্তু…

শবনম, আমার দুঃখ হয়, কষ্ট অনুভব করি। কারণ এদেশটার সাধারণ মানুষ বড় গরীব। দারিদ্র্য আর মহামারী এদেশের সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। রোগ আর অনাহারের সঙ্গে প্রতিনিয়ত অসহায় মানুষগুলো যুদ্ধ করে চলেছে। মরেও না, বাঁচার পথে খোঁজে। ধর্ম বিশ্বাসের জোরে এগিয়ে চলে।

হাজার-হাজার মন্দির, অসংখ্য তীর্থস্থান। শাসক শোষণের ভাণ্ডারে পূর্ণ করে তোলে। হুমায়ুন রাজত্ব করে গেছেন, আজ বাদশাহ আলমগীরও রাজত্ব করেছেন। অথচ হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাঁর প্রজা। তবে কেন এই বিভেদ? কেন এই লুণ্ঠন চলছে এবং চলেছে? আমি বুঝতে পারি না। আমার খুব খারাপ লাগে।

অনেকদিন আগের কথা। আমি তখন কিশোরী। ধর্মাধর্ম নিয়ে কোন রকমের মাথা ব্যথা ছিল না। সিত্তীউন্নিসার তখন বেশ বয়েস হয়েছে। একদিন দুপুরে তাঁর ঘরে এমনিই গিয়েছিলাম। প্রায়ই যেতাম তাঁর কাছে। অতি সাধারণ ভাবে জীবনযাপন করতেন তিনি। সেদিন তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম এক বিধবা হিন্দু প্রৌঢ়া তাঁর ঘরে একই গালিচায় বসে কথা বলছেন। দেখে অবাক হয়েছিলাম। হিন্দু এবং মুসলমান একই আসনে বসে আছে এমন দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি। শুনেছি, মুসলমানকে ছুঁলে নাকি হিন্দুর জাত যায়!

আমাকে দেখে সিত্তীউন্নিসা সস্নেহে কাছে ডেকে বসিয়ে ছিলেন। মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিনের পরিচয় দুজনের। জাহাঙ্গীরের সময় স্বামী চাকরী করতেন। এখন ছেলে করে। বেনারসের এক গ্রামে বাড়ি। দীর্ঘদিন পরে আগ্রায় এসেছেন।

অনেকক্ষণ বসে দুজনের কথা শুনেছিলাম। বার বার দেখেছিলাম মহিলাকে। আমাকে বোধহয় লক্ষ্য করে থাকবেন সিত্তীউন্নিসা। এক সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কিছু বলবে?

ধরা পড়ে গিয়ে বিব্রত হয়েছিলাম। মাথা ঝাঁকিয়ে ছিলাম।

সস্নেহে তিনি বলেছিলেন, যদি কিছু বলার থাকে স্বচ্ছন্দে বলতে পার। সঙ্কোচের কোন কারণ নেই তোমার।

একটু চিন্তা করে মৃদু কণ্ঠে আমি বলেছিলাম, শুনেছি কোন হিন্দ মুসলমানকে ছুঁলে নাকি জাত যায়?

সিত্তী একটু গম্ভীর হয়েছিলেন আমার কথা শুনে। মহিলার মুখে কিন্তু একটু হাসির রেখা লক্ষ্য করেছিলাম। একটু পরে তিনি বলেছিলেন, তুমি কোথায় এবং কার কাছে এসব কথা শুনেছো জানিনা। তবে তুমি যে প্রশ্নটা ওনার সামনে করেছো তাতে আমি খুবই খুশি হয়েছি। উনি চলে গেলে এই প্রশ্নটা যদি তুমি আমাকে

করতে, আমার মনে হয় আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারতাম না। আমরা দুজন একই আসনে বসে আছি। আমি মুসলমান উনি হিন্দু। তোমার প্রশ্ন মুসলমানের সঙ্গে বসার জন্য ওনার কি জাত গেছে? প্রৌঢ়ার দিকে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কি বলেন?

সেদিন প্রৌঢ়া বিধবা অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, মা, তুমি যে প্রশ্ন করেছো তা খুবই কঠিন। মুসলমানকে ছুঁলে হিন্দুর জাত যায় একথা তুমি যেখানেই শুনে থাকনা কেন এর মধ্যে যথেষ্ট সত্য রয়েছে। মোটেই মিথ্যা বটনা এটা নয়। শুধু তাই নয়, হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদও প্রবল। বর্ণ হিন্দুরা, যেমন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় অন্তজদের প্রবল ঘৃণা করে, সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে। অবশ্য ব্যতিক্রম যে একবারে নেই তাও নয়। আর এর মূলে কুসংস্কার। তবে জাত কি তা যাঁরা জেনেছেন, বুঝেছেনতাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তবে মা, আমি অতি সাধারণ গ্রামের মেয়ে ছিলাম। এক সময় আমার মধ্যেও জাতপাতের ব্যাপারটা খুবই ছিল। আমার স্বামী আমাকে বুঝিয়ে মনটাকে কিছুটা কুসংস্কার-মুক্ত করে গেছেন। দেখেছি কিছুই যায় না। কথাগুলো বলতে বলতে হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, জাতটা যে কি আজও বুঝলাম না।

প্রৌঢ়ার সব কথা সেদিন বুঝিনি, তবে বড় ভাল লেগেছিল। আরো কিছু জানার জন্য উৎসুক হয়েছিলাম। তিনি বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরে-ছিলেন, আর কিছু জিজ্ঞেস করবে?

সংকুচিত ভাবে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

হাসি মুখে তিনি বলেছিলেন, স্বচ্ছন্দে তুমি জিজ্ঞেস করতে পার। তবে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হলে নিশ্চয়ই উত্তর দেব।

বলেছিলাম, আচ্ছা এতো মন্দির কেন হিন্দুস্থানে?

—দেশটা যে বিশাল সেই জন্যই। তবে তুমি বোধ হয় জানতে চাইছো এত রকমের দেবতা কেন? তাই না?

সত্যই তাই। ঘাড় নেড়ে জানিয়ে ছিলাম সে কথা।

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, দেশটার আয়তনের তুলনায় মন্দিরের সংখ্যা কিন্তু কম। সেই জন্য প্রায় প্রতিটি হিন্দুর গৃহ দেবালয়। বহু রকমের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান গৃহেই পালন করা হয়। শাহাজাদী, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্মবোধ মানুষকে সুশৃঙ্খল-সংযত করে। এদেশটার মানুষ বড় গরীব। নিত্য অভাব অনটন অনাহার লেগেই আছে। দেবতার কাছে মাথা খোঁড়ে, ভাগ্যকে দোষারোপ করে। এইভাবেই দিন কাটায়, বেঁচে থাকে।

সত্যি কথা বলতে কি সেদিন তাঁর কথাগুলো ঠিকমত বুঝতে পারিনি। তবে সেই প্রৌঢ়া বিধবাকে আমার ভাল লেগেছিল। পরে সিতাউন্নিসার কাছে শুনেছিলাম

বিরাট এক পণ্ডিত বংশের মেয়ে ছিলেন তিনি। ধর্মীয় গোঁড়ামী কিছু কম ছিল না তাঁর মধ্যে। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময় স্বামী দিল্লী সুবায় রাজস্ব বিভাগে ভাল নোকরী করতেন। খুবই সৎ, নিষ্ঠাবান এবং তেজস্বী মানুষ ছিলেন তিনি। যেখানে রাজস্ব বিভাগের অন্যান্য কর্মচারীরা উৎকোচ গ্রহণ করতেন, হয়রান করতেন মানুষকে, সেখানে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি কোনদিন উৎকোচ গ্রহণ করেন নি। আর সেই জন্যই তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অতিসাধারণ মানের। তাঁর চেয়ে নিম্ন আয়ের কর্মচারীরা যেখানে বিলাস ব্যসনে দিন কাটাতেন, সেখানে মহিলাকে সংসার পরিচালনা করতে হ'ত অনেক হিসাবের মধ্যে দিয়ে। কটা সন্তান নিয়ে চালাতে তাঁকে হিমসিম খেতে হ'ত।

স্বামীকে কখনো কখনো বলতেন, এভাবে যে আর সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

স্বামী বলতেন, বুঝতে পারছি খুবই কষ্ট হচ্ছে তোমার।

তিনি বলতেন, যদি ভুল না বোঝ একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

হাসিমুখে স্বামী বলতেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করবে, তার মধ্যে ভুল বোঝার প্রশ্ন আসে কেন ?

তিনি বলতেন, অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশ করা তুমি পছন্দ কর না, সেই জন্যই কথাটা আগে বলছি।

গম্ভীর হতেন স্বামী। চিন্তিত গলায় বলতেন, বল কি জানতে চাও ?

—আচ্ছা তোমার অধীন কর্মচারী যারা তারা বেশ ভালভাবেই সংসার প্রতিপালন করছেন। অথচ...

হাসিমুখে বাধা দিয়ে স্বামী বলতেন, অথচ আমি তা পারছি না কেন এই তো ? প্রশ্নটা তোমার মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক ! আমার অধস্তন কর্মচারী, আমার চেয়ে কত কম বেতন পায়, অথচ বেশ বিলাসিতার মধ্য দিয়েই জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। অথচ আমি ? কত বেশি বেতন পাই কিন্তু সংসারে আবার অনটন না থাকলেও সচ্ছলতার চিহ্ন মাত্র নেই। এর কারণ কি ? একটু চুপ করে থেকে তিনি বলতেন, এই অবস্থা কিন্তু আমার একার নয়, আমার মত অনেকেরই, তবে আমাদের সংখ্যা কম। সংখ্যাগরিষ্ঠের দল আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ পেয়েছে।

—আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ ? অবাক হতেন তিনি, সেটা কি ?

—হাত পাতলেই অর্থ। দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আসেন প্রায় সকলে। অলিখিত নিয়ম।

—তুমি পাত না কেন ?

—ঘৃণা হয়। নিজেকে ভিখারীর মানসিকতায় নামিয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট বোধ করি। মনুষত্বের অবমাননা করা পাপ নয় অপরাধ। উৎকোচ গ্রহণ করলে সুখে থাকবো। সচ্ছলতা আসবে, অভাব অনটন দূর হবে। কিন্তু নিজের কাছে নিজে ছোট

হয়ে যাব। বিবেক বিসর্জন দিতে আমি পারবো না। নষ্ট করতে পারবো না মানসিক শান্তি। ঈশ্বর জীব দিয়েছেন, আহার তিনিই দিচ্ছেন। আমি আমার কর্মের বিনিময়ে তা লাভ করছি। লোভ, লালসা, হিংসা, মোহ ত্যাগ করো। সৎ হবার চেষ্টা করো, নিজেকে সৎ কর্মে, সৎ চিন্তার মধ্যে নিয়োজিত রাখো। হঠাৎ থামতেন তিনি। স্ত্রীকে দেখতেন। বলতেন, আমার কথাগুলো তোমার হয়তো ভাল লাগছে না, তাই না?

তিনি বলতেন, তোমাকে আমি চিনি বলেই খারাপ লাগছে না। তবে সংসার চালানো দিন দিন বড় কঠিন হয়ে উঠছে।

—আমিও তা বুঝি। বলতেন, প্রলোভন কখনো মাথা চাড়া দেয় না তা নয়। সে সময় বড় অসহায় বোধ করি। পথ খুঁজি। চিন্তা করি এই সততার কি মূল্য? সচ্ছলতার স্বাদ তো আমিও পেতে পারি। আমি তো আমার স্ত্রী-পুত্র পরিজনকে সুখে রাখতে পারি। সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে অসহায় মানুষের কথা। কত শত মানুষতো আমার চেয়েও অনেক-অনেক কষ্টের মধ্যে বেঁচে আছে। কত মানুষের তো আগামীকালের অন্ন সংস্থান নেই। তাদের তুলনায় আমি তো অনেক সুখে আছি। শান্তিতে আছি। তাহলে কেন আমি সামান্য অর্থ সাময়িক সুখের জন্য মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিই? স্ত্রীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করতেন, তুমি কি বল?

তিনি বলতেন, আমাদের সুখের জন্য কোন দিনই তুমি নিজেকে বিক্রি করে দিও না।

হাসতেন স্বামী। বলতেন, শুধু নিজের জন্য নয়, তোমাদের জন্যই আমি নিজেকে বিক্রি করে দিতে পারিনি। বিশেষ করে আমার সন্তানদের জন্য। অভাব, অনটন, কষ্টের মধ্যে তারা বড় হবে, জানবে তাদের জন্মদাতা অর্থের বিনিময়ে সততা বিসর্জন দেয়নি। আর তারাও অংশভাগী ছিল।

সিত্তীউন্নিসার কাছে সেই মহিলার আরো অনেক কথাই শুনেছিলাম। স্বামী গত হয়েছেন। জ্যেষ্ঠপুত্র আগ্রা সুবায় রাজস্ব বিভাগেই গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করছেন এখন। পিতার মত পুত্রও সৎ-নিষ্ঠাবান।

১৩

শবনম, গতরাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। তবিয়তটাও কদিন ধরে খুব একটা ভাল যাচ্ছে না। খালেদা হেকিমের দাওয়াইয়ের কথা বলেছিল। বাধা দিয়েছি। দেখি না আর দু-একটা দিন। যে সময় প্রতিদিন রাত্রে শয্যা গ্রহণ করি কাল একটু দেরি হয়েছিল। দেরি হওয়ার কারণ বাদশাহের এত্তেলা। তিনি আসবেন। কেন আসবেন তা তিনিই জানেন। মনটাকে খুব একটা ভারাক্রান্ত হতে দিই নি। কি হবে অহেতুক চিন্তা করে। নসিবে যা আছে তাই হবে।

খালেদা বলেছিল, আমার কিন্তু ব্যাপারটা খুব একটা ভাল বোধ হচ্ছে না।

উত্তরে বলেছিলাম, ভালমন্দের ভাবনা এখন ছাড়তো। মিছি-মিছি ভেবে কোন লাভ নেই। যা হয় হবে। হয় ভাল, না হলে মন্দ। তার বেশি তো কিছু হবে না।

খালেদা বলেছিল, ঠাট্টা নয়। যা বলি শোন। আমার মনে হচ্ছে তোমার ভাই জান নতুন কোন মতলব আবার আঁটছে। সেই বচপন থেকে দেখেছি। কত ভাল লেড়কা। কি সুন্দর দেখতে। যে দেখতো সেই চোখ ফেরাতে পারতো না। তোমার আম্মাজানের মতই দেখতে ছিল বচপনে। কোন ঝুট ঝামেলা ছিল না। সব সময় হাসিখুশি। কথা বলতো আস্তে আস্তে। লেকিন······

চেয়েছিলাম খালেদার দিকে। বলেছিলাম, আবার কি হল ?

খালেদা বলেছিল, সচ্ বলছি, আমার কিন্তু ভাল লাগতো না।

—ভাল লাগতো না তোমার, কেন ? খালেদার গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলাম, এ কথা তো আগে কোনদিন বলনি আমাকে।

—শুধু তোমাকে কেন, কাউকেই কোনদিন বলিনি। বলে লাভ কি ? আর তা ছাড়া আমি তো বাঁদী। সাদী হওয়ার পর তোমার আম্মাজানের সঙ্গে এসেছিলাম। সেই থেকে আছি এখনো। তোমাদের ভাইবোনেরা সেই ছোটবেলা থেকে কেউ কারো মত নয়। মিলমিশ খুব একটা দেখিনি তোমাদের মধ্যে। তার মধ্যে তুমি ছিলে বদমেজাজী। রাগলে তোমার জ্ঞান থাকতো না। কতবার যে আমাকে কামড়ে রক্ত বার করে দিয়েছো তার লেখাজোখা নেই।

খালেদার কথাগুলো শুনতে ভাল লেগেছিল। বয়েস হয়েছে। এখন প্রায়ই অতীতের কথা মনে পড়ে। বলে, সব সময় শুনতে ভাল না লাগলেও শুনতে হয়। বলেছিলাম, একটু আগে কি যেন বলছিলে ?

খালেদা ভেবেছিল। মনে পড়েনি। জিজ্ঞেস করেছিল, কি বলছিলাম বলতো ?

—কি ব্যাপার-স্যাপারের কথা বলেছিলে যেন।

মনে পড়েছিল খালেদার। বলেছিল, সত্যি বলছি একটা কিছু হয়েছে। এই দেখনা কেন, এক বছর পর তোমার বন্ধুর খত তোমার হাতে এল। তারপর বড় শাহাজাদী এল। আজ তোমার ভাইজান আসবে বলে জানালে। কেন ?

—বোধ হয় কোন প্রয়োজন আছে।

—জরুরত। ঠোট উল্টে ছিল খালেদা। বলেছিল, না, জরুরত ছিল তখন, যখন তোমার রুপেয়ার দরকার ছিল তার। তখন তুমি বহিন ছিলে তোমার ভাই-জানের, এখন দুশমন।

চমকে উঠেছিলাম খালেদার কথায়। ওর মুখে কিছু বাধে না। দেখে আসছি সেই ছোটবেলা থেকে। অপ্রিয় সত্য ও মুখের ওপর বলে দিতে এতটুকু দ্বিধা করে না। তবে গত রাত্রে ও যে কথা বলেছিল তা মিথ্যা নয়। সেই ভাতৃদ্বন্দ্বের সময়

জাহানারা জোর গলায় বলেছিল, জরুর।

—তাহলে যে গরীব মানুষটা তার বিবির মৃত্যুর পর তাজমহল তৈরি করতে পারে না, সেকি তার বিবিকে পেয়ার করতো না?

এই কথায় জাহানারা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। চিৎকার করে বলেছিল, না, করতো না?

শুনে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে বুঝেছিলাম জাহানারা আমার যুক্তি মানবে না। হাজার বোঝালেও সে এখন আমার কথা বুঝবে না। খুবই খারাপ লেগেছিল। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়েছিল। এই তিক্ততা আমি আশা করিনি। অপরাধী কণ্ঠে বলেছিলাম, আমাকে ক্ষমা কোর।

চলে আসছিলাম। জাহানারা ডেকেছিল, শোন!

দাঁড়িয়েছিলাম।

সে বলেছিল, সেই ছোটবেলা থেকে তুমি জেদী, এক গুঁয়ে, অসভ্য। তুমি প্রকাশ্যে আব্বা আর আম্মাজানের বদনাম করবে, এটা তোমার কাছ থেকে আশা করিনি।

চুপ করে চলেই আসছিলাম কিন্তু পারিনি। জাহানারাকে যারা ঘিরে ছিল তাদের মধ্যে কেউ বলেছিলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন শাহাজাদী, আপনার বহিন মুঘল বংশের কলঙ্ক।

শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনাদের মধ্যে একথাটা কে বললেন?

বোধ হয় প্রচণ্ড রেগে গিয়ে থাকবো আমি। খালেদার কাছে শুনেছি, রেগে গেলে আমি নাকি অন্যরকম হয়ে যাই, আমার টানা-টানা দুটো চোখে আগুন জ্বলে যেন। মুখটাও কঠিন হয়ে ওঠে। হয়তো সেই রকমই হয়ে উঠেছিল আমার মুখটা। কেউ কোন কথা বলেনি।

জাহানারা এগিয়ে এসেছিল। বলেছিল, যেই কথাটা বলে থাকুক তোমাকে, সেকি খুব অন্যায় বলেছে?

জাহানারার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলাম, ন্যায় অন্যায়ের কথা পরে হবে। আমি জানতে চাই কে কথাটা বলল?

জাহানারা বলেছিল, যদি জানতে পার কি করবে তার?

সেই ভয়ঙ্কর রাগের মধ্যেই আমি হেসে ফেলেছিলাম। কেন হেসেছিলাম তা আজ আর মনে নেই। জাহানারার দিকে চেয়ে হাসি মুখে বলেছিলাম, সত্যি তোমার তুলনা হয় না শাহাজাদী জাহানারা। কথাটা যেই বলে থাকুক, কথাটা যদি তোমাকে উদ্দেশ্য করে বলতো, আমি তোমার মত তাকে আড়াল করতাম না, তার গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিতাম।

কথা কটা বলে দ্রুত চলে এসেছিলাম। একটু দূরে আসার পর সেই আমীরের

বিবি, যিনি আমাকে হাত ধরে থামিয়ে ছিলেন, কাছে এসে অপরাধী কণ্ঠে বলেছিলেন, আমার গোস্তাগি মাপ কোর শাহাজাদী। আমার জন্যই তোমার বহিনের সঙ্গে তিক্ততা ঘটলো।

মাথাটা তখনও গরম ছিল। তবু তার মধ্যেই তাঁকে বলেছিলাম। না-না, ওই রকম একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হবে এটা আপনি কি করে জানবেন বলুন? লজ্জা এটাই, আমাদের দু বোনের প্রকৃত সম্পর্ক আজ প্রকাশ্যে বেরিয়ে পড়লো। সেজন্য আমার এখন দুঃখ হচ্ছে।

তিনি বিদায় নিয়েছিলেন। দেখা হয়েছিল আব্বাজানের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে একটু ঘুরেছিলাম। জাহানারার সঙ্গে তিক্ততার কথা তাঁকে জানাই নি। কি হবে তাঁকে অহেতুক বিব্রত করে। এক সময় ফিরে এসেছিলাম হারেমে নিজের কক্ষে।

সে রাতটা জাহানারার কথা মনে হয়েছিল। তার পরদিনও। মনকে বুঝিয়ে ছিলাম। কদিন পরে ভুলে গিয়েছিলাম নওরোজের কথা। আর কদিন পরেই আব্বাজানের একটা পত্র পেয়েছিলাম। তিনি লিখেছিলেন,

স্নেহের রোশেনারা,

কদিন হল তোমাকে দেখিনি। আল্লার দোয়ায় নিশ্চয়ই ভাল আছো। জাহানারার কাছে নওরোজের উৎসবে মীনা বাজারে তার সঙ্গে তোমার বিবাদের কথা শুনলাম। শুনে ভাল লাগলো না। দুঃখও পেয়েছি। আমার সন্তানরা আমার কাছে খুবই স্নেহের। তোমাকেও আমি যথেষ্ট ভালবাসী। আমি চাই না আমার সন্তানরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করুক। তোমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দে থাক, এটাই আমি চাই। তুমি আমার ভালবাসা নিও।

আব্বাজান

আব্বাজানের চিঠিটা পড়ে অবাক হয়েছিলাম। কষ্ট পেয়েছিলাম। জানি না, জাহানারা তাঁকে কি বলেছে। কি বুঝিয়েছে। তবে আমার বিশ্বাস প্রকৃত ঘটনা তাঁকে জানানো হয়নি। যদি সব কথা তিনি শুনতেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এমন পত্র তিনি আমাকে লিখতে পারতেন না। এক মুখে তিনি শুনেছেন, বিচার করেছেন। আমাকে তাঁর ডাকা উচিৎ ছিল। কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করার আগে তার বক্তব্যও শোনা উচিৎ। তা তিনি করলেন না। জানি, জাহানারা তাঁর নয়নের মণি। তাঁর বিশ্বাস জাহানারা কখনো মিথ্যা বলে না। সেই বিশ্বাসেই তিনি বিচার করেছেন।

আব্বাজানের প্রতি রাগ নয়, অভিমানে বুকটা ভরে গিয়েছিল। সত্য ঘটনা জানানোর জন্য তাঁর কাছে যেতে মন চায়নি আমার। তাঁর সব অভিযোগ আমি নীরবে মেনে নিয়েছিলাম। আর সত্যি কথা বলছি, জাহানারা আমার সম্পর্কে কি ভেবেছে জানিনা। আমি কিন্তু জাহানারাকে কোন দিনই হিংসা করিনি।

পিতার সেই পত্র পাবার পর নিজেকে আরো গুটিয়ে নিলাম। কোন অপরাধ না

করেও আমি অপরাধিনী। কি অদ্ভুত বিচার! মেলামেশা করা খুব একটা ভাল লাগে না আমার। যেটুকু করতাম তাও বন্ধ করে দিলাম। একা একা থাকতে লাগলাম।

খালেদা কিছু অনুমান করেছিল। বলতো, কি হয়েছে তোমার বলতো?

ম্লান হেসে বলতাম, কি আবার হবে।

খালেদা বলতো, নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে তোমার। কিছুদিন লক্ষ্য করছি, ভাল করে খাচ্ছ না, ঘুমাচ্ছ না, আগে ঘর ছেড়ে বেরুতে, এখন তাও বন্ধ করে দিয়েছো। হয় তোমার কোন বিমার হয়েছে, না হলে জিনে ধরেছে তোমাকে। কোনটা হয়েছে আমাকে বল, একটা কিছু ব্যবস্থা করি।

বলতাম কিছুই হয়নি আমার।

খালেদা বলতো, কিছু হয়নি বললে, বিশ্বাস করি কি করে বল। তুমি চুপ হয়ে গেলেই আমার যে চিন্তা বাড়ে। কিছুই ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে আমাকে যে এমন করে কেন জ্বালাও বুঝি না।

উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকতাম।

একজনের চোখকে কিন্তু ফাঁকি দিতে পারিনি। সে বলবন। বেশ কিছুদিন পরে আমার কক্ষের বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে ডেকেছিল, বেগম!

কাছে এসে বলেছিলাম, একি বুড়ো, তুমি! কোথায় ছিলে এতদিন?

—মেহেরবান খোদার দুনিয়াতেই আছি বেগম। হেসে বুড়ো খোজা বলেছিল, ঝামেলা করলে তোমার বড়া রহিন, ফলভোগ করছো তুমি?

শুনে বুকের মধ্যে চমকে উঠেছিল। বলেছিলাম, এসব কি যা-তা বলছো তুমি?

—যা বলছি সচ বলছি। তোমার খালেদা বড় ভেবে মরছে। ভাবছি, সত্যি কথাটা তাকে বলে দিই।

—খবরদার বুড়ো, ও কাজ কোর না। খালেদা তাহলে চারিদিকে রটিয়ে বেড়াবে। ওর মুখের কোন লাগাম নেই।

—লেকিন, যা সত্যি তা তো চিরদিন গোপন থাকে না। মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছ।

চুপ করেছিলাম।

চলে যাবার আগে বলবন বলেছিল, বেগম, তোমার জন্য আমারও দুঃখ হয়। বদ নসিব তোমার। কেউ তোমাকে বুঝলো না।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর শির-শির করে উঠেছিল। বলবনের কথাটা খুব একটা মিথ্যে নয়। কেউ আমাকে বুঝল না। আপশোষ? না, আপশোষ করে কোন লাভ নেই। কি হবে মিথ্যে আপশোষ করে! হতাশাকে কোনদিনই আমার ঘাড়ের ওপর চেপে বসতে দিইনি। তবে এতটা বয়স পর্যন্ত দেখলাম, আমাকে শুধু ভুলই বুঝে গেল সকলে। কাছে টানলো না। একটু আন্তরিকতা, স্নেহ···না, কিছুই পেলাম না।

আব্বাজানের সেই পত্র পাওয়ার পর নিজেকে আমি আরো সরিয়ে নিলাম সকলের চোখের সামনে থেকে। হয়তো যাদের সঙ্গে এতদিন একটু-আধটু মেলামেশা ছিল, তারাও আমাকে ভুল বুঝলো। বদমেজাজী অহঙ্কারী বলে এতদিন যথেষ্ট দুর্নাম ছিল, হয়তো তার ওপর আরো কিছু যুক্ত হল। তবে, আমি কোন দিকেই ফিরে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করিনি।

এই ভাবেই চলছিল। কটা মাস পরে হঠাৎ খবর পেলাম আব্বাজান অসুস্থ। ঝরোখা ই দর্শন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। দরবারেও যাচ্ছেন না। সে সময় কেউ-ই তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না।

একদিন দেখতে গেলাম তাঁকে। বিনীতভাবে হাবসী খোজা প্রহরী জানাল, জাহাঁপনার সঙ্গে কারো দেখা করার হুকুম নেই। তিনি অসুস্থ।

বললাম, তিনি অসুস্থ বলেই আমি তাঁকে দেখতে এসেছি। তুমি কি আমাকে চেনো ?

হাবসী প্রহরী বিনীত ভাবে উত্তর দিল, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে চিনি।

বললাম, যদি আমাকে চেনো তাহলে খবর দাও আমি একবার আব্বাজানকে দেখবো।

প্রহরী চলে গিয়েছিল। আব্বাজানের মহলে প্রবেশ পথের একধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিলাম। আর চিন্তা করেছিলাম সেই কথা, বাইরের কোন ব্যক্তি নয়, অসুস্থ বাদশাহের কন্যারও প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু কে এই নিষেধ জারী করেছে ?

একটু পরে প্রহরী ফিরে এসেছিল। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল সে।

প্রশ্ন করেছিলাম, কি হল প্রহরী ?

সে মাথা নিচু করেই উত্তর দিয়েছিল, ভেতরে যাওয়ার হুকুম পাওয়া গেল না জনাব।

জানতে চাইলাম, কে হুকুম দিল না।

প্রহরী বলল, শাহাজাদী।

অর্থাৎ জাহানারা। ফিরে এলাম। খবর পেলাম কয়েকজন বিশিষ্ট আমীর আব্বাজানের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ করছেন। শয্যাশায়ী আব্বাজান তাঁদের সঙ্গে রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে কথা বলছেন। শুধু প্রবেশ অধিকার পেলাম না আমি। জাহানারা আমাকে আব্বাজানের কাছে যেতে দিল না। কেন ?

মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছিল। কি করবো কিছুই ভেবে পাইনি। ঠিক এমনি সময় দাক্ষিণাত্য থেকে ভাইজান ঔরংজীবের পত্র পেয়েছিলাম। তিনি জানতে চেয়েছিলেন আগ্রার প্রকৃত ঘটনা।

এধারে আব্বাজানের অদর্শনে নিত্য নানারকমের গুজবের সৃষ্টি হতে লাগলো। তা নিয়ে প্রকাশ্যে, গোপনে নানান আলোচনা। হারেমও তার থেকে রেহাই পায়নি। আমাকেও বিরক্ত করা সুরু করেছিল। কিছু জানি না বললে, সেকথা

কেউ বিশ্বাস করেনি। উল্টে দুচার কথা শুনতেও হয়েছে।

একদিন আব্বাজানের মৃত্যু সংবাদ কানে এসেছে। শুনে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। বুকের মধ্যে কান্নার সমুদ্রটা উথলে উঠেছিল।

খালেদা বলেছিল, অভিমান না করে এ সময় একবার যাও, বসে থেক না হাত পা গুটিয়ে।

যাবার জন্য তৈরি হয়েছিলাম। সেই সময় বলবন এসেছিল। শুনে বলেছিল, তোমার দিমাগের ঠিক নেই বেগম। উল্টো-পাল্টা যা শুনছো তাই বিশ্বাস করছো। জাহাঁপনার তবিয়ৎ ঠিক নেই, লেকিন, তিনি জিন্দা আছেন। তুমি ওসব কথা শুনো না। ঠিক খবর আমি ঠিক সময়ে তোমাকে বলে যাব।

বলেছিলাম, তুমি কি আব্বাজানকে দেখেছো?

বলবন বলেছিল, না, আমি দেখিনি।

—তাহলে তুমি ঠিক খবর জানছো কেমন করে?

গম্ভীর ভাবে বলবন বলেছিল, জানছি কেমন করে সে কথা আমি তোমাকে বলতে পারবো না; লেকিন, আমি যা জেনেছি তা ঝুট নয়।

সেদিন ভেবে পাইনি বলবন কেমন করে সব খবর পেত! পরে বুঝেছি। প্রমাণ পেয়েছি। একটা বৃদ্ধ বান্দার কি বিরাট প্রভাব ছিল। যা অসম্ভব, চিন্তার অতীত বলে মনে হয়েছিল, তাই সম্ভব করেছিল। বাদশাহ আলমগীরের নিশ্ছিদ্র পাহারা কিছুই করতে পারেনি। পরিণতি···

না, এখন ওসব কথা থাক। সেদিনের কথা বলি। আব্বাজানের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদটা কিন্তু দ্রুত ছড়িয়ে গিয়েছিল চারিদিকে। ফলে সাম্রাজ্যের চারিদিকে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। সুজা বাংলা দেশে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। মোরাদ তো গুর্জরে উজীর আলি নকীবকে হত্যা করে নিজেকে দিল্লীর বাদশাহ বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে নিজের নামে মুদ্রাও প্রচলন করেছিলেন। সুজাও বাংলা ত্যাগ করে সৈন্য বাহিনী নিয়ে আগ্রার দিকে যাত্রা করেছিলেন। ঔরংজীব কিন্তু দাক্ষিণাত্য থেকে সোজা আগ্রার দিকে এলেন না। তিনি মোরাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। দুজনের মিলিত বাহিনী এগিয়ে এসেছিল আগ্রার দিকে।

সেই সময় প্রয়োজন হয়েছিল অর্থের। গোপনে একের পর এক আমার কাছে পত্র পাঠিয়েছেন ঔরংজীব। অর্থের যোগান দিয়ে গেছি আমি। আমি ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছি।

একদিন বলবন এসে ম্লান মুখে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল। তখন অপরাহ্ণ শেষ হয়ে আসছে। গোধূলির আলপনা আঁকা সুরু হয়েছে। পাখিরা ডাকছে। শীতের সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে গুটি গুটি পায়ে। বলবন এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল।

খালেদা কাছেই ছিল। কাছে এসে বলেছিল, কি মিয়া কোথায় ছিলি এতদিন?

বলবন বলেছিল, দোজকে।

খালেদা বলেছিল, নরক-ই তোর ঠিক জায়গা। তা মরবি কবে?

বলবন বলেছিল, সেই জন্যেই তো এলুম।

—এখানে মরার জন্যে এলি? চোখ কপালে তুলেছিল খালেদা।

—মরার জন্যে নয়, একলা মরতে ভয় করলো সেই জন্য তোমাকে নিতে এলুম।

—আমি মরতে যাব কোন্ দুঃখে শুনি?

—শুধু দুঃখেই কি মানুষ মরে? আনন্দে মরেনা? এক সঙ্গে দুজনে মরলে কত আনন্দ বলতো?

দুজনের কথা বসে বসে শুনেছিলাম কিন্তু উপভোগ করিনি। সেই বাচ্চা বয়েস থেকে দুজনকে দেখে আসছি। একে অপরকে সহ্য করতে পারে না। সাপ আর নেউল যেন। দেখা হলেই ঝগড়া। দীর্ঘদিন খালেদাকে দেখলেই অঙ্গভঙ্গি করে রাগায় বলবন। হাসি হাসি মুখ করে খালেদার গালিগালাজ শোনে। যাবার সময় মুচকি হেসে বলে যায়, খালেদাবিবি, দিলটা বড় আরাম পেল।

সেদিন কিন্তু বলবনের মধ্যে খালেদাকে রাগানোর কোন চিহ্ন খুঁজে পাইনি। মনে হয়েছিল আমার কাছে এসেছে সে। কিছু বলতে চায়। আর তা যে মিথ্যা নয়, একটু পরেই খালেদা নিজের কাজে চলে গেলে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমাকে কিছু বলবে বুড়া?

বলবন একটু চুপ করে ছিল। একটু দেখেছিল আমাকে। তারপর মৃদু গলায় বলেছিল, এ তুমি কি করছো বেগম?

আমি যেন কিছুই জানি না, সেইভাবে প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কি বলছো বুড়া?

সে বলেছিল, দেখ চাপবার চেষ্টা কোর না। জানতে আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। আগে থেকে সাবধান করতে পারিনি। এখন চিন্তা করে দেখ। আমার মনে হয় এখনো সময় আছে।

আমি চুপ করে ছিলাম। কথাগুলো বলে একটু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল সে। তারপর ধীরে ধীরে চলে গিয়েছিল। আমি তাকে ডাকিনি। জানিনা সে কতটা জেনেছিল। কিন্তু ততোদিনে আমি আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে পড়েছি। বেরিয়ে আসি সে সাধ্য ছিল না আমার।

গত রাত্রে খালেদার কথায় সেইসব দিনের অসংখ্য স্মৃতি আমার মানসপটে একের পর এক ভেসে উঠেছিল। বিছানায় শুয়ে ঘুম আসেনি বহুক্ষণ। যন্ত্রণা বোধ করেছিলাম। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলামএক সময়।

কিন্তু হঠাৎ-ই ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল একসময়। মনে হয়েছিল কোন শব্দে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটেছে। বিছানার ওপর উঠে বসেছিলাম। শীতের রাত গভীর বলেই মনে হয়েছিল। তৃষ্ণা অনুভব করেছিলাম। খালেদাকে একবার ডাকলেই সে উঠে জল দিত। বড় সজাগ ঘুম তার। ডাকিনি। নিজে উঠে জল খেয়েছিলাম। শুয়ে

পড়েছিলাম আবার।

দুচোখের পাতায় ঘুম নামেনি আর। বড় বদ অভ্যাস। একবার কোন কারণে যদি রাতে ঘুম ভেঙে যায় আর ঘুমাতে পারিনা। গতরাতেও তাই হয়েছিল। ঘুমের বদলে ভিড করে এসেছিল রাশি রাশি চিন্তা। মনে পড়েছিল তোমার কথা। পত্রে অনেক কথাই লিখেছো। শুধু তোমার কথাই বড কম লিখেছো।

শবনম, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা। তোমার কথা ইদানীং বড় বেশি করে মনে পড়ে। কেন জানিনা বড দেখতে ইচ্ছে করে তোমাকে। আর তোমার কথা তাঁকেও আমি বলেছিলাম। শুনেছিলেন। বলেছিলেন, যদি সম্ভব হয় তোমার খোঁজ নেবেন। আমার বিশ্বাস কথা রাখবেন তিনি।

গত রাত্রে পিতা-পুত্রের প্রথম সাক্ষাতের কথাটা মনে পড়েছিল। পিতা চেয়ে চেয়ে দেখছেন পুত্রকে, পুত্রের জন্যই তাঁর কারাবাস তবু আত্মজকে দেখতে দেখতে গর্বে বুকটা ভরে গিয়েছিল পিতার। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, বিজাপুরে মানুষের মুখে মুখে তোমার কথা, তোমাকে নিয়ে কত আলোচনা। তোমার সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের সীমা-পরিসীমা নেই। সেই সঙ্গে তোমার সম্পর্কে কত অসম্ভব রটনা। সৈন্যদের মধ্যে তোমার সম্পর্কে প্রচণ্ড ভীতি। অস্বীকার করবো না আমারও যথেষ্ট কৌতূহল ছিল।

উত্তরে একটি কথাও বলেন নি শিবাজী। নীরবে পিতার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।

শাহজী বলেছিলেন, আমি কিন্তু শুধুমাত্র তোমাকে দেখবার জন্য আসিনি তোমার সঙ্গে আমার কিছু আলোচনাও আছে।

মৃদু কণ্ঠে শিবাজী বলেছিলেন, বলুন।

শাহজী বলেছিলেন, তোমার কার্যকলাপে সুলতান অসন্তুষ্ট।

—কিন্তু আমি কোন অন্যায় করিনি।

—তাঁর কয়েকটি দুর্গ এবং রাজ্যসীমা তুমি অধিকার করে নিয়েছো।

—তাঁর অন্যায় অত্যাচারের জন্যই তা করতে বাধ্য হয়েছি আমি।

—প্রজারা কর দেবে এটাই তো স্বাভাবিক নিয়ম?

—সে নিয়ম আমিও অস্বীকার করছি না। রাজাকে কর দেওয়া প্রজার অবশ্য কর্তব্য বলেই আমি মনে করি। কিন্তু তাই বলে এই নয় কর সংগ্রহকারীর দল নির্বিচারে চাষীর ক্ষেতের সব ফসল জোর করে তুলে নিয়ে যাবে। প্রতিবাদ করলে মেয়েদের ইজ্জত হানি করবে, গ্রামের পর গ্রাম আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

—বুঝলাম সৈন্যরা কিছুটা বাডাবাড়ি করেছে।

—সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সুলতানের কর্তব্য। আর এই যে বাড়াবাড়ি বলছেন, এতো এক দিনের অবিচার নয়। দীর্ঘদিন চলে আসছে। আবেদন জানিয়েও কোন ফল পাওয়া যায়নি।

—তা বলে সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে?

—অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে অপরাধ কোথায় ?

শাহজী পুত্রের মুখের দিকে অনেকক্ষণ স্থির নিস্পলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। এক সময় গম্ভীর কণ্ঠে ডেকেছিলেন, শিবা !

পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন শিবাজী। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, আদেশ করুন।

—আদেশ ? ম্লান হাসির একটা ক্ষীণ রেখা শাহজীর ওষ্ঠে ফুটেই মিলিয়ে গিয়েছিল। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল। ক্লান্ত কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, তোমাকে আদেশ করি এমন স্পর্দ্ধা আমার নেই।

—কেন পিতা ?

—আমি তোমার জন্মদাতা পিতা, একথা সত্য। শাহজী বলেছিলেন, কিন্তু পুত্রের প্রতি পিতার কোন কর্তব্য আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে পালন করিনি, তাই তোমাকে আদেশ করার কোন অধিকার আমার নেই।

—কিন্তু আমি মনে করি পুত্র বলে যদি আপনি আমাকে স্বীকার করেন, তাহলে আমাকে আদেশ করার অধিকার আপনার আছে। এই শিক্ষাই আমার মা আমাকে দিয়েছেন। আপনার প্রতি মনে এতটুকু বিরূপতা নেই। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

—শিবা !

—হ্যাঁ পিতা। যা বললাম, তার এতটুকু মিথ্যা নয়।

শাহজী দুহাত বাড়িয়ে অবহেলিত, পিতৃস্নেহ-বঞ্চিত পুত্রকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। অঝোর ধারায় দুচোখ বেয়ে তাঁর অশ্রু ঝরে পড়েছিল। অনেকক্ষণ পরে কষ্টে নিজেকে সংযত করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, শিবা, তোমার জন্য আমার গর্বের শেষ নেই। অসহায় মানুষের বল-ভরসা তুমি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন কখনো আদর্শচ্যুত না হও। কিন্তু আমি সুলতানের কর্মচারী, তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি আমাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। একরকম তাঁর আদেশেই আমি তোমার কাছে এসেছি। আমার অনুরোধ, যদি সম্ভব হয়, তাহলে কিছুদিনের জন্য তোমার কার্যকলাপ বন্ধ রাখ। আর যদি সম্ভব না হয়, তার জন্য আমি তোমাকে জোর করবো না। একটু চুপ করেছিলেন তিনি। পুত্রকে দেখেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন, শুধুমাত্র সুলতানের অন্যায় অত্যাচার বন্ধ করাই কি তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য ? অন্য কোন লক্ষ্য কি তোমার নেই ?

পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন শিবাজী। মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন, আছে পিতা !

শাহজীর মুখমণ্ডল হাসিতে ভরে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, আমি জানি। সমগ্র মারাঠা জাতি আজ তোমার দিকে চেয়ে আছে। আমি আশীর্বাদ করছি, নিশ্চয়ই তুমি সফল হবে।

পিতাকে প্রণাম করেছিলেন পুত্র।

এরপর কয়েক বছর (১৬৪৯ - ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) শিবাজী অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে কাল যাপন করেন। অবশ্য এর মধ্যে তিনি পুরন্দর দুর্গ অধিকার করেন। তারপর তিনি রাজ্য বিস্তারে মন দেন।

ক্ষুদ্র মারাঠা রাজ্য জাওলী। শিবাজী জাওলী রাজার কাছে দূত পাঠালেন। উদ্দেশ্য জাওলীরাজ শিবাজীর সঙ্গে যোগ দিন এবং স্বাধীন মারাঠা রাজ্য গঠনে সহায় হোন।

জাওলীরাজ প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, শিবাজী আবার কে? কোথাকার রাজা? স্বাধীন মারাঠা রাজ্য গঠনে তার কি অধিকার আছে?

বিনীত ভাবে দূত বলল, মহারাজ আপনি শিবাজীর নাম শোনেন নি?

জাওলীরাজ উদ্ধতভাবে বললেন, শুনেছি কি শুনিনি সে কথা পরে হবে। এখন বলুন শিবাজী কে?

দূত বলল, শিবাজী মারাঠা জাতির মুক্তিদূত।

হেসে উঠলেন জাওলীরাজ। পাত্রমিত্ররাও তাঁর সঙ্গে হাসিতে যোগ দিলেন। এক সময় হাসি থামিয়ে জাওলীরাজ বললেন, একটা নতুন কথা শুনলাম আপনার কাছ থেকে। মুক্তিদূত। খুব ভাল কথা। এখন বলুন তো আমি কি বন্দী হয়ে আছি?

দূত উত্তর না দিয়ে চুপ করেছিল।

জাওলীরাজ বলেছিলেন, শুনুন, শিবাজীর নাম আমি বিলক্ষণ শুনেছি। একটা ভণ্ড, প্রতারক। দেশের গরীব আর ছোট লোকদের নিয়ে দল গড়েছে। ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে। বংশ-মর্যাদা বলে কিছু নেই লোকটার। সেই লোকের সঙ্গে দল বাঁধতে আমি রাজি নই।

বিনীতভাবে দূত বলল, মহারাজ আপনি ভুল করছেন। শিবাজী···

—থামুন। ধমকে দূতকে থামিয়ে দিলেন জাওলীরাজ। বললেন, খুব দুঃসাহস তো আপনার। আমার রাজ্যে দাঁড়িয়ে বলছেন, আমি ভুল করছি। জানেন এই মুহূর্তে আমি আপনাকে প্রাণদণ্ড দিতে পারি?

জাওলীরাজের উগ্র মূর্তি দেখে থত-মত খেয়েছিল দূত। বলেছিল, অপরাধ মার্জনা করবেন মহারাজ।

—মার্জনা চাইছেন? শান্ত হয়েছিলেন জাওলীরাজ। বলেছিলেন, দূত অবধ্য। আপনাকে মার্জনা করলাম। আর শুনুন আপনাদের শিবাজীকে পাঠিয়ে দেবেন। তার অনেক নাম শুনেছি। লোকটাকে একবার দেখতে চাই। যদি ইচ্ছে হয়, তার সঙ্গেই কথা বলা যাবে।

দূত ফিরে এসেছিল। সব শুনেছিলেন শিবাজী। সংবাদ পাঠিয়েছিলেন জাওলীরাজের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতে চান। জাওলীরাজ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

শিবাজী জাওলী রাজ্যে গিয়েছিলেন। সেখানে দুজনের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিল তাঁরাই জানেন। কিছুদিন পরে জাওলীরাজ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে তোরণা দুর্গে আসেন কিন্তু নিজ রাজ্যে ফিরে যাওয়া আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ক্ষুদ্র জাওলী রাজ্য তখন শিবাজীর অধিকারে। তারপর…

১৪

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। খালেদার ডাকে ঘুম ভেঙ্গেছিল। বেশ বেলা হয়ে গেছে। বড় খারাপ লেগেছিল। এমন কোনদিন হয় না। খালেদাকে বলেছিলাম, আমাকে ডেকে দেবে তো।

খালেদা উত্তর দিয়েছিল, ইচ্ছে করেই ডাকিনি তোমাকে। তবিয়ৎ ভাল নয় তোমার। তার ওপর রাতভর ঘুমোও নি। তাই ভাবলাম ঘুমাচ্ছ-ঘুমাও

বিরক্ত হয়েছিলাম খালেদার কথায়। বিছানার ওপর উঠে বসেছিলাম. সমস্ত শরীরে ব্যথা। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।

খালেদা বলল, তোমার বুখার হয়েছে। গা বেশ গরম। আজ আর গোসল কোর না। আমি দাওয়াই আনিয়ে রেখেছি। সামান্য কিছু নাস্তা করে দাওয়াই খাবে।

কথাটা বলেই খালেদা চলে গেল। আব খালেদার প্রতি বিরক্তি ভাবটা দূর হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। যখন ঘুমিয়েছিলাম তখন নিশ্চয়ই আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখেছে ও। দাওয়াই আনিয়ে রেখেছে। খালেদা আমার কেউ নয়, সামান্য বাঁদী, কিন্তু ওব স্নেহ, মায়া, মমতার ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারবো না।

মনে আছে অনেক দিন আগে একবার খালেদাকে বলেছিলাম, আচ্ছা তুমি সব সময় আমার জন্য এত করো কেন?

খালেদার মেজাজটা ভাল ছিল সে সময়, বলেছিল, আমার যা কাজ তাই করি আমি।

গম্ভীরভাবে বলেছিলাম সচ বলছো।

খালেদা উত্তর দেয়নি, চুপ করেছিল।

বলেছিলাম, সত্যি করে বলতো তুমি, আগের জন্মে আমি তোমার কে ছিলাম?

তির্যক দৃষ্টিতে খালেদা আমাকে দেখেছিল একটু, তারপর বলেছিল, আগের জন্মে তুমি আমার দুশমন ছিলে। এ জন্মেও সেই দুশমনি করে যাচ্ছ সমানে।

অবাক হয়ে বলেছিলাম আমি তোমার সঙ্গে দুশমনি করি?

খালেদা বলেছিল, কর না? সেই বাচ্চা বয়েস থেকে কম দুশমনি করছো আমার সঙ্গে। লালকে জবান দিয়েছিলুম বলেই সব কিছু সহ্য করে যাচ্ছি। না হলে এতদিনে কোথায় চলে যেতুম।

কথা কটা বলেই চলে গিয়েছিল।

আম্মাকে খালেদা লাল বলে ডাকতো। আমাকে ডাকে লায়লা। আম্মাজান যখন খুব ছোট, নিতান্ত বালিকা, সেই সময় নানা আসফ খাঁ লাহোরের বাঁদী বাজার থেকে খালেদাকে খুবই সামান্য মূল্যে দিয়ে কিনে এনেছিলেন। উদ্দেশ্য মেয়ে আজুমন্দবানুর খেলার সঙ্গী আর সেই সঙ্গে ফাই ফরমাস খাটবে।

কিন্তু আসফ খাঁ খালেদাকে নিয়ে আগ্রায় ফেরার পর তাকে দেখে পরিবারের সকলে হৈ-হৈ করে উঠেছিল। লম্বা কালো, রোগা, দাঁত উঁচু মেয়েটাকে কোন আক্কেলে আসফ খাঁ খরিদ করে নিয়ে এলেন, কেউ বুঝতে পারে নি। বিবি অনুযোগ করে-ছিলেন, তোমার কি দিমাগ ঠিক নেই।

অবাক হয়ে আসফ খাঁ বিবির মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন, তাই মনে হচ্ছে নাকি?

বিবি বলেছিলেন, সেই রকমই সন্দেহ হচ্ছে এখন।

—কারণ?

—কারণ? ঝঙ্কার দিয়েছিলেন বিবি, ওই কুৎসিত মেয়েটাকে কোন্ আক্কেলে তুমি নিয়ে এলে শুনি?

—কেন এনেছি, তা তো বলেছি তোমাকে।

—তাই বলে ওই রকম একটা কুৎসিত মেয়েকে আরজুর নিজস্ব বাঁদী এনে দিলে?

খাচ্ছিলেন তখন আসফ খাঁ। বিশালদেহী মানুষ ছিলেন। খেতে বসলে তাঁর জ্ঞান থাকতো না। একের পর এক মোগলাই খানা তিনি উদরস্থ করতেন। এবং প্রচণ্ড বাস্তববাদী ছিলেন। খাওয়া শেষ করে বিবির দিকে চেয়ে মুচকি-মুচকি হাসতে হাসতে বলেছিলেন তিনি, আরজু, তোমার বেটী তার ফুফির মতই সুন্দরী হয়ে উঠবে কালে, তাই না?

বিবি বলেছিলেন, জরুর।

—বেটী আমার খাপসুরত লেকিন তার বাঁদী কুৎসিত, এই তো আপত্তি তোমাদের?

বিবি বলেছিলেন, আপত্তি করাটা কি অন্যায়?

জরুর অন্যায়। আসফ খাঁ বলেছিলেন, একটা সুন্দরী লেড়কী যদি তোমার বেটীর জন্যে নিয়ে আসতাম তোমরা নিশ্চয়ই খুশি হতে। বাঁদী বাজারে সুন্দর লেড়কীর অভাব নেই। আমি অনেক চিন্তা করেই নিয়ে আসি নি। কারণ কি জানো, বাঁদী মেয়েটাও দিন দিন সুন্দরী হয়ে উঠতো, তোমার বেটীকে সে হিংসা করতো। লেকিন, এই মেয়েটা যদি আরজুর কাছ থেকে একটু সহানুভূতি পায়, আরজু যদি ওকে বন্ধু করে নিতে পারে, কোনদিন বেইমানী করবে না ওই কালো কুৎসিত মেয়েটা।

ঘটনাচক্রে ঘটেও ছিল তাই। আম্মাজান বড় ভালবাসতো খালেদাকে। আম্মা-

জানের মৃত্যুর পর তিনদিন কিছু খায়নি খালেদা। দিনরাত্রি শুধু কেঁদেছে। আমি জোর করে তাকে খাইয়েছিলাম।

কথাগুলো মনে পড়তে বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। কানে এল খালেদার কথাগুলো, কি হল, হাঁ করে বসে বসে কি শোচছো এখনও?

উঠতে হয়েছিল। প্রাতঃকৃত্য শেষ করে নমাজ পড়েছিলাম। খালেদা একরকম জোর করে নাস্তা করিয়েছিল। হেকিমের কাছ থেকে নিয়ে আসা দাওয়াই খাইয়েছিল। বলেছিল শুয়ে পড়ো গিয়ে। আজ দিনভর একবারও উঠবে না, শুয়ে থাকবে।

কথা শুনতে হয়েছিল। বসে থাকতে ইচ্ছা করে নি। শুয়ে পড়েছিলাম।

হয়তো একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। হঠাৎ নিচে থেকে একটা গোলমালের শব্দে তন্দ্রাটা কেটে গিয়েছিল। আবার কি হল? বিছানার ওপর উঠে বসেছিলাম।

নিচের চিৎকার চেঁচামেচিটা ক্রমশঃ বেড়েছিল। মনে হয়েছিল ফাটকের দিকে কোন গোলমাল হয়েছে। একবার মনে হয়েছিল, উঠে দেখি কি হল। ইচ্ছে করেনি। এখন আর ঝুট ঝামেলা ভাল লাগে না। শুধু এখন কেন, কোনদিনই উৎসাহ বোধ করিনি। হারেমে তো প্রায়ই ঝামেলা লেগে থাকতো। নিত্য দিনের ব্যাপার ছিল সেটা। ঝামেলা বাধাতে হারেমবাসিনীদের উৎসাহের অভাব কোনদিন হয়নি। তাই নিয়ে চলতো আলোচনা, যতক্ষণ না আর একটা নতুন কোন ঝামেলা বাধতো ততোক্ষণ আগেরটার রেশ চলতো।

হারেমে আমাকে নিয়ে কম ঝামেলা হয়নি বা আমি কম ঝামেলা বাঁধাইনি, কিন্তু গোলমাল সুরু হলে, হারেমবাসিনীর দল অংশগ্রহণ করলে ঘটনাস্থলে থাকার আর প্রয়োজন বোধ করিনি। দূরে সরে গেছি। কখনো দূর থেকে মজা উপভোগ করেছি, আবার কখনো মনটা খারাপ হয়ে গেছে। ভেবেছি, ছিঃ ছিঃ একি করেছি, বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে ওই ভাবে তর্ক না করলেই পারতাম। দোষ আমার নেই। তবু আমি যদি সরে আসতাম তাহলে তো এই গোলমালটা বাধতো না। কিন্তু ওই যে, মস্ত দোষ আমার, অন্যায়ভাবে কেউ যদি দোষারোপ করে সহ্য করতে পারিনা, মাথা গরম হয়ে ওঠে, প্রতিবাদ করি।

ছোটবেলায়, যখন জ্ঞান বুদ্ধি হয়নি তখন কম অন্যায় করিনি। কিন্তু একটু বড় হতে, যখন বুঝতে শিখেছি, ভালমন্দের বিচারবোধ এসেছে, তখন থেকেই এড়িয়ে থাকতে চেয়েছি। কিন্তু এমনই বদ নসিব আমার, প্রায়ই ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে গেছি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ যেন জোর করে আমাকে ঝামেলার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে।

বাইরে ফাটকের কাছে চিৎকার চেঁচামেচিটা আরো তীব্র হয়েছিল।* খালেদাকে ডেকেছিলাম। সাড়া মেলেনি। অন্য বাঁদীদের ডেকেছিলাম। কারো সাড়া মেলেনি। কোথায় গেল সব? সকলেই কি ঝামেলা দেখতে জড়ো হয়েছে!

ভাল লাগছে না। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। পাশ ফিরে ঘুমাবার চেষ্টা করেছিলাম। ক্লান্তি অবসাদ।

অনেকক্ষণ পরে পদশব্দ কানে এসেছিল। খালেদা। ওর পদশব্দ বড় পরিচিত আমার।

খালেদা কাছে এসেছিল। কপালে ঠাণ্ডা, খসখসে হাতের স্পর্শ পেয়েছিলাম। আঃ, বড় আরাম। এ যেন আম্মাজানের করস্পর্শ। মুখটা খারাপ হলেও খালেদার অন্তরটা মমতায় ভরা। চোখ মেলে চেয়েছিলাম। খালেদা মুখের কাছে ঝুঁকে আছে। শিউরে বলেছিল, এিক তোমার চোখদুটো যে বড় লাল হয়ে উঠেছে। কষ্ট হচ্ছে?

খালেদার সেই প্রশ্নের মুহূর্তে কষ্টটা যেন অনেক কমে গিয়েছিল। হাসবার চেষ্টা করে বলেছিলাম, হচ্ছিল, কমে গেল।

—হচ্ছিল, কমে গেল? খদ্দে পড়েছিল খালেদা, এ আবার কেমন কথা গো তোমার? তুমি কি ভুল বকছো নাকি?

হেসে বললাম, সত্যি বলছি।

—রাখতো তোমার সত্যি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। বল কি কষ্ট হচ্ছে?

—বিশ্বাস করো, কষ্টটা অনেক কমে গেছে। তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে খালেদা আমার মুখের দিকে চেয়েছিল একটু। নিজের মনেই বলেছিল, গতিক ভাল বুঝছি না। এই রকম আর একবার তুমি আমাকে কম ভোগান ভোগাও নি। দেখি, কাউকে একবার হেকিমের কাছে পাঠাই।

বলেছিলাম, কাউকে পাঠাতে হবে না। জ্বর যখন হয়েছে ভোগ নেবে। কষ্ট হচ্ছে। শরীরে যন্ত্রণা হচ্ছে। দাওয়াই যখন পড়েছে, কমে যাবে। এখন বল, কোথায় ছিলে তুমি? ডেকে-ডেকে কারো সাড়া পেলাম না।

—পাবে কি করে, কেউ কি এ মহল্লায় আছে। সকলে ফাটকের কাছে গুলতানি করছে। আমি রসুইখানায় গিয়েছিলাম। সেখানেই শুনেছি।

বললাম, কি শুনেছো?

খালেদা বলল, মীর ছোঁড়াটা এসে বলল, একটা পাগলী এসে বাইরে খুব ঝামেলা বাঁধিয়েছে। পাহারাদাররা কিছুতেই ভেতরে আসতে দেবে না তাকে। পাগলী শাহাজাদীর সঙ্গে দেখা করবে। সেই নিয়ে ঝামেলা চলছে। পাগলী ফাটকের কাছে বসে পড়েছে। শাহাজাদীর সঙ্গে দেখা করে তবে যাবে। বসে বসে পাহারাদারদের গালিগালাজ করছে। আওরত বলে পাহারাদাররা গায়েও হাত দিতে পারছে না।

জিজ্ঞেস করলাম, পাগলীটাকে দেখেছো?

খালেদা বলল, মীর এসে বলায় একবার দেখে এসেছি। প্রথমটায় চিনতে পারিনি। অনেক বয়স হয়ে গেছে। অনেক চিন্তা করে চিনতে পারলাম। পাগলী

নয়, জাট্টি।

—জাট্টি, কে জাট্টি? প্রশ্ন করলাম খালেদাকে।

খালেদা বলল, জাট্টিকে চিনতে পারলে না। সেই নাজ্জুম (জ্যোতিষী)।

চিনতে পারলাম। যদিও দীর্ঘ অনেকগুলি বছর তাকে দেখিনি। ভুলেই গিয়েছিলাম তার কথা। কিন্তু এক সময় প্রায়ই তাকে দেখা যেত হারেমে। হারেম ছিল তার অবারিত দ্বার। বেগম থেকে বাঁদী পর্যন্ত হাত পাততো ভাগ্য জানবার জন্য।

সকলে তাকে জাট্টি বুড়ি বলে ডাকতো। আমি যখন প্রথম তাকে দেখি সদ্য কিশোরী তখন। শরীরে আমার বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। রোগা আর দুর্বল ছিলাম, তার ওপর বছরের অনেকটা সময় বারবার শয্যাশায়ী হতাম। একটু ঠাণ্ডা লাগলেই প্রচণ্ড সর্দি কাশি হোত। প্রচণ্ড কষ্ট পেতাম সে সময়।

হয়তো ধরা-বাঁধা নিয়ম মানতাম না বলেই ভুগতাম অত। আর তার জন্য খালেদার কাছে কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি আমাকে। আম্মাজান তাঁর অবাধ্য মেয়েটার সব দায়-দায়িত্ব খালেদার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। আমার কিছু হলে তার জন্য আম্মাজানের কাছে বকুনি খেতে হ'ত খালেদাকে। এদৃশ্য আমি লুকিয়ে বহুবার দেখেছি।

আম্মাজান আপশোষ করে বলতেন, কি করিস বলতো খালেদা, একটা বাচ্চাকে তুই সামলাতে পারিস না? নতুন ঠাণ্ডা পড়া সুরু হয়েছে। একটু সামলে রাখবি তো? নিশ্চয়ই খুব জল ঘেটেছে?

খালেদা মৃদু গলায় বলতো, কি করবো লাল, আমার কথা যে শোনে না।

আম্মাজান বলতেন, শাসন করতে পারিস না।

খালেদা দুর্বল কৈফিয়ৎ দিত, শাসন তো করি লাল।

আম্মাজান মুখ টিপে হেসে বলতেন, ছাই শাসন করিস।

খালেদা বলতো, বিশ্বাস করো।

আম্মাজান বলতেন, বিশ্বাস করি বৈকি। তুই যে কি শাসন করিস তা আর জানতে আমার বাকি নেই। ওই তো হাতের ঘা-টা এখনো শুকোয়নি। এই যদি তোর শাসনের নমুনা হয়, মেয়েটা ভুগবে তার সঙ্গে সঙ্গে তুইও ভুগবি। এখন তো খাওয়া ঘুম ভুলে ওর কাছে বসে থাকবি। না-না, অমন করিস নি। তার চেয়ে এক কাজ কর ওকে আমার কাছে দিয়ে যা।

খালেদা বলতো, তাহলেই হয়েছে। তোমার কাছে ও এলে তবে তো?

অবাক হতেন আম্মাজান। বলতেন, কেন, আসবে না কেন? এই তো সকালে ওকে দেখতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কাছে আসবে কি-না। বললে আসবে। তুই ওকে আমার কাছে দিয়ে যা খালেদা। মেয়েটা আমার বড় ভোগে। ওর জন্যে বড় চিন্তা আমার। নিত্য দিন ওর জন্যে আল্লার কাছে দোয়া মাঙ্গি। তিনি ওকে

সুস্থ রাখুন। ওর মাথাটা ঠাণ্ডা করে দিন। খালেদা, ওকে তুই নিয়ে আয়।

খালেদা মুচকি হেসে বলেছিল, লাল তুমি চলে আসার পর কি কাণ্ড করেছে জান ?

আম্মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আবার কি কাণ্ড করলো ?

খালেদা বলেছিল, তুমি চলে আসার পর আমার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে-কেটে একসা। বলে কি, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। কথা দিই, তবে শান্ত হয় মেয়ে। কথা দিয়েছে আর দুষ্টুমি করবে না। এবার থেকে ভাল মেয়ে হবে।

আম্মার মুখে হাসি ফুটতো। বলতেন, খালেদা, দুষ্টু হলেও মনটা ওর বড় ভালরে। তোর ওপর বড় অত্যাচার করে। ওকে যেন ভুল বুঝিসনি কখনো।

আম্মার কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে খালেদা রেগে যেত। গম্ভীর গলায় বলতো, শোন লাল, এতই যখন অবিশ্বাস তোমার মনে, তোমার বেটীকে তুমি নিজের কাছে নিয়ে এসো !

আম্মা বলতেন, এসব কি বলছিস তুই খালেদা, তোকে আবার অবিশ্বাস কখন করলাম ?

—করো বলেই কথাটা বলতে পারলে। তেমনি গম্ভীর গলায় বলতো খালেদা।

বুঝতে পারতেন আম্মাজান। খালেদার একটা হাত ধরে বলতেন, রাগ করিসনি খালেদা। কথাটা আমি সে ভাবে তোকে বলিনি। আর আমি জানি তুই ওকে কত পেয়ার করিস। আর জিজ্ঞেস করছি, রোশনিকে ছেড়ে তুই থাকতে পারবি তো ?

আম্মাজানের এই কথায় খালেদা উত্তর দিতে পারতো না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতো।

আম্মা বলতেন, যা মেয়েটা একলা আছে। আর যা বলছি, এবার একটু শাসন কর ওকে। আদর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু শাসনও করতে হয়।

চুপিচুপি অন্তরাল থেকে সরে যেতাম।

খালেদাই সেই ছোট বয়স থেকে আমার দেখভাল করেছে। আমাকে বড করে তুলেছে। দেরিতে হলেও একদিন আমি ঋতুমতী হয়েছিলাম। লজ্জা, ভয়, বিস্ময়। সেই সঙ্গে যন্ত্রণা। খালেদা সেই সময় স্নেহময়ী মায়ের মত, বন্ধুর মত সান্ত্বনা দিয়েছিল, বুঝিয়েছিল, ভুলিয়ে রেখেছিল। আচ্ছন্ন চেতনায় আমি কটা দিন কিভাবে কাটিয়ে ছিলাম জানিনা। কটা দিন যেন দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে পার হয়েছিল। আহারে রুচি ছিলা না, রাতে ঘুম ছিল না। শুধু যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা। খালেদা দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করেছিল।

কটা দিন পরে সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম। রোগা শরীরটা আরো রোগা হয়ে গিয়েছিল। ক্লান্ত, অবসন্ন। সব সময় একটা অলসতা আমাকে ঘিরেছিল। একটা ঘুম-ঘুম ভাব। মনটাও সেই সঙ্গে বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। সে সময় পরম যত্নে খালেদা আমাকে আগলে রেখেছিল।

পরিবর্তন এসেছিল আমার দেহে, মনে। একটু একটু করে যৌবন তার চিহ্ন এঁকে দিয়ে ছিল দেহে। বদমেজাজী মনটা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় আমি প্রথম দেখি জটি বুড়িকে। প্রৌঢ়ত্বের চিহ্ন আঁকা শরীর। পরনে রঙিন ঘাঘরা। রং বেরংয়ের পাথরের মালা গলায়। একমাথা রূপালী চুল। কাঁধে বিরাট একটা ঝোলা। মুখে হাসি। যেন যাযাবরী!

সময়ে অসময়ে হঠাৎ হঠাৎ চলে আসতো জটি বুড়ি। হারেমে সাড়া পড়ে যেত। সুরু হয়ে যেত ছোটাছুটি। বেগম মহল থেকে বাঁদীরা আসা-যাওয়া সুরু করতো। জটি বুড়ির কানে কানে ফিস্-ফিস্ কথা। জটি গম্ভীর মুখে সকলের কথা শুনতো। ফিক্ করে হেসে মৃদু স্বরে কিছু বলতো বাঁদীকে। আবার কোন বার কোন বাঁদীর সঙ্গে চলে যেত বেগমের মহলে।

তবে প্রতি বারই হারেমে এসে রাবেয়া বেগমের নিচের তলার পশ্চিমের শেষ কক্ষটার এক চিলতে বারান্দায় ঝোলা নামিয়ে বসতো। রাবেয়া বেগম বর্ষীয়সী বিধবা। সম্পর্কে বাদশাহ আকবর শাহের দূর সম্পর্কের বোন হতেন। খসম সিন্ধু প্রদেশে জায়গীরদার ছিলেন। নিঃসন্তান মহিলা। খসম মারা যাবার পর বাদশাহ আকবর শাহের এক বেগম তাঁকে হারেমে নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন রাবেয়া বেগমের আত্মীয়া।

নিচের তলার পশ্চিম দিকের শেষ কক্ষটায় থাকতেন তিনি। বড় সুন্দর আর সৌন্দর্যময়ী রমণী ছিলেন তিনি। হাতীর দাঁতের মত ছিল তাঁর গাত্র বর্ণ। আয়ত দুটি চোখ। একমাথা বকের পালকের মত ধপ-ধপে চুল। পরনে সাদা পোষাক। বয়সের ভারে একটু ন্যুব্জ হয়েছিল দেহ কিন্তু বার্ধক্য তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। আর অটুট ছিল তাঁর দাঁত। কানে একটু কম শুনতেন কিন্তু দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ম। নিজের হাতে তিনি খাদ্য বস্তু তৈরি করে নিতেন। অতি সাধারণ নিরামিষ খাবার। খেতেন দিনান্তে একবার। সমস্ত দিন ধ্যান জপে কাটতো তাঁর।

রাবেয়া বেগমের সঙ্গে আমার যোগাযোগটা দুর্ঘটনাই বলা যায়। বাল্য সীমা শেষ হওয়ার সময় সেটা আমার। দুরন্ত আমি হারেমের অন্ধি সন্ধি চেলে বেড়াতাম। তখন বর্ষাকাল। সেবার প্রচণ্ড বর্ষা নেমেছে। আকাশের মুখ দেখা যাচ্ছে না কদিন। সব সময় কালো মেঘে ঢেকে আছে, আর সেই সঙ্গে অঝোর বর্ষণ। সূর্যকে সেবার অনেক দিন দেখা যায়নি।

খালেদা আমাকে প্রায় নজরবন্দী করে রেখেছে। একটু এধার-ওধার যাবার উপায় ছিলনা। শান্ত শিষ্ট হয়ে তার চোখে চোখেদিন কাটাচ্ছিলাম। সেদিন দ্বিপ্রহরে, কদিন আচরণে বিশ্বাস করে আমাকে একলা রেখে খেতে গিয়েছিল খালেদা। না হলে অন্যদিন খেতে যাবার সময় কোন হারেম রক্ষিণীকে আমার পাহারায় রেখে যায়। সেদিন বলেছিল, কি করবে বল, কাউকে পাহারায় রেখে যাব না একলা থাকবে?

বলেছিলাম, তোমার যা ইচ্ছে হয় করবে।

খালেদা বলেছিল, তোমাকে তো বিশ্বাস নেই। খেতে গিয়ে ফিরে এসে দেখবো কোথায় চলে গেছো।

মুচকি হেসে বলেছিলাম, যা বৃষ্টি হচ্ছে এসময় যাবার মত একটা জায়গাই আছে।

খালেদা হাঁ করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, এখন আবার কোথায় যাবার ইচ্ছে হচ্ছে শুনি?

বলেছিলাম, ইচ্ছে হলেই তো হোল না। তুমি যদি ছাড়তে একবার ঘুরে আসতাম।

—ঘুরে আসতে? খালেদার মুখটা গম্ভীর হয়েছিল, এই বৃষ্টিতে কোথায় ঘুরতে যাবে?

—আগে ছাড়বে কি-না শুনি?

খালেদা বলেছিল, আগে শুনিই না কোথায় ঘুরতে যাবে।

বলেছিলাম, ঠিক ঘুরতে নয়। যা বৃষ্টি, তাতে কদিন খুবই ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যমুনা থেকে একবার সাঁতার কেটে আসি। বৃষ্টির মধ্যে সাঁতার কাটতে খুব ভাল লাগে। যাবে?

খালেদা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলেছিল, ঠাট্টা হচ্ছে?

মুচকি হেসে বলেছিলাম, ছিঃ, একি বলছো, তুমি গুরুজন, তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে পারি?

খালেদা ধমক দিয়ে বলেছিল, থাক। তুমি শুয়ে থাক। আমি দুটো খেয়ে আসি।

বলেছিলাম, একা রেখে যেওনা। পালিয়ে যাব।

খালেদা কোন কথা না বলে চলে গিয়েছিল। একটু অপেক্ষা করেছিলাম। তার পরই বেরিয়ে পরেছিলাম কক্ষ ছেড়ে। মুক্তি পেয়েছিলাম কদিন পরে। ঘুরে বেরিয়ে ছিলাম চারিদিকে। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। সেই সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলকানি। বৃষ্টির ঘ্রাণ নিয়েছিলাম বুক ভরে। ঘুরতে ঘুরতে নিচের তলার দক্ষিণ প্রান্তের শেষ ঘরখানির সামনে খেয়াল বশত এক সময় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এধারটায় খুব বেশি একটা আসিনি। না আসার কারণ এধারটা প্রায় ফাঁকাই পড়ে আছে। দুচার জন থাকলেও থাকতে পারেন। কৌতুহল জাগেনি খুব একটা ঘুরে দেখার। তাছাড়া এই দক্ষিণ দিকটাই মহলের শেষ। অন্যদিকে যাওয়া যায়না। এদিকে এলে আবার ঘুরে ফিরে যেতে হয়। সেই জন্যই এদিকটায় বড় একটা আসতাম না।

সেদিন খেয়াল বশতঃ দক্ষিণ প্রান্তের শেষ কক্ষটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আকাশ অন্ধকার। বৃষ্টিটা একটু কম। সরু একফালি বারান্দায়

ছায়া-ছায়া অন্ধকার। কক্ষটার ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে এক ফালি আলো এসে পড়েছিল বারান্দায়।

মুহূর্তে কৌতূহল জেগেছিল মনে। দরোজার কাছে গিয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করেছিলাম। কিছুই দেখা যায়নি। একটু চিন্তা করেছিলাম দাঁড়িয়ে। তার পর পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়েছিলাম গবাক্ষের কাছে। সেখান থেকে লক্ষ্য করেছিলাম কক্ষের মধ্যে। একটু একটু করে স্পষ্ট হয়েছিল ভেতরটা। মাঝারি আয়তনের অতি সাধারণ কক্ষটি। ভেতরে আসবাব বলতে একটি ছোট খাট। একদিকে একটি আলনা। তাতে কিছু সাদা পোষাক। একটি ছোট চৌকি। অন্যদিকে নিত্য ব্যবহায কিছু জিনিসপত্র। তারই পাশে সাদা পোষাক পরিহিতা এক মহিলা খেতে বসেছেন। মহিলা গবাক্ষের দিকে পিছন ফিরে বসে খাচ্ছিলেন। দেখে মনে হল খুবই ধীরে ধীরে তিনি আহার গ্রহণ করছেন।

কি ঘটেছিল ঠিক বুঝতে পারিনি। সশব্দে গবাক্ষের একটা পাল্লা খুলে পড়ে গিয়েছিল কক্ষের মধ্যে। ঘটনার আকস্মিকতায় সমস্ত শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল আমার। পরক্ষণেই লাফিয়ে পালাতে গিয়েছিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে পিছলে আছাড় খেয়েছিলাম। সামান্য পরে কেউ আমাকে তুলে ধরেছিলেন। নিয়ে গিয়েছিলেন কক্ষের মধ্যে। আমি একটি কথাও বলতে পারিনি।

আমার শরীর জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। তিনি শুকনো বস্ত্র দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে তাঁর বিছানায় বসিয়ে প্রথম প্রশ্ন করেছিলেন, কোথায় লেগেছে বল?

বলেছিলাম, আমার লাগেনি।

— সত্যি বলছো তো ?

ঘাড় নেড়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, যদি সত্যি লেগে থাকে তাহলে কিন্তু গিয়ে বোল। ইস্, পোষাক দেখছি ভিজে গেছে। যাও-যাও, গিয়ে পোষাক পাল্টে নাও।

তিনি তাঁর আহারের স্থানে গিয়ে থালি তুলে নিয়েছিলেন হাতে। চলে আসবার আগে দেখেছিলাম সেটা তিনি একধারে নামিয়ে রাখলেন।

ফিরে এসে ধরা পড়েছিলাম খালেদার কাছে। বকুনি খেয়েছিলাম। কিন্তু একটা কথাও বলিনি। আমার চোখের সামনে শুধু অভুক্তা বর্ষিয়সী মহিলার সুন্দর মুখখানি বার বার ফুটে উঠেছিল। একটা অপরাধ বোধে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল মনটা।

দু একদিন পরে বৃষ্টি থেমে ছিল। রোদ উঠেছিল। শিথিল হয়েছিল খালেদার শাসন। কদিন পরে অপরাধিনী আমি পায়ে-পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। দরোজা পূর্বদিনের মতই ভেজানো। কি করবো বুঝতে পারিনি। এক সময় ডাক শুনে-ছিলাম, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে এসো।

অবাক হয়েছিলাম কথাগুলো শুনে। গা-টা একটু ছম্-ছম্ করে উঠেছিল।

চিন্তা করে উঠতে পারিনি আমার উপস্থিতি তিনি বুঝলেন কেমন করে ? তবু সাহসে ভর করে ভেতরে প্রবেশ করেছিলাম ।

তিনি ছোট্ট চৌকিটায় জপের মালা হাতে বসেছিলেন। আমার আড়ষ্ট ভঙ্গি দেখে হেসে বলেছিলেন, খুব অবাক হয়ে গেছো বলে মনে হচ্ছে, তাই না ?

আমি উত্তরে কোন কথা বলতে পারিনি।

তিনি তেমনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, হয়তো ভাবছো, আমি বোধ হয় ভেলকি জানি। না গো মেয়ে, আমি কিছুই জানি না। কদিনই মনে হচ্ছিল তুমি একবার ঠিক আমার কাছে আসবে। খানিক আগে দেখলাম তুমি বাইরে ঘোরাফেরা করছো। মনে হল সংকোচে আসতে পারছো না। দরোজাটা এমনভাবে বন্ধ করলাম যাতে কেউ এসে দাঁড়ালে ভেতর থেকে আমি যেন তাকে দেখতে পাই। তুমি এসে দাঁড়াবা মাত্র দেখে ভেতরে ডেকেছি! এখন বল, তোমার সেদিন সত্যই লাগেনি তো ?

বলেছিলাম, বিশ্বাস করুন, সেদিন আমার সত্যই লাগেনি। লেকিন, আমার জন্য সেদিন আপনার খাওয়া হয়নি।

হেসে তিনি বলেছিলেন, তার জন্য দুঃখ কোর না, একদিন না খেলে কোন ক্ষতি হয় না। এখন বল, তোমার নাম কি ?

নিজের নাম বলেছিলাম আমি। নাম শুনে বিস্ময়ে তিনি অনেকক্ষণ আমাকে দেখেছিলেন। তারপর হেসে বলেছিলেন, ওঃ তুমিই তাহলে রোশেনারা। তোমার নাম অনেক শুনেছি! দেখবার ইচ্ছা ছিল। দেখা হয়ে গেল। এখন শয্যার ওপর বসো। আমি রাবেয়া বেগম। সিন্ধু প্রদেশের এক জায়গীরদারের বিবি ছিলাম।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমার নাম কোথায় শুনলেন আপনি ?

হেসে তিনি বলেছিলেন, শুনেছি অনেকের কাছে। লেকিন, যা শুনেছি, তেমন তো তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে না। শুধু তোমার সুন্দর কালো চোখ দুটি কিছুটা সাক্ষ্য দিচ্ছে।

তাঁর কথা ঠিক বুঝিনি সেদিন। কিন্তু রাবেয়া বেগমকে বড় ভাল লেগেছিল আমার। স্নিগ্ধ মধুর ব্যবহার। আশ্চর্য সুন্দর হাসিটি। সেই আমার যাওয়া সুরু হয়েছিল তাঁর কাছে। প্রায়ই যেতাম। কোন কারণে যদি মনটা খারাপ হয়ে যেত চলে যেতাম। আর আশ্চর্য, তিনি যেন মনের কথা পড়তে পারতেন। দেখেই বলতেন, কি হল, মন খারাপ হল কেন ?

বলতাম, জিউ (মহাশয়া) আপনি এমনভাবে মনের কথা বুঝতে পারেন কি করে ?

উত্তর না দিয়ে তিনি হাসতেন।

অভিমানে ঠোঁট ফোলাতাম। বললাম, ঠিক আছে, না বলবেন, না বলবেন।

হাসতেন তিনি। হাসতে হাসতে গালটা টিপে দিয়ে বলতেন, পাগলী বেটী আমার। কথায় কথায় এত রাগ, এত অভিমান করলে কি চলে। এখন বল কি

হয়েছে, মন খারাপ কেন ?

বলতাম, আগে বলুন, কি করে বুঝলেন মন খারাপ।

হাসতেন তিনি। হাসতে হাসতেই বলতেন, এই কথা। এতো খুবই সোজা ব্যাপার। মুখ হল মনের আয়না। সেই আয়নার তসবির শুধু পড়তে পারা চাই।

বলতাম, সকলের মুখ দেখে মনের কথা পড়া যায় ?

—জরুর। গম্ভীর হতে গিয়েও তিনি হেসে ফেলতেন। বলতেন, বেটী শুধু ছবিটা দেখা শেখা চাই।

—আপনি শিখলেন কি করে ?

—উমর আমাকে শিখিয়েছে। নসিব আমাকে শিখতে বাধ্য করিয়েছে। বলতে বলতে কণ্ঠস্বর ম্লান হয়ে যেত তাঁর। বলতেন, ওসব কথা থাক। এসো গল্প করি।

রাবেয়া বেগমকে ভাল লাগতো। ছুটে যেতাম সময়ে অসময়ে। সব সময় হাসিখুশি। বয়সের ভারে ঈষৎ ন্যুব্জ দেহ। সতেজ কণ্ঠস্বর। গুনগুন করে গান গাইতেন। গল্প করতেন। আবার কখনো কখনো কেমন যেন ম্লান উদাস হয়ে যেতেন। সে সময় তাঁকে অপরিচিতা বলে মনে হ'ত।

খালেদা মাঝে মাঝে বলতো, ওই বুড়িটার কাছে যাও কেন ?

বলতাম, আমার ভাল লাগে বলে যাই।

—না গেলে কি পার না ?

বলতাম, যেদিন ভাল লাগবে না, সেদিন আর যাব না।

খালেদা বলতো, না গেলেই ভাল করতে।

খালেদার কথা শুনিনি। যেতাম। আর যেতাম বলেই জট্টি বুড়ির দেখা পেয়েছিলাম। জট্টি হারেমে এসে দক্ষিণের শেষ প্রান্তের রাবেয়া বেগমের কক্ষের সামনে ছোট্ট বারান্দায় বসে পড়ে হাঁক দিত, কই গো বেগম সাহেবা, আমি এসেছি।

রাবেয়া বেগম ভেতরে থাকলে সাড়া দিতেন। জট্টি কখনো রাবেয়া বেগমকে সালাম জানাতেন, কখনো বলতো, নমস্তে বেগম সাহেবা। তাই জট্টি মুসলমান, না হিন্দু বুঝতে পারতাম না। রাবেয়া বেগমকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আমি জানি না। আমার পাশে একজন ছিল, তার কাছেই আসতো জট্টি। সে মারা যাবার পর আমার কাছে আসে। যেবার সকাল সকাল আসে দুপুরে আমার কাছে দুটো চাপাটি, একটু ভাজি খায়।

আর জট্টির আসবারও কোন ঠিক ছিল না। কখনো এক মাসে দুবার এল। আবার কখনো দুচার মাস পরে এল। আর প্রতি বারেই যে আমার সঙ্গে দেখা হ'ত তাও নয়। কখনো-সখনো দেখা হয়ে যেত। তবে কখনো আমি হাত দেখাইনি। সেই বয়সে ওসব ব্যাপারে আমার কোন কৌতূহলও ছিল না। তবে জট্টির সাজ পোষাক, ভাবভঙ্গি দেখতাম। দেখতাম জট্টিকে নিয়ে টানাটানি।

কখনো দেখতাম বাঁদীরা ঘিরে ধরেছে তাকে। জট্টি সেদিন এসেই বলেছে, সেদিন

সে প্রথমে তাদের ভাগ্য গণনা করবে। বাঁদীর দলে হুড়োহুড়ি লেগে যেত, কে আগে জায়গা পাবে।

একদিনের কথা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন রাবেয়া বেগমের কাছে ছিলাম। জটি এল। দুদিন আগেও নাকি এসেছিল সে। যাবার সময় বলে গিয়েছিল এদিনে আসার কথা। আসার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে বাঁদীরা লাইন দিয়েছিল। কক্ষের মধ্যে থেকে দেখেছিলাম। একজন করে আসছে, দুচার কথা বলছে। কাউকে-কাউকে ঝোলা থেকে বার করে তাবিজ বা পাথর দিচ্ছে। এক সময় একজন যুবতী বয়েসী বাঁদী এসে বসেছিল জটির সামনে। জটি তার হাত দেখেছিল। লক্ষ্য করেছিলাম হাত দেখতে দেখতে তার মুখের ভাব পরিবর্তন। তারপর বলেছিল, বল বেটী কি জানতে চাস?

বাঁদী বলেছিল, আমার হাতে কি দেখলে তুমি?

জটি গম্ভীর মুখে উত্তর দিয়েছিল, দেখলাম তো অনেক কিছুই। তুই তো মনে মনে অনেক কিছুই চাস, তাই না?

চাই। উত্তর দিয়েছিল বাঁদী। বলেছিল, আমার চাওয়াটা কি অন্যায়?

—সে বিচার তুই করবি। নসিবে লেখা থাকলে বাঁদীও বেগম বনতে পারে। তুই বেগম হতে পারবি কিনা সেটাই জানতে চাইছিস? আমি বলি কি, ওসব চিন্তা ছেড়ে দে। দিমাগ খারাপ করিসনি।

বাঁদী বলেছিল, জরুর আমি বেগম বনবো।

এমন জোরে কথাটা সে বলেছিল উপস্থিত বাঁদীরা হি-হি খিল খিল করে হেসে উঠেছিল। সুরু হয়েছিল চিৎকার, চেঁচামেচি। জটিকে মারতে গিয়েছিল বাঁদী। সকলে জোর করে তাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। শুনেছি, তার কিছুদিনের মধ্যেই বাঁদীটির মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছিল।

আর একবার এক আশ্রিতা বিধবা জটিকে প্রশ্ন করেছিল, তার সাদী হবে কবে?

—সাদী! চোখ কপালে তুলেছিল জটি, এই উমোরে সাদী?

—জরুর। বিধবা উত্তর দিয়েছিল, আমাকে জবান দিয়েছে।

—কৌন জবান দিয়া আপকো? জানতে চেয়েছিল জটি।

– উজির! বলেছিল বিধবা। সাদী হতে কতদিন দেরি হবে সেটাই তোমার কাছে জানতে চাইছি।

চিন্তা করেছিল জটি। হাতটা ভাল করে দেখেছিল আবার। বলেছিল, কুছ দের হোগা।

—কতদিন?

তেমনি গম্ভীর ভাবেই জটি উত্তরে বলেছিল, ঔর দো-চার সাল।

—দো-চার সাল?

—জী হাঁ। জটি বলেছিল, যাতে জলদি হয়, পরে যখন আসবো একটা তাবিজ

বানিয়ে নিয়ে আসবো।

শুনে খুশি হয়ে বিধবা জট্টিকে ভাল বক্‌শিশ দিয়েছিল। জট্টি নিতে চায়নি। দেখেছি অর্থের ওপর জট্টির লোভ ছিল না। কেউ কিছু দিলে নিত, না দিলে চাইতো না। শুনেছি হারেমের অনেকেই অনেক কিছু দিতেন জট্টিকে। যাবার সময় জট্টি তার অনেক কিছুই বিলিয়ে দিয়ে যেত।

বিধবার সাদীর ব্যাপারটায় কৌতূহল জেগেছিল। অনেক চিন্তা করে বলবনকে ধরেছিলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই বলবন খবর এনেছিল। ফাজিল বাঁদীদের কাণ্ড। বিধবার কাছ থেকে বক্‌শিশের লোভে কল্পনার উজীর তারাই সৃষ্টি করেছিল।

দিন পার হয়েছিল। কেটেছিল সাল। তারও অনেক পরের কথা। তখন বোধ হয় মহরমের মাস চলছে। প্রচণ্ড গরম, সকালের সূর্য ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তাপ বাড়ে। একটু বেলা হলেই লু বইতে থাকে। পথে একটিও মানুষ দেখা যায় না। কুকুরগুলোও বাইরে বেরুতে ভয় পায়। সেদিন সেই অসহ্য দাবদাহের মধ্যেই খোলা আকাশের নিচে বেরিয়ে পড়েছিলাম। রোদে ঝলসে গিয়েছিল চোখমুখ। বুকটা ভারী হয়ে উঠেছিল। একটা অসহ্য জ্বালা-জ্বালা ভাব। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়েছিল। তবু প্রচণ্ড জেদের বশে বেরিয়েছিলাম। বিশাল চত্বরে একটা আমগাছের নিচে গোল করে ঘেরা একটা বেদী দেখতে পেয়ে তার ওপর গিয়ে বসে পড়েছিলাম। বসার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠেছিলাম। আমার নিতম্ব যেন পুড়ে গিয়েছিল। উঠিনি। পুড়ুক। দাঁতে দাঁত চেপে বসে থেকেছিলাম।

সেদিনের সেই অসহ্য গরম আর রোদের মধ্যে বাইরে বেরোনোয় একটা বাঁদী আমার মাথাটা গরম করে দিয়েছিল। যদিও কাজিয়া হচ্ছিল তার সঙ্গে খালেদার। জড়িয়ে পড়েছিলাম আমি। খালেদা তাকে সেই গরমের মধ্যে কোথাও পাঠাচ্ছিল। সেই প্রচণ্ড রোদের মধ্যে বাইরে যেতে অস্বীকার করেছিল সে। তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি। খালেদা আম্মাজানের প্রিয় বাঁদী শুধু নয় বন্ধুর মত ছিল। আম্মাজান যখন বেঁচেছিলেন তাঁর কথার ওপর কথা বলার সাহস কারো ছিল না। বাঁদীরা তার কথাকে বেগম সাহেবার হুকুম বলেই মনে করতো। আম্মাজান চলে গেছেন, তার প্রতাপ কিন্তু খুব একটা কমেনি.। সেটাই হয়তো অন্য বাঁদীদের ঈর্ষার প্রধান কারণ ছিল। মুখের ওপর কেউ কিছু না বললেও আড়ালে তাকে নিয়ে বাঁদীর দল নানান সমালোচনা করতো। আমার কানে এসেছে সেসব।

খালেদার দাপট ছিল কিন্তু দল ছিল না। বাঁদীদের নিয়ে কোনদিন দল গড়া বা নোংরামীর মধ্যে খালেদা যায় নি। তেমন মানসিকতাও তার তৈরি হয়নি। ছোটবেলা থেকে আম্মাজানের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল সে। এমন কথাও শুনেছি, আম্মাজান ছোটবেলায় তাকে নিয়ে এক বিছানায় শয়ন পর্যন্ত করতেন। আম্মাজান ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান। আম্মাজানের এতটুকু কষ্টকে সহ্য করতে পারতো না। আম্মাজানের সমস্ত সত্ত্বার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিল সে।

বহুবার সে সব গল্প শুনেছি। আম্মাজানের মৃত্যুর পর তাঁর কথা উঠলেই সব কর্তব্য কর্ম ভুলে যেত খালেদা। শুধু আম্মাজানের কথা। একদিন কথায় বলেছিলাম, আচ্ছা খালেদা একটা কথা বলবো?

খালেদার মন-মেজাজ সেদিন খুবই ভাল ছিল, বলেছিল, কি কথা গো? তোমার কথা যেন আর ফুরোয় না।

বলেছিলাম, আমার কথাটা প্রায়ই মনে হয়, ভাবি জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, লেকিন জিজ্ঞাসা করতে পারি না।

—কেন, জিজ্ঞাসা করতে পার না কেন?

—পারি না এই জন্যে, শুনে যদি রাগ করো তুমি।

—রাগ! হেসেছিল খালেদা, বলেছিল, সকলে শুধু আমার রাগটাই দেখে। রেগে আমি যাই ঠিকই, কিন্তু অন্যায় রাগ আমি করি না।

—না, তা করো না। বলেছিলাম, আর মাথা গরম যে হয় তোমার তাতে মাথার দোষটা কোথায়? সেই রাত ভোর হওয়া থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত কম ধকল যায় শরীরটায় ওপর দিয়ে।

শুনে খুশি হয়েছিল খালেদা। বলেছিল, কি যেন বলবে বলছিলে?

বলেছিলাম, না থাক। শুনে হয়তো মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে তোমার।

খালেদা একটু চেয়ে দেখেছিল আমাকে, বলেছিল, কি এমন কথা যা শুনলে মেজাজ বিগড়ে যাবে?

বলেছিলাম, কথাটা এমন কিছুই নয়। তুমিই বল, আম্মাজান খুবই পেয়ার করতেন তোমাকে। সামান্য জিনিস হলেও তোমাকে না দিয়ে খেতেন না। তোমার তবিয়ত খারাপ হলে অস্থির হতেন।

শুনে গম্ভীর ভাবে খালেদা বলেছিল, একটাও ঝুট বাত বলনি।

—আমিও সে কথা বলছি না। বলেছিলাম, সাদীর পর তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। কেন, তোমার কি সাদী দিয়ে দিতে পারতেন না।

—সাদী! উদাস হয়েছিল খালেদা। মৃদু স্বরে বলেছিল, সে চেষ্টাও লাল করেছিল।

মনে মনে চমকে ছিলাম। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম খালেদার মুখের দিকে।

খালেদা একটু লজ্জা পেয়েছিল যেন। একটু দ্বিধা করেছিল। মৃদু গলায় বলেছিল, সাদীও হয়তো হয়ে যেত আমার।

জানতে চেয়েছিলাম, হল না কেন? কার সঙ্গে সাদী হত তোমার?

লজ্জিত কণ্ঠে খালেদা বলেছিল, ওসব কথা থাক লায়লা। শুনলে হাসি পাবে তোমার।

খালেদার একটা হাত চেপে ধরে অনুনয়ের কণ্ঠে বলেছিলাম, বল না। বিশ্বাস করো। আমার হাসি পাবে না। আমার জানতে খুব ইচ্ছা করে। কত ভাবি।

আম্মাজান তোমাকে কত পেয়ার করতেন, লেকিন, তোমার সাদী কেন দিলেন না।

—না-না, লালের কোন দোষ নেই। সে বেহস্তে গেছে, তার বদনাম করবো না। অনেক চেষ্টা সে করেছিল। তোমার নানা খুবই দিলদার আদমী ছিলেন। আমাকে পেয়ার করতেন তিনিও। শুধু তিনি নন, তোমার নানার বাড়ির সকলেই আমাকে খুবই পছন্দ করতেন। কারণ, কোন কাজকেই আমি ভয় পেতাম না। দিন-রাত্রি খাটতুম। সকলেই প্রায় আমার সাদীতে রাজি ছিলেন।

—তাহলে সাদীটা হল না কেন?

—সাদী আমিই করতে রাজি হলাম না।

—কেন, সাদী করতে রাজী হলে না কেন?

খালেদা বলেছিল, সে অনেক কথা। এখনও মনে পড়লে আমার মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। ইবলিশটা যদি পালিয়ে না যেত ঠিক আমি খতম করে দিতাম।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, কাকে খতম করতে তুমি?

একটু একটু করে সব কথাই বলেছিল খালেদা। দেখতে কুৎসিত হলেও ভরন্ত বয়েস সেটা। রোগা শরীরটায় যৌবনের ঢল নেমেছে। নুরজাহানের চেষ্টায় বাদশাহ জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খুরমের সঙ্গে আর্জুমন্দবানু বেগমের সাদীর কথাবার্তা চলছে। সেই সময় নানা আসফ খাঁয়ের আস্তাবলের এক সহিস ছোকরা নাসির খালেদাকে দেখে পছন্দ করেছিল। কথাটা কানাকানি হয়ে পেঁছে গিয়েছিল অন্দর মহল পর্যন্ত। শুনে সব চেয়ে খুশি আম্মাজান। আনন্দের শেষ ছিল না তাঁর। আব্বাজানের আদরিণী কন্যা। বাধ্য হয়ে আসফ খাঁকে কথা বলতে হয়েছিল নাসিরের সঙ্গে। পাকা হয়েছিল কথা। ঠিক হয়েছিল আম্মাজানের সাদীর পর খালেদা আর নাসিরের সাদী হবে।

খালেদা প্রথমটায় গররাজি হলেও শেষে আম্মাজানের কথায় রাজি হয়েছিল। লুকিয়ে চুরিয়ে দু-চারবার নাসিরকে দেখেও ছিল খালেদা। তাগড়া যোয়ান মরদ। ভাল লেগেছিল খালেদার। বুক কেঁপে ছিল দুরু-দুরু।

তখন শীতের শেষ প্রায়। সকাল সকাল সন্ধ্যা হয়। আবছা অন্ধকারে ভরে যায় চারিদিক। সেদিন কি একটা কাজে সন্ধ্যার সময় আস্তাবলের দিকে যেতে হয়েছিল খালেদাকে। কাজ মিটিয়ে ফিরছে, দেখে সামনে নাসির। লজ্জায় খালেদার শরীর কেঁপে উঠেছিল।

নাসির হেসেছিল। ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল, আমাকে সাদী করতে রাজি তো?

খালেদা কোন উত্তর দিতে পারেনি।

নাসির বলেছিল, কি হল কথা বলছো না যে?

খালেদা চুপ করেই ছিল। বুকের মধ্যে আওয়াজ হচ্ছিল। ইচ্ছা করছিল ছুটে পালিয়ে যায়। পারেনি।

নাসির ডেকেছিল, খালেদা।

খালেদা সাড়া দিয়েছিল, উঁ।

—আমি তোমাকে পেয়ার করি খালেদা।

খালেদা যেন সচেতন হয়েছিল। বলেছিল, আমি দেখতে ভাল নই। কালো, রোগা, দাঁত উঁচু।

নাসির বলেছিল, তাতে কি? পেয়ার কি শুধু সুরত দেখে?

—তব?

নাসির হাত ধরেছিল খালেদার। ধরার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যেটা কেঁপে উঠেছিল। নাসির বলেছিল, তোমার জন্যে আমি পাগল হয়ে গেছি। দিন-রাত শুধু তোমার কথা ভাবি। নিদ্ আসে না চোখে। কবে তোমাকে আমি নিজের করে পাব খালেদা? তোমাকে না পেলে আমি বাঁচবো না।

বলতে বলতে তাকে বুকে টেনে নিয়েছিল নাসির। সেই নির্জন অন্ধকারে তার চোখে-মুখে সোহাগ চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। খালেদার যেন কি হয়েছিল। লজ্জায় ভয়ে তার দেহ অবশ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। বাধা দিতে পারেনি। এক সময় নাসির তার হালকা দেহটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে গাঢ় অন্ধকারে সরে গিয়েছিল। তার শরীরটাকে পিষ্ট করেছিল। খালেদা দুরন্ত পৌরুষকে বাধা দিতে পারেনি। ঘটনার আকস্মিকতায় তার বাহ্যজ্ঞান যেন রহিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সর্বনাশের চরম মুহূর্তে সে যেন সম্বিত ফিরে পেয়েছিল। চিৎকার করে উঠেছিল, না।

হতচকিত হয়েছিল নাসির। বলেছিল, না কেন খালেদা।

খালেদা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, ইবলিশ।

নাসির বলেছিল, তুমি আমার বিবি হবে খালেদা।

—না, বিবি আমি হবো না। শয়তান। শরীরে পোশাক পরে নিয়েছিল খালেদা।

নাসির বলেছিল, বেশ, বিবি তোকে হতে হবে না। তবে রেহাই তোকে দেব না। দেখি ইজ্জৎ কি করে বাঁচাস আজ।

অন্ধকারেই এগিয়ে এসেছিল নাসির কিন্তু খালেদাকে সে চিনতো না। আঘাত করেছিল খালেদা। নাসির সে আঘাত সহ্য করতে না পেরে পড়ে গিয়েছিল। খালেদা বলেছিল, আজ তোকে ছেড়ে দিচ্ছি। যদি এখান থেকে না চলে যাস তাহলে তোর জান আমি খতম করে দেব।

চলে এসেছিল খালেদা। কদিন পরে নাসিরকে আর দেখা যায় নি। কাউকে কিছু না বলে নোকরী ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে। তারপর আম্মাজানের সাদী হয়েছিল। সঙ্গে এসেছিল খালেদা। আম্মাজান নেই। খালেদা আছে।

১৫

খালেদা বড় এক রোখা। খালেদার বড় মুখ। খালেদা কাজে ফাঁকি বরদাস্ত করতে পারে না। সেইজন্য খালেদাকে অনেক বাঁদীই সহ্য করতে পারে না। আম্মাজান মারা যাওয়ার পর বাঁদীরা দল বেঁধেছিল। শুনেছি তার বিরুদ্ধে জাহানারার কাছে অভিযোগও নাকি জানিয়েছিল। জাহানারা বাঁদীদের কোন অভিযোগই শুনতে চায়নি। খালেদা যেমন ছিল তেমনি আছে।

তবে খালেদার অনেক গুণও আছে। কোন দিন কারো নামে কোন অভিযোগ করেনি খালেদা। দায় আপদ বিপদে সব কিছু ভুলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যে বাঁদীটার সঙ্গে সেই গ্রীষ্মের দুপুরে ঝামেলা হয়েছিল, কিছুদিন আগে বাঁদীটা প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সে সময় খালেদা তার জন্যে অনেক করেছে।

কিন্তু মানুষের ধর্মই এই। উপকারীর উপকার ভুলে যেতে দেরি করে না। সেদিন খালেদা ওঁর উপর প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল। বলেছিল, তোকে কাজটা করতেই হবে।

সে জবাব দিয়েছিল, নবাবজাদী এই রোদ্দুরে তুমি গিয়ে করে এসো না কাজটা।

দূরে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। আর সহ্য করতে পারিনি। এগিয়ে গিয়ে বলেছিলাম, এত চিৎকার কেন? কাজটা কি?

সকলে চুপ করে গিয়েছিল। কেউ কোন কথা বলেনি। দেখে বলেছিলাম, কি হল, সকলে চুপ করে রইলে কেন?

খালেদা বলেছিল। জাহানারার একটা জিনিস বেগম মহলে পৌঁছে দিতে হবে। বেগম মহল অন্য প্রান্তে। মাঝে অনেকখানি ফাঁকা প্রান্তর। গ্রীষ্মের দুপুরে আগুন ঝরছে সেখানে। বলেছিলাম, খালেদা নবাবজাদী নয়, বাদশাজাদী আমি। রোদ্দুরে বেরুলে কষ্ট নিশ্চয়ই হয়। লেকিন, এই রোদ্দুরে পেটের দায়ে বহু মানুষকেই তো খোলা আকাশের নিচে কাজ করতে হয়। আমি একটু খোলা আকাশের নিচে থেকে ঘুরে আসি। তারপর কাজটা কেউ করে এসো।

খালেদা বাধা দেবার আগেই নিচে নেমেছিলাম। খুব কষ্ট হয়েছিল। এক সময় আম গাছের নিচে বেদীটার ওপর বসেছিলাম। আর আশ্চর্য ব্যাপার কিছুক্ষণ বসে থাকার পর কষ্ট হলেও অসহ্য বোধটা একটু-একটু করে কমে এসেছিল। আর সেই সময় দেখতে পেয়েছিলাম জটিকে। মাথায় ঢাকা দিয়েছে সে। এগিয়ে চলেছে বেগম মহলের দিকে।

আমাকে দেখতে পেয়েছিল সে। কাছে এসেছিল। দুচোখে তার বিস্ময়। বলল, একি শাহাজাদী এই রোদ্দুরে এখানে বসে কেন? উত্তাপে শরীর খারাপ

করবে যে ?

বললাম, এই রোদ্দুরে তুমি কোথায় চলেছো ?

—যাচ্ছিলাম তো বেগম মহলে। জট্টি আমার পাশে বসে পড়ে বলল, শোন শাহাজাদী, এর পর থেকে যদি কখনো রোদ্দুরে বেরোও শরীর আমার মত ভাল করে ঢেকে নেবে। বিশেষ করে মাথায় চাপা দেবে।

বললাম, মনে থাকবে তোমার কথা।

জট্টি বলল, তুমি কি রাগ করে এই সর্বনাশা রোদে বসে আছো ?

বললাম, রাগ করে নয়, জেদ করে।

হাসল জট্টি। বলল, ওই জিনিসটা তোমার একটু বেশি। এইজন্যই তোমাকে সকলে ভুল বোঝে। তবে তোমার মনটা বড় নরম। বড় ঠগবে গো তুমি জিন্দেগীতে।

বললাম, তুমি তো নাজ্জুম। আমার হাতটা একবার দেখবে নাকি ?

কথাটা শুনে অনেকক্ষণ হাসল জট্টি। বলল, বড় ভাল কথা বলছো তুমি। এই তো হাত দেখার প্রকৃত সময়। তবে তোমার হাত আমি অনেক আগেই দেখে নিয়েছি।

অবাক হয়ে বললাম, আমি তো তোমাকে কখনো হাত দেখিয়েছি বলে মনে পড়ে না ?

জট্টি হাসতে হাসতে বলল, দেখালেই কি দেখা হয় ? দেখে নিতে হয়। সেই-ভাবেই দেখেছি। শোন মেয়ে, যেমন দিন রাত্রি, আলো অন্ধকার, সুখ দুঃখ, তেমনি জীবনে উত্থান এবং পতন। কোনটাই চিরস্থায়ী নয়। সুখের দিন বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়, দুঃখের রাত্রি কাটতে আর চায় না। আমার কথা বুঝতে পারছো ?

বললাম, না বুঝতে পারার কি আছে।

—ঠিক কথা। হাসল জট্টি। বলল, জীবন বড় বিচিত্র, জীবনের গতি প্রকৃতি বোঝবার চেষ্টা কোর। তোমার চেহারায় মরুভূমির রুক্ষতা, লেকিন অন্তরে তোমার ফল্গুর ধারা। মেয়ে, মনটা বড় নরম তোমার। চিন্তা-ভাবনা করে কাজ কোর। ভালবাসার বড় কাঙাল তুমি। অতি বড় আপনজনের কাছ থেকে আঘাত এলেও ভেঙ্গে পড়ো না। তবে···

তাকালাম জট্টির দিকে।

জট্টি আমাকে দেখল। বলল, একটা কথা বলে যাই। একজন তোমাকে ঠকাবে না। একজনের জীবনে তুমি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

—কে-সে ?

—আমি জানি না।

—কতদিনে ঘটবে সেই চিরস্মরণীয় ঘটনা ?

—জীবনের শেষ পাদে।

শুনে হেসে ফেললাম। বললাম, তখন নিশ্চয়ই তোমার মত উমর হয়ে যাবে

আমার ?

জাট্টি কথা না বলে হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে রইলো।

বললাম, দেখো, তুমি যা বললে মনে রাখার চেষ্টা করবো। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, ধরো তুমি যা বলে যাচ্ছ, তার কিছুই যদি না ঘটে তখন তোমাকে পাব কোথায় ?

জাট্টি বলল, দেখ, আমি যা দেখেছি তাই বললাম। বিশ্বাস করা না করা, তোমার ইচ্ছে। তবে আমি যা বললাম তা তোমার জীবনে ঘটবেই। আর…একটু চিন্তা করে সে বলল, তোমার সঙ্গে আমি সেদিন দেখা করবো।

বললাম, সেদিন আমাকে কোথায় পাবে ?

কথাটা শুনে হাসল সে। বলল, ঠিক খুঁজে বার করে নেব।

প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বললাম, আচ্ছা তুমি হিন্দু না মুসলমান ?

জাট্টি উত্তর দিল, আমি নাজ্জুম (জ্যোতিষী)।

জাট্টি তার কথা রেখেছে। জাট্টি এসেছে। দীর্ঘ অনেকগুলি বছর তাকে দেখা যায়নি। কোথায় ছিল জানি না। কথা দিয়ে গিয়েছিল বলেই সে দেখা করতে এসেছে ? সে এসেছে কিন্তু আমি তার কাছে যেতে পারবো না, বা তাকে কাছে ডাকতে পারবো না। সে অধিকার আজ আর আমার নেই। আমি বাদশাহ ঔরংজীবের বন্দিনী।

১৩

বাইরে থেকে গোলমালের আওয়াজ আসছিল। এক সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা। শরীরে কষ্টটা একটু কম বোধ করেছিলাম। বিছানা থেকে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলান। রোদ্দুরে ভরে গেছে চারিদিক। ভোরের কুয়াশা কেটে গেছে। ভাল লাগছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারিনি। মাথাটা টলছে। যন্ত্রণা, মাথা কোমর আর পায়ের দুটো হাঁটুতে। মুখের ভেতরটা তেঁতো হয়ে গেছে। বিছানায় এসে বসেছিলাম। শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করেনি আর। একটা চাপা অস্বস্তি। কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না।

আর সেই সময় পা টিপে টিপে চোরের মত যাচ্ছিল মীর। মীর মহম্মদ। ডাকলাম, কৌন্‌রে ?

থমকে ছিল মীর। অপরাধী গলায় বলল, জিউ (মহাশয়া) ম্যায় মীর।

—মীর। কোথায় যাচ্ছিস্ এখন ?

মীর বলল, একবার নিচে যাব।

—ন্‌া। বললাম আমি। নিচে যাবি না। আমি তোকে সাবধানে থাকতে বলেছি। মনে আছে।

ঘাড় নাড়লো মীর। ফিরে গেল। আমিও আবার শুয়ে পড়লাম। কোমরের যন্ত্রণাটা কমছে না। খালেদা কোথায় যে গেল? থাকলে একটু টিপে দিতে বলতাম। রোগা শরীর হলে কি হয়, ওর হাত দুটো বড় নরম। আর বড় যত্ন ও সেবা করে। যদিও ওকে এসব করাতে খুবই খারাপ লাগে আমার। এখনো মাঝে মাঝে মনে হয়, খালেদা যদি না থাকতো তাহলে আমার কি দশা হ'ত। সময়ে অসময়ে কে আমাকে এভাবে দেখতো? বাঁদীরা হুকুম তামিল করে, খালেদা করে সেবা।

মনে আছে ছোট বেলায় আম্মাজান খালেদাকে নাম ধরে ডাকতে নিষেধ করেছিলেন। জাহানারা আর ভাইয়েরা খালেদাকে 'বহিন' বলে ডাকতো। আমি নাম ধরে ডেকেছি। খালেদারই প্রশ্রয়ে। আমার মুখে নাম ধরে ডাক তার ভাল লাগে।

বলবন ডাকতো বেগম বলে। আমি বলবনকে বলতাম বুড়া। ধূসর স্মৃতি বিদ্যুৎ চমকের মত ঝলসে উঠেছিল তার মনে। বালক বলবনকে লুঠেরার দল রাতের অন্ধকার আম্মার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সুদূর অতীতে। তার একটা ছোট্ট বোন ছিল—বেগম। বৃদ্ধ বলবন যেন সেই হারানো অতীতকে মূর্ত হতে দেখেছিল আমার মধ্যে। বুঝিনি তখন। অনেক পরে জেনেছিলাম।

শাহাজাদা সেলিমের অনেক অপকীর্তির সংবাদদাতা ছিল বলবন। সেলিমের সন্তানদের পাহারাদার ছিল সে। শাহাজাদা খুররমও তাঁর সন্তানদের পাহারার দায়িত্ব দিয়েছিলেন বলবনের ওপর।

যন্ত্রণাটা একটু একটু করে বাড়ছিল। কষ্ট হচ্ছিল খুব। দাঁতে দাঁত চেপে কষ্ট সহ্য করছিলাম। কতক্ষণ সেইভাবে পার হয়েছিল জানিনা। এক সময় মনে হল, কেউ যেন আমার কপালে হাত রাখলো। জোর করে চোখ খুলতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। নাম ধরে ডাক শুনলাম। খালেদা বলল, একটু হাঁ করো, দাওয়াইটা খাইয়ে দিই।

কষ্টে হাঁ করলাম। ওষুধ খেলাম। ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানিনা। আবার সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরটা কানে এল। একটু শুয়ে রইলাম চুপ করে। মনে হল শরীরের কষ্টটা অনেক কমে গেছে। চোখ মেলে চাইলাম। খালেদাকে দেখতে পেলাম।

—এখন কেমন বোধ করছো? জিজ্ঞেস করল খালেদা। উত্তরে হাসলাম।

আমার মুখে হাসি দেখে খালেদা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বলল, উঠে বসতে পারবে? যদি না পার হাঁ করো। কিছু খেয়ে নাও। হেকিম বারে বারে কিছু খেতে বলেছে। না হলে উঠে দাঁড়াতে পারবে না। সারা দিনটা যে ভাবে কাটলো আজ! আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। দিনভর ভুল বকেছো। আর শুধু রাবেয়া বেগমের কথা। তখন কত নিষেধ করেছি ওই ডাইনি বুড়ির কাছে যেও না। আমার কথা তখন একটা দিনের জন্যে কানে তোলনি। বুড়ি কবে কবরে গেছে, মায়া রেখে গেছে।

নাও, হাঁ কর, কিছু খাইয়ে দিই।

কথা না বলে উঠে বসতে গিয়েছিলাম। খালেদা ধরে বসিয়ে দিয়েছিল। তখনই নজরে এসেছিল কক্ষে আলো জ্বলছে। দিন শেষ হয়ে রাত্রি। শরীরটা বড্ড ক্লান্ত। বললাম, দিনভর কিছু মুখে দিয়েছো তুমি?

খালেদা বলল, আগে খেয়ে নাও কথা না বলে।

খেতে একটুও ইচ্ছে করছে না।

—ইচ্ছে করছে না বললে হবে না। খুব জোরাল দাওয়াই। খেতে হবে।

সামান্য একটু খেয়েছিলাম। কি খেয়েছিলাম জানি না। মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেছে। বললাম খালেদা, এখন কি রাত্রি?

- রাত্রি নয়। বলল খালেদা, খানিক আগে সন্ধ্যা হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, জাট্টি কি চলে গেছে।

—জাট্টি, খালেদা একটু কিছু ভাবল, বলল, হ্যাঁ চলে গেছে।

—তোমাকে কিছু বলেনি সে?

খালেদা যেন একটু সন্ত্রস্ত হল। বলল, দ্বিতীয় বার যখন হেকিমের কাছে যাচ্ছি সে ফাটকের কাছ থেকে উঠে আমার সঙ্গে যেতে সুরু করেছিল। আমি দাঁড়াইনি। সে পেছনে যেতে যেতে কটা কথা বলেছিল।

—কি কথা সে বলেছে? উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম।

—দেখ তার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছু বুঝিনি। খালেদা বলল, আমি মরছি এখন নিজের জ্বালায়। কানে এসেছিল সে বলছে, শাহাজাদীকে বলিস জাট্টি তার কথা রেখেছে। সাচ্চা নাজুম ঝুট বাত বলে না। একটা চাঁদ হুঁশিয়ার থাকে যেন সে। দুশমন তার পাশে পাশে ঘুরছে।

খালেদা চুপ করতে উত্তেজিত ভাবে বললাম, তারপর।

—তারপর? খালেদা একটু ভেবে বলল, আরো কি সব বলেছিল সে। ঠিক বুঝিনি। তবে তোমাকে বলার জন্যে আর কিছু বলেনি। হেকিমের কাছে গিয়ে শুনতে পেলাম, খোঁজ হয়েছে তার কাছে। বাঁদীটা কি দাওয়াই নিয়ে গেল। এখন শুয়ে ঘুমাবার চেষ্টা কর। আমি কিছু মুখে দিয়ে আসি।

খালেদা চলে গেল। চোখ বুঝলাম। রাবেয়া বেগমের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বুখার বেশি হতে আজ তার নামবার বারন করেছি। কেন?

খালেদা রাবেয়া বেগমকে পছন্দ করতো না, বলতো ডাইনীবুড়ি। খালেদা কি জানতো তাঁর অতীত জীবনের কথা? আমি শুনেছি অনেক পরে। তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন আগে। তখন আমি বড় হয়েছি। তিনি তাঁর জীবনের কথা আমাকে বলেছিলেন। কোন কিছুই গোপন করেননি।

আবার বাদশাহ আকবর শাহের কথাও রাবেয়া বেগমের কাছেই শুনেছিলাম। বাদশাহ আকবর শাহকে বড় শ্রদ্ধা করতেন তিনি।

বাদশাহ আকবর অমরকোটে রাণা বীর শালের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন (১৫ই অক্টোবর ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে)। তারপর জীবনে তাঁকে অনেক দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। আকবরের জন্মের কিছুদিন পর হামিদাবানু শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে অমরকোট থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরে ঝুনের শিবিরে হুমায়ুনের সঙ্গে মিলিত হন। তার পরেই সংবাদ পান আসকারী হুমায়ুনের শিবির আক্রমণ করতে আসছে। শিশুপুত্রকে সেই শিবিরে ফেলে রেখে হামিদাবানুকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যান হুমায়ুন। শিবির অধিকার করে হুমায়ুনের শিশুপুত্রকে হত্যা করেন নি আসকারী, নিঃসন্তান এক বেগমের হাতে তুলে দেন। তিনিই পরম যত্নে আকবরকে পুত্রস্নেহে পালন করতে লাগলেন। দু-বছর পর যুদ্ধে আসকারীকে পরাজিত করে কান্দাহার অধিকার করলেন হুমায়ুন। পরের বছর কামরানকে পরাজিত করে কাবুল অধিকার করলেন। তিনবৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র আকবরকে ফিরে পেলেন হামিদাবানু।

হুমায়ুন একদিন পাঞ্জাব অধিকার করলেন (১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে)। তের বছর বয়স্ক বালক পুত্র আকবরকে করলেন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা। অবশ্য অভিভাবক ছিলেন বন্ধু বৈরাম খাঁ। তিনিই শাসন কার্য চালাতেন। অবশ্য তারও আগে হিন্দালের মৃত্যুর পর (১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে) মাত্র নয় বৎসর বয়সে আকবর আনুষ্ঠানিক ভাবে গজনীর শাসনভার লাভ করেছিলেন।

হুমায়ুনের ভাগ্যলক্ষ্মী তখন প্রসন্ন। একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করছেন তিনি। কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিল জীবন (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে)।

অভিভাবক বৈরাম খাঁ চোদ্দ দিনের মধ্যেই আকবরকে দিল্লীর বাদশাহ ঘোষণা করেছিলেন। তিনদিন পরে গুরুদাসপুরের কালনৌর দুর্গে আকবরের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। আকবর বাদশাহ হলেন। পেছন থেকে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন বৈরাম খাঁ।

কিন্তু আকবরের বাদশাহ বনবার পর সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছিল। চারদিক থেকে আফগান শক্তি মাথা চাড়া দিয়েছিল। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (৫ই নভেম্বর ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) ভাগ্যলক্ষ্মী যদি আকবরের সহায় না হতেন হিন্দুস্থানের বুকে মুঘল-সাম্রাজ্য কোন দিনই প্রতিষ্ঠিত হ'ত না। দুর্ঘটনায় হিমু যদি আহত না হতেন তাহলে হিন্দুস্থানের মাটিতেই মুঘল সৈন্যদের শেষ শয্যা রচিত হত।

পানিপথের যুদ্ধের পর বৈরাম খান হুমায়ুনের ভগ্নী গুলরুখ বেগমের কন্যা সালিমা বেগমকে সাদী করে মুঘল পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেন। চার বছর বৈরাম খাঁ কঠোর হাতে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। আর সেই চার বছরে (১৫৫৬-১৫৬০ খ্রীঃ) তিনি নির্বিচারে শত্রু নাশ করেছিলেন। রাজ্য এবং নিজের শত্রু বলে যাকেই মনে হয়েছে তাকেই তিনি হত্যা করেছেন। চারবছর পরে রাজ্যের শাসন ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন আকবর। মক্কা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বৈরাম খাঁকে। কিন্তু পথে এক আফগান সর্দারের হাতে নিহত হন তিনি। সালিমা

বেগম এবং শিশুপুত্রকে দিল্লীতে নিয়ে আসা হয়। আকবর সালিমা বেগমকে সাদী করেন।

বৈরাম খাঁয়ের পদচ্যুতির পর হারেমে আকবরের ধাত্রী মাতা সাহাম আনাখা রাজ্যের শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে থাকেন তিনি (১৫৬০—১৫৬২ খ্রীঃ)। সাহাম আনাখার নিষ্ঠুর দুশ্চরিত্র পুত্র আধম খান অরাজকতার সৃষ্টি করেন। বাধ্য হয়ে আকবর ধাত্রী মাতার হাত থেকে রাজ্য পরিচালনার ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন (১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে)। কিন্তু তার পরও ছয় বৎসর আকবরের শাসনতন্ত্র মোল্লা গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। তারপর রাজ্যের সম্পূর্ণ শাসন ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন তিনি।

পানিপথের যুদ্ধের সময় আকবরের বয়স ছিল মাত্র পনের বছর। পিতৃবন্ধু বৈরাম খান আকবরের রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে প্রথমেই তিনি আকবরের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। পারস্য দেশীয় একজন শিয়া শেখ আবদুল লতিফ আকবরের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সাহাম আনাখার হাত থেকে রাজ্যভার গ্রহণের পর (১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে) বাদশাহ আকবর আজমীরের বিখ্যাত সুফীপীর মইনউদ্দীন চিস্‌তীর দরগায় তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে অম্বররাজ বিহারীলাল মুঘল বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাজপুতানায় অম্বররাজের তখন বহু শত্রু। সুতরাং তাঁর তখন মুঘল বাদশাহের সঙ্গে মিত্রতার প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে রাজ্যে মুসলমানদের মধ্যে শিয়া-সুন্নী বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। বাদশাহ আকবর সাহাম আনাখা এবং উজীর-আমীরদের বিরোধিতায় অ-মুসলিম-মিত্রের প্রয়োজন অনুভব করছেন। বিহারীমলের সাক্ষাতে আশার আলো দেখলেন তিনি। সাক্ষাতে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। শুধু তাই নয় বিহারীমলের কন্যা যোধবাঈকে সাদী করে সেই মিত্রতা বন্ধন আরো দৃঢ় করলেন। বিবাহের পর হিন্দুরাজ কন্যার নতুন নাম হল মিরিয়ম জমানী (যুগলক্ষ্মী)।

এর পরেই আরো একটা দুঃসাহসিক কাজ করলেন তিনি। যুদ্ধবন্দী হবে বিজেতার দাস—এই ছিল মুসলিম রাজত্বের পূর্বতন যুদ্ধনীতি। আকবর এই নীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই বছরই মাড়ওয়াড়ের দুর্ভেদ্য দুর্গজয় করার পর যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি দিলেন।

বাদশাহ আকবরের জীবনে যুদ্ধ এবং অশান্তি ছিল সর্বক্ষণের সঙ্গী। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তিনি যুদ্ধ করেছেন। জয়লক্ষ্মী বারবার তাঁর গলায় বরমাল্য দান করেছে কিন্তু জীবনে শান্তি কি তা তিনি কোনদিনই জানতে পারেননি। আত্মীয়-বন্ধু সকলেই প্রায় কোন না কোন সময় তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তাদের দমনের জন্য যুদ্ধযাত্রা করতে হয়েছে তাঁকে। কখনো পরাজিতকে হত্যা করেছেন,

কখনো ক্ষমা।

রাজস্ব এবং শাসন বিভাগে কঠোরতা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তন করায় মুসলিম কর্মচারিগণ এবং ধর্মে উদারতার ফলে উলামা ও মোল্লাগণ আকবরের বিরুদ্ধে বাঙ্গলা ও বিহারে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন (১৫৮০ খ্রীঃ)। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে বিহারের শাসনকর্তা মীর্জা হাকিমকে মসনদে বসানোর ষড়যন্ত্র সুরু করলেন। জৌনপুরের কাজী য়াজদী বিধর্মী আকবরের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রচার করে প্রকাশ্যে রাজদ্রোহ সমর্থন করলেন। মীর্জা হাকিমকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাদশাহ স্বীকার করে তাঁর নামে খুৎবা পাঠ করলেন। আকবরের উচ্চপদস্থ কিছু কর্মচারীও এই ষড়যন্ত্র লিপ্ত ছিলেন। বাঙ্গলা-বিহারের আমীররা এবং মীর্জা হাকিম দিল্লীর দিকে এগিয়ে গেলেন। ষড়যন্ত্রের সংবাদ অবগত হয়ে আকবর সন্দেহভাজন কর্মচারীদের বন্দী করলেন। সেই সঙ্গে রাজদ্রোহের অপরাধে অনেকের প্রাণদণ্ড দিলেন। মীর্জা হাকিম যুদ্ধ না করে কাবুলে পালিয়ে গেলেন। আকবরও কাবুলে ছুটলেন মীর্জা হাকিম আকবরের কাছে বশ্যতা স্বীকার করলেন।

রাজ্যভার গ্রহণের পর আকবর গণ্ডোয়ানা (জব্বলপুর) আক্রমণ করেছিলেন (১৫৬৪ খ্রীঃ)। গণ্ডোয়ানার রাজা বীর নারায়ণ তখন নাবালক। রাজমাতা দুর্গাবতী শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। তিনি সেনাপতি আসফখানের অধীনে অর্দ্ধ লক্ষ মুঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে অতি সামান্য সৈন্য নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বীর নারায়ণ আহত হওয়ায় দুর্গাবতীর আদেশে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। এক সময় দুর্গাবতীও আহত হলেন এবং শত্রুর হাতে বন্দী হওয়ার আশঙ্কায় আত্মহত্যা করেন। মায়ের মৃত্যুতে আহত বীর নারায়ণ যুদ্ধে যোগ দিয়ে নিহত হন। গণ্ডোয়ানার রাজপুত নারীরা জহরব্রত উদ্‌যাপন করে নারীত্বের সম্মান রক্ষা করেন।

মেবারের ওপর আকবরের রাগ বহু দিনের। প্রথম কারণ, অম্বররাজ বিধর্মীর হাতে কন্যা সম্প্রদান করায় মেবারের রাণা উদয়সিংহ তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। দ্বিতীয় কারণ, পরাজিত বজবাহাদুরকে মেবারের আশ্রয় দান। এছাড়া মেবার ছিল রাজপুতানার সর্বপেক্ষা গৌরবময় রাজ্য। আকবর মেবার আক্রমণ করলেন (১৫৬৮ খ্রীঃ)। কামানের গোলার আঘাতে সেনাপতি জয়মল আহত হলেন। জয়মলের আহত হওয়ার সংবাদে সৈন্যরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। রাজপুত নারীরা দুর্গের মধ্যে রাত্রে জহর ব্রতের অনুষ্ঠান করল। আহত জয়মল পরদিন যুদ্ধে যোগ দিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে নিহত হলেন তিনি। সৈন্যরা রাণা উদয়সিংহকে নিরাপত্তার জন্য আরাবল্লী পর্বতে পাঠিয়ে দিল। শিশোদীয় যুবক পুত্ত সিংহ সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। পুত্ত মাতা এবং পত্নীসহ মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজপুত সৈন্যদল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পরদিন প্রভাতে আকবর দুর্গদ্বারে মুঘল সৈন্যদের স্তূপীকৃত মৃতদেহ দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে দুর্গের ত্রিশ হাজার অধিবাসীকে হত্যার আদেশ দিলেন। নিরীহ মানুষের

আর্তনাদে সেদিন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল চিতোরের আকাশ বাতাস। ছিন্ন মুণ্ড দিয়ে তৈরি হয়েছিল বিজয় তোরণ। কিন্তু কাজটা যে তিনি ঠিক করেন নি, সেটা বুঝতে তাঁর খুব বেশি দেরি হয়নি। রাজপুতদের মনজয়ের জন্য বীর জয়মল আর পুত্রের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন আগ্রার দুর্গদ্বারে।

রণথম্ভর রাজা সুরজন রায় ছিলেন মেবারের সামন্ত রাজা। রণথম্ভর আক্রমণ করেন আকবর। শেষ পর্যন্ত অম্বরের রাজকুমার ভগবান দাসের মধ্যস্থতায় আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন (মার্চ, ১৫৬৯ খ্রীঃ) এবং সামন্ত রাজার মর্যাদা লাভ করেন। উত্তর ভারতে আকবরের প্রতিপত্তি বেড়ে গেল।

কালিঞ্জররাজ রাজা রামচাঁদ আকবরের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ভগবান দাসের প্ররোচনায় যোধপুরের রাজকুমার চন্দ্রসেন এবং বিকানীরের রাজা কল্যাণমল বশ্যতা স্বীকার করলেন। জয়শলমীরের রাজা হররায়ও স্বেচ্ছায় আত্ম সমর্পণ করলেন। আকবর হররায়ের এক কন্যা এবং বিকানীর রাজপরিবারের এক কন্যাকে অনুগ্রহ করে গ্রহণ করলেন। মুঘল-রাজপুত আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় হল। কিন্তু মেবার, মেবারের বশংবদ রাজা ডুঙ্গরপুর আর তার প্রতাপগড় মুঘল শক্তির কাছে মাথা নত করল না।

আকবর এবার গুজরাটের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন (১৫৭০ খ্রীঃ)। শস্য-শ্যামলা গুজরাট। বাণিজ্যকেন্দ্র গুজরাট। এ ছাড়া গুজরাট ছিল মক্কা তীর্থ-যাত্রীদের আরোহণ ও অবতরণের ক্ষেত্র। তাছাড়া পর্তুগীজ জলদস্যুরা মক্কা-যাত্রীদের যীশু মাতা মেরীর চিহ্ন যুক্ত টিকিট খরিদ করতে বাধ্য করতো। কিন্তু মানুষের চিহ্ন যুক্ত কোন দ্রব্য ব্যবহার ইসলামের নীতি-বিরুদ্ধ। নানা কারণে আকবর গুজরাট জয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

সে সময় গুজরাটের রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। সুলতান তৃতীয় মুহম্মদ ছিলেন দুর্বল, ভীরু, কাপুরুষ, আমীররা আত্মকলহে বিপর্যস্ত। তার ওপর আকবরের আত্মীয় মীর্জাগোষ্ঠী রাজ্য মধ্যে নানা রকমের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল। বিদ্রোহী আমীর ইতমাদ খান দিল্লীর বাদশাহকে আমন্ত্রণ জানালেন। আকবর গুজরাট আক্রমণ করলেন (১৫৭২ খ্রীঃ)। যুদ্ধ জয়ের পর মীর্জা আজিজ কোকাকে গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লী ফেরার পথে বাণিজ্য কেন্দ্র সুরাট জয় করলেন।

আকবর দিল্লী ফেরার পর সমস্ত আমীররা একযোগে মীর্জা আজিজ কোকাকে আক্রমণ করলেন। সংবাদ পেয়ে আকবর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গুজরাট পৌঁছে বিদ্রোহীদের দমন করলেন। পর্তুগীজ জলদস্যু এবং বণিকরাও এবার দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে সন্ধি করলেন।

এবার বাঙ্গলা। রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান পরাজিত ও নিহত হলেন (১৫৭৬ খ্রীঃ)। বাঙ্গলাদেশ স্থায়িভাবে মুঘল অধিকারে এল। কিন্তু তারপরও দীর্ঘ

পঁয়ত্রিশ বছর বাঙ্গলার দ্বাদশ ভৌমিক মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিক্রমপুরের কেদার রায়, চন্দ্রদ্বীপের (বরিশাল) কন্দর্প নারায়ণ, যশোরের প্রতাপাদিত্য, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য এবং পূর্ববঙ্গের ঈশা খাঁ উল্লেখ্য। মুঘল প্রতিরোধে পর্তুগীজরা বার-বার সাহায্য করেছে বার ভুঁইঞাকে।

চিতোর বিজিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু মেবারের রাজধানী চিতোর ছিল মেবারের পূর্ব সীমান্তে। পূর্ব সীমান্তে মেবারের রাণা উদয়সিংহের আধিপত্য ছিল। উদয় সিংহের মৃত্যুর পর রাণা হলেন প্রতাপ সিংহ। আকবরও সম্পূর্ণ মেবার জয়ের কথা ঘোষণা করলেন।

আকবর রাজপুত সেনাপতি মানসিংহকে মেবার জয়ে পাঠালেন। হলদিঘাট প্রান্তরে দু পক্ষ মুখোমুখি হল। রাণা তাঁর সামান্য সৈন্য নিয়ে হলদিঘাটের পিছন দিক থেকে মুঘল সৈন্য আক্রমণ করলেন। মুঘল সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগলো। সেই সময় সংবাদ প্রচারিত হল স্বয়ং বাদশাহ মানসিংহের সাহায্যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসছেন। সংবাদে উল্লসিত মুঘল সৈন্যরা চারদিক থেকে রাণা প্রতাপকে ঘিরে ধরলেন। বিপন্ন হল রাণার জীবন। সেই সংকট মুহূর্তে বিদা ঝালা রাণার রাজমুকুট অকস্মাৎ কেড়ে নিয়ে নিজের মাথায় পরে নিল। রাজ মুকুট দেখে মুঘল সৈন্যরা বিদা ঝালাকে আক্রমণ করল। রাণার বিশ্বস্ত পার্শ্বচররা তাঁকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে গেল। রাজপুতের রক্তে হলদিঘাটের প্রান্তর প্লাবিত হল। রাত্রে রাণা প্রতাপ গোগণ্ডা দুর্গ পরিত্যাগ করলেন। হলদিঘাটের যুদ্ধে মানসিংহ মেবারের সামান্য অংশই অধিকার করলেন।

রাণা আরাবল্লীর পার্বত্য অঞ্চলে নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন। অসীম শক্তিমান বাদশাহ আকবর সহায় সম্বলহীন রাণা প্রতাপকে কখনো প্রলোভন, কখনো ভীতি প্রদর্শন, কখনো বন্ধুত্বের বাসনা জানিয়ে বশ্যতা স্বীকারের কম চেষ্টা করেননি। কিন্তু প্রতিবারেই রাণা আকবরের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন।

রাজ্যাভিষেকের দিন রাণা প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যতদিন না তিনি চিতোরকে শত্রু মুক্ত করতে পারছেন, ততদিন ভূমি শয্যায় শয়ন করবেন, স্বর্ণ-রৌপ্য পাত্রে আহার করবেন না। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত (১৫৯৭ খ্রীঃ) তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন। প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন, কিন্তু মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করেননি বা কোন শিশোদীয় রাজকুমারীকে মুঘলের হাতে তুলে দেননি।

মৃত্যুর পূর্বে রাণা অনেকগুলি পার্বত্য দুর্গ পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর অমর সিংহ মেবারের রাণা হয়েছিলেন। তিনিও মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করেন নি।

আকবরের সময় দাক্ষিণাত্যের উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল খান্দেশ, আহম্মদ নগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা। আকবর উত্তর ভারত, রাজপুতানা এবং সীমান্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করে দাক্ষিণাত্যের দিকে দৃষ্টি দিলেন। চারটি রাজ্যের বশ্যতা

দাবী করে একই দিনে চারজন দূতকে পাঠালেন।

খান্দেশের সুলতান রাজা আলী খান দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করলেন, কিন্তু অন্য তিনটি রাজ্য বশ্যতা স্বীকার করলো না। শাহাজাদা মুরাদ এবং বিখ্যাত সেনাপতি আবদুর রাইম খান-ই-খানান আহম্মদ নগর অবরোধ করলেন। খান্দেশের সুলতান মুঘলদের সাহায্য করেন। তখন আহম্মদ নগরের সুলতান মুজাফর শাহ। এই বিপদের সময় বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহের বিধবা পত্নী আহম্মদ নগরের সুলতান নিজাম শাহের কন্যা চাঁদ সুলতানা ভ্রাতষ্পুত্র মুজাফরের সাহায্যে এগিয়ে যান। আহম্মদ নগর রক্ষা অসম্ভব দেখে তিনি মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আহম্মদ নগর দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করবে, বেরার রাজ্য মুঘলদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং মুঘল রাজধানীতে বহুমূল্যে উপঢৌকন পাঠানো হবে।

এই অপমানজনক সন্ধির শর্ত আহম্মদ নগরের আমীররা মানতে চাইলেন না। গোপন ষড়যন্ত্রে তাঁরা চাঁদ সুলতানাকে গুপ্ত হত্যা করালেন। কিন্তু আবুল ফজলের নেতৃত্বে আহম্মদ নগর আক্রমণ করল মুঘল সৈন্য (১৬০০ খ্রীঃ)। যুদ্ধে বন্দী হলেন নিজাম শাহ। কিন্তু আমীররা আহম্মদশাহী বংশের একজন সুলতান নির্বাচিত করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

বিজাপুরের সুলতান এর পর ভয় পেয়ে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং আহম্মদ নগরের বিরুদ্ধে মুঘলের পক্ষে যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র মীরণ বাহাদুর শাহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেন না। তিনি সাতপুরা পবতে আসীর গড দুর্গে আশ্রয় নিয়ে মুঘল বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে লাগলেন। আকবর শাহ খান্দেশের রাজধানী বুহরাণপুর অধিকার করেছিলেন কিন্তু আসীব গড জয় করতে পারেননি।

ঠিক এই সময় দুর্গ মধ্যে প্রচণ্ডরূপে মহামারী দেখা দিল। পঁচিশ হাজার দুগবাসী মৃত্যুর মুখে, নিরুপায় মীরণ বাহাদুর সেনাপতি মুকারিব খানের মধ্যস্থতায় সন্ধির প্রস্তাব করলেন, সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন বাদশাহ আকবর। কিন্তু মীরণ বাহাদুর আত্মসমর্পণ করলে বন্দী হলেন। তাঁকে এবং মুকারিব খানকে হত্যা করা হল।

আসীর গড় বিজয়ের পর আকবর আর কোন রাজ্য জয় করেন নি। দাক্ষিণাত্যে আহম্মদ নগর, বেরার আর খান্দেশকে যুক্ত করে একটা সুবা গঠন করা হয়েছিল। এই সুবার প্রথম সুবাদার শাহাজাদা দানিয়েল।

১৭

শবনম, রাবেয়া বেগমের মুখে একটু একটু করে বাদশাহ আকবর শাহের কথা শুনেছিলাম। প্রায় সমস্ত হিন্দুস্থানে আকবরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কৌশলে তিনি কাশ্মীরকেও নিজ অধিকারে নিয়ে এসেছিলেন। নানাভাবে সাজিয়ে ছিলেন কাশ্মীরকে। কাশ্মীর মুঘল পরিবারের ভূ-স্বর্গ।

হিন্দুস্থানে আকবরের রাজ্যারম্ভের প্রথমদিকে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। তার মধ্যে রাজপুতরাই ছিলেন অনমনীয়। রাজপুত পরাজিত হয় কিন্তু নতি স্বীকার করে না। সুতরাং রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ-নীতির পরিবর্তে তিনি মৈত্রী-নীতি অবলম্বন করেন। রাজপুত পরিবারের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের কোথাও তিনি বন্ধুরূপে, কোথাও মনসবদার রূপে আবার কোথাও সেনাপতিরূপে নিয়োগ করেন। সেই সঙ্গে তিনি হিন্দুর ওপর থেকে জিজিয়া কর ও তীর্থকর রহিত করেছিলেন। তিনি কখনা হিন্দুদের নতুন মন্দির নির্মাণে বাধা সৃষ্টি করেননি বা কখনো প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করেন নি। বিধর্মীর সঙ্গে নীতিগত ভাবে সহাবস্থান ও মৈত্রী মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের নতুন রূপ। আকবরের দরবারের নবরত্নের মধ্যে বিহারী মল, বীর বল, টোডর মল ও ধর্মান্তরিত হিন্দু সংগীতজ্ঞ তানসেনও ছিলেন। তাঁর রাজ-চিকিৎসক ছিলেন চন্দ্রসেন, রাজ-চিত্রকর ছিলেন দশবনাথ ও বসন্ত এবং রাজসভায় অন্যতম পণ্ডিত ছিলেন বাঙ্গালী নৈয়ায়িক মধুসূদন সরস্বতী।

বাদশাহ আকবর নিজে অসংখ্য বিবাহ করলেও নতুন আইন করলেন একজন পুরুষ মাত্র একজন নারীকে বিবাহ করতে পারবেন (ইসলামে চারি স্ত্রী বিবাহ ধর্মানুমোদিত)। কেউ ইসলামের পবিত্র মুস্তফা, মুহম্মদ, আহম্মদ, ফতিমা (মুহম্মদের কন্যা) নাম ব্যবহার করতে পারবে না। সেই সঙ্গে মক্কা যাত্রা নিষিদ্ধ করলেন তিনি। কারণ স্থল ও জল পথে মক্কা যাত্রীদের ধন-সম্পদ লুঠ করা হ'ত তখন। দরবারে নুমাজ পড়া নিষিদ্ধ করলেন তিনি কারণ নমাজের নামে কাজে অবহেলা করতো কর্মচারীরা। সেই সঙ্গে তিনি, জৈনদের অহিংসা নীতি অনুসারে সপ্তাহে দুদিন পশুবধ ও রাজকীয় শিকার নিষিদ্ধ করেছিলেন। হিন্দুদের উচ্চ পদে নিয়োগে বহু আমীর আকবরের ওপর রুষ্ট হয়েছিলেন। মসজিদের জন্য প্রদত্ত জমি ভূমি-কবুলিয়তের মধ্যে লিখিত নির্দিষ্ট সীমার বেশি হলে, উদ্বৃত্ত জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। ইসলাম ধর্মের ভাষা আরবীর পরিবর্তে তিনি ফার্সী ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। মোল্লারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। ফতোয়া জারি করেছিলেন, আকবর ধর্মহীন, ইসলাম বিরোধী ; সুতরাং তিনি মুসলিমের মসনদে বসতে পারেন না।

এক সময় ইবাদৎখানার অভ্যন্তরে ধর্মের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে মুসলিম মোল্লাদের মধ্যে তীব্র ও অশোভন মতভেদ প্রকটিত হয়ে উঠেছিল। শেখ মুবারক (আবুল ফজলের পিতা), মোল্লা সরহিন্দ প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত উলামা প্রচার করলেন যে, ধর্মের ব্যাখ্যার ব্যাপারে মতভেদ হলে বাদশাহের মত-ই অভ্রান্ত বলে গৃহীত হবে।

যথার্থ ইসলাম ধর্মের প্রতি আকবরের অনুরাগ ছিল, কিন্তু তিনি মোল্লা আচরিত

ধর্মান্ধতার বিরোধী ছিলেন। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, অন্ধ বিশ্বাস তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। তাঁর চিন্তাধারায় সকলধর্মের সংমিশ্রণ হয়েছিল। তাঁর প্রবর্তিত মতবাদ দীন-ই-ইলাহী (দিব্যধর্ম)। দীন-ই-ইলাহী কোন নতুন ধর্ম নয় এবং কোরাণের মতবিরোধীও নয়। দীন-ই-ইলাহীর দশটি নির্দেশের মধ্যে ন'টিই কোরাণ অনুমোদিত।

নতুন মতবাদ প্রচারের পূর্বে ওপরে তিনি মুসলিম সমাজের মধ্যে সংস্কার মূলক কয়েকটি ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন। ধর্মান্ধ মোল্লারা এই সংস্কার প্রবর্তনের জন্যই আকবরকে বিধর্মী বলে নিন্দা করেছিলেন। ইসলামের নির্দেশ অনুসারে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু বাদশাহ আকবর রাষ্ট্রকে ধর্মের বাহনরূপে গ্রহণ করেননি। এখানেই বাদশাহের সঙ্গে মোল্লাদের মতভেদ।

বাদশাহ আকবর শাহ আরো একটি কাজ করেছিলেন.তা হল মুঘল শাহাজাদীদের বিবাহ নিষিদ্ধ।

শবনম, সংসারে কারো প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই। সেই ছোটবেলা থেকে আমি সম্পূর্ণ আমার নিজের মত। আর সেই জন্যই অবহেলা লাভ করেছি। দুঃখ? তাও ক্ষণিকের। জীবনের সঙ্গে সুখ এবং দুঃখ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঠিক যেন এই রোদ—এই বৃষ্টি। আলো এবং অন্ধকার।

হিন্দুদের রাজাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। রাজদর্শন সৌভাগ্য দান করে। বাদশাহ আকবরও মনে-প্রাণে তাই বিশ্বাস করতেন। প্রতিদিন সূর্যোদয়ে প্রজাদের দর্শন দানের ব্যবস্থা করেন। সেই বাদশাহ আকবর শেষ জীবনে শোক-দুঃখ-হতাশায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ অত্যধিক মদ্যপানের ফলে অকস্মাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হন (১৫৯৯ খ্রীঃ)। প্রথম জীবনে তিনিও মদ্যপান করতেন কিন্তু মদ্যপানের কুফল বোঝবার পর ত্যাগ করেন। শুধু তাই নয় আমিষ আহার পর্যন্ত বর্জন করেন। মুরাদকে সংশোধনের অনেক চেষ্টা তিনি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। তবু মদ্যপায়ী পুত্রের মৃত্যুতে প্রচণ্ড দুঃখ পেয়েছিলেন তিনি।

বাবেয়া বেগম বলেছিলেন, শুধু মুরাদের মৃত্যু নয়, তাঁর প্রিয়পুত্র সেলিমের প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা ও (১৬০০ খ্রীঃ) বাদশাহ উপাধি গ্রহণে আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। আবার সেই সেলিমেরই ইঙ্গিতে আবুল ফজলের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে (১৬০২ খ্রীঃ) অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তার পরই আবার আঘাত পেলেন সেলিমের অপমানে অপমানিতা মানবাঈ আত্মহত্যা করায় (১৬০৩ খ্রীঃ)। পরের বছরই আম্মাজান হামিদাবানু মারা গেলেন। পরের বছর (১৬০৪ খ্রীঃ) তৃতীয়পুত্র দানিয়াল সুরামত্ত অবস্থায় বুহরাণপুরে প্রাণত্যাগ করলেন। এর কিছুদিন পরেই মানসিংহ এবং মীর্জা আজিজ কোকা সেলিমকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে সেলিম পুত্র খসরুকে মসনদে বসাবার চেষ্টা করলেন। এই জটিল শোকাবহ পরিস্থিতির

মাধ্য বাদশাহ আকবর অকস্মাৎ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হলেন, সপ্তাহের মধ্যে তাঁর বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হয়ে গেল। সেলিম ছুটে গেলেন বাদশাহের রোগ শয্যার পাশে। আমীর এবং আত্মীয়দের সামনে আকবর ইঙ্গিতে সেখুবাবাকে কাছে ডাকলেন এবং রাজমুকুট পরিধান ও হুমায়ুনের তরবারি গ্রহণের আদেশ করলেন। ফলে মসনদের জন্য দ্বন্দ্ব নিরশন হল। তেষট্টি বছর বয়সে (২৭শে অক্টোবর ১৬০৫ খ্রীঃ) বাদশাহ আকবর শাহ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সুরু হল জাহাঙ্গীরের দিন।

১৮

আজ ঘুম ভেঙ্গেছিল অনেক ভোরে। ঘুম ভাঙ্গার পর অনেকক্ষণ শয্যায় শুয়েছিলাম। শুয়ে শুয়ে কক্ষের চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করেছিলাম। মৃদু আলোয় কক্ষ আলোকিত, ঠিক মিষ্টিস্বপ্নের মত। একটা সুগন্ধ নাকে এসেছিল। কস্তুরির গন্ধ। গত সন্ধ্যায় খালেদা নিশ্চয়ই আগুনে কস্তুরি পুড়িয়েছে। সেই গন্ধ হালকা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কক্ষের মধ্যে।

অথচ গতকাল ছিলাম আচ্ছন্ন চেতনা। কি ভাবে দিন কেটেছিল জানি না। কখনো ঘুম, কখনো জাগরণে প্রহর পার হয়েছিল। মাথায় কেউ যেন বিরাট ওজনের পাথর চাপিয়ে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর কুরে কুরে খেয়েছিল। আজ কিন্তু সে সবের চিহ্নমাত্র নেই। যদিও দুর্বল লাগছে। কিন্তু আমি যে গতকাল প্রচণ্ড রকমের অসুস্থ ছিলাম, সেকথা এই মুহূর্তে মনে করতে পারছিনা। হেকিমের দাওয়াই আমাকে মাত্র একদিনে সুস্থ করে তুলেছে। বহুদিন আমি হেকিম বাহলুল খানের দাওয়াই খাচ্ছি। সেই বাচ্চা বয়েস থেকে। তিনি আমার ধাত জানেন। তাঁর দাওয়াই ছাড়া অন্য কারো দাওয়াইয়ে কাজ হয় না আমার। আজ তিনি অতিবৃদ্ধ। খালেদাকে দেখে চিনতে পারেন। স্মৃতি হাতড়ে রোগীনিকে মনে করেন। দাওয়াই দেন। কাজ হয় আমার।

অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইলাম। বুঝতে পারলাম বাইরে এখনো দিনের আলো ফোটেনি। পাখিদের ডাকাডাকি এখনো সুরু হয়নি। সূর্য ওঠার এখনো দেরি আছে।

একসময় বিছানায় ওপর উঠে বসলাম। মাথাটা সামান্য ঝিম ঝিম করে উঠলো। একটু সামলে নিয়ে নামতে যাচ্ছি পালঙ্ক থেকে, খালেদার কণ্ঠস্বর কানে এল, এখনো তো ভাল করে ভোর হয়নি, এরমধ্যে ওঠার দরকারটা কি তোমার?

উত্তর দিলাম না খালেদার কথার।

খালেদা ভিতরে এল, বলল, কি হল, ছোট কথাটা কানে গেল না বুঝি?

খালেদাকে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কখন উঠলে?

খালেদা বলল, পোড়া দুচোখে ঘুম থাকলে তবেই না ওঠা।

বললাম, ঘুমাওনি রাতে ?

খালেদা বলল, ঘুমাইনি বললে মিথ্যে বলা হবে, উঠেছি দশবার। তোমার জন্যে নিশ্চিন্তে ঘুমাবার যো আছে নাকি! সেই ছোট বয়েস থেকে জ্বালিয়ে আমার হাড়মাস কালি করে দিলে তুমি। বুঝেছি জিন্দা থাকতে ঘুম কি জিনিস জানতে পারবো না। মরে একবারে কবরে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাবো।

বললাম, সেই ভাল। যে কটাদিন আছো একটু জ্বলো। এখন মেহেরবানী করে একটু গরম পানির ব্যবস্থা করো দেখি।

চোখ কপালে তুললো খালেদা। জানতে চাইল, গরম পানি কি করবে ?

—গোসল করবো।

—তোমার কি দিমাগ একবারেই ঠিক নেই? কাল দিনভর বেহুঁস কেটেছে তোমার। আজ এই ভোরে গোসল করবে কোন সাহসে? বলতে বলতে কাছে এল খালেদা। কপালে, গায়ে হাত দিয়ে দেখল। বলল, এখনো বুখার রয়েছে তোমার।

বললাম, ও কিছু নয় কি ?

—চুপ কর। ধমক দিল খালেদা। যা বলছি শোন, গোসল করা চলবে না। হেকিমও সে কথা বলে দিয়েছে। গরম পানির ব্যবস্থা করছি। হাত মুখ ভাল করে ধুয়ে নাও।

তাই হল. ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে পোশাক পাল্টে নমাজ পড়ে নিলাম। খালেদা নাস্তা নিয়ে এল। মুখ তেঁতো হয়ে আছে, তবু খেত হল। বিস্বাদ। যাওয়ার পর খালেদা দাওয়াই খাওয়াল। মুখের ভেতরটা পর্যন্ত তেঁতো হয়ে গেল। কটা দারুচিনি মুখে ফেলে চিবিয়ে নিলাম। তিক্ত ভাবটা তবু যেতে চাইলো না।

এবার খালেদা বলল, এবার গিয়ে শুয়ে থাক। তোমার বিশ্রামের দরকার। আমি এবার যাই।

বললাম, শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে না আর।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে খিঁচিয়ে উঠল খালেদা। বলল, শুয়ে থাকতে যদি ইচ্ছে না হয়, ধেই-ধেই করে নাচো তাহলে। আমি চললুম। আমার কাজ আছে।

বললাম, তুমি যাও। আমি একটু গম্বুজ ঘরে গিয়ে বসি।

হাঁ-হাঁ করে উঠল খালেদা। বলল, সত্যি তোমার দিমাগ খারাপ হয়ে গেছে। এই শরীর নিয়ে তুমি সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠবে। মাথা ঘুরে পড়ে একটা কাণ্ড বাধাতে চাও নাকি বলতো তুমি!

হেসে বললাম, চিন্তা কোর না। আমি ঠিক যেতে পারবো।

উঠে এলাম গম্বুজ ঘরে। একদিনেই শরীর কাহিল করে দিয়েছে। কষ্ট হল। বুকের মধ্যে টান ধরছিল। তবু জোর করে উঠে এলাম। দরোজা খুললাম ছোট্ট

ঘরটার। ভেতরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জানি, খালেদা নিজের হাতে এই ঘরটা পরিস্কার করে। কাজের লোকের অভাব নেই, কিন্তু খালেদা এখানে কাউকে আসতে দেয় না।

বলেছিলাম, ছোট ঘরটা কাউকে বললেই তো রোজ পরিষ্কার করে দেয়।

উত্তর দিয়েছিল, সবকাজ সকলকে দিয়ে করানো ঠিক নয়। ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না।

না, আর কোনদিন কিছু বলিনি। শুধু বুঝতে পারিনি, খালেদা কোন বাঁদীকেই ওপরে উঠতে দেয় না কেন? কেন তার এত কড়াকড়ি।

ছোট ঘরটার মধ্যে গিয়ে বসলাম। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। কুয়াশা ছিল ভোরে। কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে। কিন্তু ঠাণ্ডা একটুকু কমেনি।

সব জানালাগুলো খুলে দিয়েছিলাম। পূর্বদিক থেকে রোদ্দুর এসে ঘরটা ভরিয়ে দিয়েছে। আমার গায়ে মাথায় এসে পড়েছে, কিন্তু রোদ্দুরে আজ উত্তাপ নেই বললেই চলে। উত্তরের ছোট জানলাটা দিয়ে মাঝে মাঝে হাওয়া আসছে। কাঁপিয়ে দিচ্ছে অসুস্থ শরীরটাকে। ওটা বন্ধ করা দরকার। কিন্তু বন্ধ করতে পারছি না। জানলাটা খোলার পরই একটা ছোট্ট পাখি মাঝে মাঝে এসে বসছে, লেজ নেড়ে ডাকছে, উড়ে যাচ্ছে। যেন একটা খেলা পেয়ে গেছে।

পাখিটার কি নাম জানি না। চেনা পাখি। অনেকবার এখানে ওখানে দেখেছি। দেখতে আহা মরি কিছু নয়। খুবই ছোট। টুনটুনির মতই। তবে এর গায়ের রং পাশুটে আর সাদায় মেশানো। পেটের কাছটায় একটু হলুদ ছোপ। আসছে, বসছে, কিচির করে ডাকছে, উড়ে যাচ্ছে আবার। আর উড়ে যাচ্ছে কখন, না, ডাক শুনে যেই আমি জানলার দিকে তাকাচ্ছি, ঠিক তখনই ফুড়ুৎ করে উড়ে যাচ্ছে। যেন মজা পেয়েছে।

ছোটবেলায় অনেকগুলো পায়রা ছিল আমার। আমার বলছি এই কারণে, আমার খুব বাধ্য ছিল এক ঝাঁক পায়রার মধ্যে অনেকগুলো। গোলা পায়রা। রোজ সকালে ওদের খেতে দিতাম আমি। চানা, মটর, গেঁজ। ভাইজানদেরও অনেক পায়রা ছিল। কত ভাল ভাল পায়রা। দেখতে সুন্দর। আকাশে উড়তে উড়তে খেলা দেখাতো তারা। লড়াই করতো। শুনেছি মুঘল বাদশাহ আর শাহাজাদারা পায়রা পুষতেন। পায়রাদের শেখানোর জন্য ওস্তাদ থাকতো। ওস্তাদ শিষ দিয়ে-দিয়ে পায়রা ওড়াতো। সে সব দেখবার মত। আর আমার পায়রাদের শুধু আমিই দেখতাম। শুধু খেতে দেওয়া। কিন্তু বড় বাধ্য ছিল তারা। শিষ দিতে হ'ত না, বোধ হয় আমাকে খুশি করার জন্যে গলা ফুলিয়ে বকুম বকুম করতো। উড়ে উড়ে চক্রাকারে ঘুরতো। কখনো কখনো গায়ে মাথায় বসতো। আর অসুস্থ হয়ে শয্যা গ্রহণ করলে তারা ঝাঁক বেঁধে কক্ষে পর্যন্ত চলে আসতো। খালেদাকে চানা দিতে বললাম। খালেদা চানা দিলে দু চারটে যে খেত না তা নয়, তাদের, বেশীর

ভাগই কিন্তু না খেয়ে চলে যেত। তবে বড় নোংরা করতো চারিধার। সেই অপরাধে তাদের একদিন হারেমের ত্রিসীমানায় ঘেঁসা বন্ধ করে দিয়েছিল বান্দার দল। দেখলেই মার মার। তারা আসা বন্ধ করে দিয়েছিল একদিন। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু করার উপায় ছিল না।

পাখিটা অনেকক্ষণ আসছে না। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। উঠে জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আর ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মীরকে দেখতে পেয়েছিলাম। মীর দাঁড়িয়ে আছে।

—কিরে তুই ?

—জি মালেক। এক গাল হাসল মীর।

বললাম, কি সুরু করেছিস তুই ?

অবাক হল মীর। আমার কথাটা যেন বুঝতে পারল না। মৃদু কণ্ঠে বলল, ক্যা মালেক ?

—বুঝতে পারছিস না ? প্রশ্নটা শুনে মাথা নাড়লো মীর। বললাম, কাল ফাটকের সামনে কেন গিয়েছিলি ? জানিসতো তোর ওপর দুশমনদের নজর রয়েছে। তোকে কতবার আমি সাবধান করেছি ?

কথাটা শুনে এবার বুঝতে পারল মীর। বলল, ফাটককে সামনে ম্যায় নেহি গিযা মালেক। ও নাজ্জুমকে সমাচারতো হমকো…কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেল মীর। আমি তার দিকে চেয়ে আছি দেখে থতমত খেয়ে ধীরে ধীরে বলল, ঔর কোই ম্যায়নে বোলা। হম খালেদা বিবিকো বাতায়া।

সেই গোপনীয়তা। বলবন অনেক কিছুই গোপন করতো। মীরও করছে। মীর বা বলবনরা একা নয় এখানে। তবু বলবন রক্ষা পেল না। তাকে বাঁচাবার জন্য কেউ এগিয়ে যায়নি। কেন ?

মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। কথা বলতে ইচ্ছা করল না।

মীর ডাকলো, জনাব।

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম।

মীর মাথা নিচু করে বলল, জনাব। আপনার জন্য জানের পরোয়া আমরা করবো না। লেকিন, আমাদের যদি কিছু হয়, আমরা চেষ্টা করবো নিজের জান বাঁচাতে। যদি সকলে আমরা একজনকে বাঁচাতে এগিয়ে যাই, তাহলে দুশমনরা যে আমাদের চিনে ফেলবে। তখন আপনাকে কে বাঁচাবে জনাব ? তাই, আমাদের জন্যে শোচবেন না। ঔর…

ওরদিকে চাইলাম। বললাম, আর কি মীর ?

—দুশমনরা এখন রাতেও ঘুরছে। আমরা ওদের দেখতে পাচ্ছি। লেকিন, ওরা বহুৎ শয়তান। মোকা মিলেগা তো জরুর খতম কর দেগা।

আঁতকে উঠলাম মীরের কথা শুনে। বললাম, না-না, মীর, খুন খারাপি করতে

যেওনা।

আমার ভয় পাওয়া দেখে হাসল মীর। শান্ত কণ্ঠে বলল, জনাব, ডরিয়ে মৎ। কে মেরেছে জানতেই পারবে না।

শুনে কোন কথা বলতে পারলাম না। বুকের মধ্যে কাঁপছিল আমার। বুঝতে পারছিলাম না, কি ঘটতে চলেছে। মীর যা বলল, তা যদি সত্য হয়, তাহলে কারা রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়িটায়, কি তাদের উদ্দেশ্য ?

অনেক চিন্তা করেও কোন কূলকিনারা পেলাম না। মীরকেও দেখতে পেলাম না। সে চলে গেছে।

খালেদাকে বলে যাওয়া জট্টির কথগুলো মনে পড়লো। বুকের মধ্যেটা শির-শির করে উঠলো। সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম আমি জাহানারার সঙ্গে সিক্রিতে চলে যাব। আর ··হ্যাঁ, বলবন আমার নিরাপত্তার জন্য যাদের রেখে গেছে, মীরকে বলে, তাদেরও নিয়ে যাব। খালেদা আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না. তাকে ছাড়া আমারও একটা দিন চলবে না। অর্থের অভাব খুব একটা হবে না। রাবেয়া বেগম আমাকে যা দিয়ে গেছেন সে ঐশ্বর্য অবহেলায় পড়ে আছে আমার কাছে।

রাবেয়া বেগমের কথাটা মনে হতে মনটা আবার বিষন্ন হয়ে গেল আমার। হাতির দাঁতের মত গাত্রবর্ণ ছিল যাঁর, সৌম্য দর্শনা, স্নিগ্ধ, পবিত্র মূর্তি। অথচ খালেদা বলতো, ডাইনী বুড়ি। তিনি কিন্তু আমাকে সত্যই ভালবাসতেন। কত কথা শুনেছি তাঁর কাছে। কত গল্প বলেছেন। বেশির ভাগই বদশাহ আকবর শাহকে নিয়ে সে সব গল্প। বাদশাহের সৌন্দর্যবোধ, উদারতা, সঙ্গীত-প্রীতি, চিত্রকলা এমনকি সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতার কথা পর্যন্ত। একটা মানুষ তাঁর জীবনে কত কি করে গেছেন। শুধু সাম্রাজ্য নয়, শিল্প, সাহিত্য সবদিকেই ছিল তাঁর সমান দৃষ্টি। আর উপকারীর প্রতি সম্মান বোধ। মাহাম আনাখা বা বৈরাম খানকেও তিনি সরাসরি কিছু বলতে পারেননি, কুণ্ঠিত ভাবে শাসন ক্ষমতা চেয়ে নিয়েছিলেন।

শুনতে শুনতে মুগ্ধ হতাম। জিজ্ঞেস করতাম, জিউ এতকিছু আপনি জানলেন কেমন করে ?

হাসি মুখে তিনি উত্তর দিতেন, জেনেছিলাম বেটী জানার ইচ্ছা থাকলে তুমিও জানবে।

একদিন বলেছিলাম, জিউ, আপনার কথাও আমার জানতে বড় ইচ্ছা করে।

তিনি যেন একটু চমকে উঠেছিলেন কথাটা শুনে। বলেছিলেন, বেটী আমার কথা কি শুনবে তুমি ?

বলেছিলাম, আপনার জীবনের কথা। জায়গীরদারের বিবি ছিলেন। জায়গীর-দারের কাজ কি, কিভাবে জায়গীরদাররা জীবন কাটান ? বাদশাহের কথা শুনেছি, লেকিন জায়গীরদারের কথা কোনদিন শুনিনি। জায়গীরদার সম্পর্কে কোন ধারণাই আমার নেই।

শুনে মিষ্টি করে হেসেছিলেন রাবেয়া বেগম। তারপর হঠাৎ-ই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। এক সময় বলেছিলেন, বলবো তোমাকে। লেকিন, আজ নয়। তোমার কথা আমার মনে থাকবে। একদিন তোমাকে সব কথাই বলবো।

তাঁকে আর বিরক্ত করিনি। আমার মনে হয়েছিল, কোথায় যেন অদৃশ্য বাধা আছে। অস্বস্তি বোধ করছেন। তখন সেটুকু বোঝবার মত জ্ঞান বুদ্ধি আমার হয়েছে। কৈশোরের প্রান্ত সীমায় তখন আমি। আর কয়েক বছরে আমি রাবেয়া বেগমের অনেক কাছে পৌঁছে গেছি। আমরা যেন অসমবয়সী দুই বন্ধু। কয়েকদিন কোন কারণে তাঁর কাছে যেতে না পারলে মনটা আমার ছটফট করতো। কদিন পরে আমাকে দেখে তিনি মুখ ভার করে থাকতেন। আহ্বান জানাতেন নিরাসক্ত ভাবে। জিজ্ঞেস করতাম, কি হল বেগম সাহেবা, মুখ গম্ভীর কেন?

উত্তর দিতেন, তোমার দেখার ভুল। বুড়ো মুখে চাঁদের হাসি খেলে না।

বলতাম, তা ঠিক কথা। লেকিন, আপনার মুখটাই তো চৌধুবী কা চাঁদ।

বলতেন, ছিল একদিন। লেকিন, সে উমর বহুকাল আগে পার হয়ে এসেছি। এখন তো আমি সকলের করুণার পাত্রী।

—আদমীর করুণা করার ক্ষমতা কোথায় বেগম সাহেবা? একমাত্র করুণা করতে পারেন আল্লাহ।

অনেকক্ষণ চুপ করেছিলেন তিনি। তারপর বলেছিলেন, আল্লার ওপর তোমার এত বিশ্বাস?

—জরুর। বলতাম, তাঁর দুনিয়ার তাঁর ওপর বিশ্বাস না রেখে যাই কোথায়? তিনি দীন দুনিয়ার মালেক। আমি শুধু আমার কাজ করে যাই।

তিনি বলতেন, উই উমরে আল্লা-আল্লা করা ঠিক নয় শাহাজাদী।

বললাম, আল্লাকে ডাকার কি কোন উমর আছে বেগম সাহেবা। সিত্তীউন্নিসা বলতেন, আল্লা আমাদের মনের অদৃশ্য বাঁধন, আবার তিনিই আমাদের জাগ্রত চেতনা। তাঁর বাঁধনের কথা মনে রাখলে বুরা কাম থেকে তিনি আমাদের ঠিক দূরে সরিয়ে রাখবেন। আর জাগ্রত চেতনা তিনি এই জন্য অন্ধত্ব, কুসংস্কার দূরে করে তিনি আমাদের আলোকের সন্ধান দেবেন। আমরা পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবো। সদিচ্ছা, সৎজীবন, আনন্দ আর শান্তি হবে জীবনের পাথেয়।

শুনতেন রাবেয়া বেগম। শুনে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন। আমার কথাগুলো ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারতেন না। কি যেন চিন্তা করতেন। দেখতেন আমাকে। এক সময় বলতেন, আল্লাহ ওপর তোমার খুব বিশ্বাস, তাই না শাহাজাদী?

চিন্তা করতাম আমিও। মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিতাম, খুব বিশ্বাস কিনা আমি জানি না। আমি চেষ্টা করি বিশ্বাস করতে। সৎ আর সাচ্চা থাকতে চাই।

—সৎ আর সাচ্চা? নিজের মনেই তিনি কথাগুলো দু একবার উচ্চারণ করতেন।

আমাকে দেখতেন। আমি তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে হেসে বলতেন, তুমি ঠিকই বলেছো। তোমার মত উমরে তুমি যা ভাবো, সেই রকমই ভাবতাম আমি। লেকিন, তারপর সব কিছু ওলোট-পালট হয়ে গেল।

—কি হয়েছিল? সাগ্রহে জানতে চেয়েছিলাম।

—কুছ নেহি। হাসতেন তিনি। বলতেন, তুমি খুব ভাল মেয়ে। তুমি ভাল থাক।

এই ভাবেই দিন কাটতো। রাবেয়া বেগমের কাছে প্রায়ই যেতাম। কিছুটা সময় কাটিয়ে আসতাম। তাঁর শান্ত মূর্তি, ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা তাঁর প্রতি আমার আকর্ষণটা দিন দিন বাড়িয়ে দিয়েছিল। কখনো গিয়ে গবাক্ষের ফাঁক দিয়ে দেখতাম তিনি চোখবুজে জপ করছেন, বন্ধ চোখের ফাঁক দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরছে। কখনো দেখতাম ধ্যানস্থ হয়ে তিনি বসে আছেন। বাহ্যজ্ঞান নেই। দেখে চুপি চুপি চলে আসতাম।

একদিন তিনি বলেছিলেন, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক এসব সত্যি-সত্যি আছে?

অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলাম, আমি জানি না।

তিনি বলেছিলেন, আমি জানি, বুঝলে; সব আছে। আজ আমীর কাল ফকির বা আজ ফকির কাল আমীর। কথাগুলো বোধ হয় মিথ্যে নয়। খোদা যব দেতা ছপ্পর ফুড়কে দেতা। দেখেছি, কর্মফল মানুষকে ভোগ করতেই হয়। যেমন ধরো, জোয়ানী বয়সে এই পাপপুণ্য আমাদের মনে রেখাপাত করে না। সব কিছুকেই অস্বীকার করার প্রবণতা আমাদের মনে দেখা দেয়। সেটাও অবশ্য বয়সের ধর্ম; আমাদের মনের গঠন। তারপর বেলা বাড়ে, দিন যায়, ছায়া ফেলে সন্ধ্যা। আমরা ভাবতে বসি। কি করেছি? কেন করেছি? জীবনে ভোগটাই কি সব? ত্যাগের কি কোন মূল্যই নেই? কেন করেছি অজস্র অন্যায়? একটু সংযত হলে জিন্দেগীটা তো এভাবে বরবাদ হয়ে যেত না? হ্যাঁগো মেয়ে, যা বলছি সত্যি। জ্ঞান দিচ্ছিনা। শুধু এইটুকু বলছি, নিজের ওপর বিশ্বাস রেখো।

অবাক হয়ে বলেছিলাম, এসব কথা কেন বলছেন?

হেসেছিলেন তিনি। আমার গায়ে হাত রেখে বলেছিলেন, কিছু মনে করোনা।

বলেছিলাম, আপনিতো ভাল কথাই বললেন।

—ভাল! হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি ভাল, তাই আমার কথাগুলো শুনতে তোমার ভাল লেগেছে। তুমি যদি আমি হতাম, ভাল লাগতো না। সত্যি তুমি ভাল।

মনে হয়েছিল তিনি যেন প্রসঙ্গ পাল্টালেন। চুপ করেছিলাম। মনটা হঠাৎ-ই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম আজ কেন তিনি পাপ-পুণ্যের প্রসঙ্গ তুললেন। এমনতো কোন দিন করেন না। অনেক দিন তাঁর কাছে আসছি,

যদিও তখন ছোট ছিলাম। হাসতেন। গল্প বলতেন। গল্প আমাকে টানে। সে যে-কোন গল্পই হোকনা কেন। রাজা বাদশা, জিনপরী বা মানুষের গল্প। ভাল লাগে শুনতে। শুনতে শুনতে একাত্ম হয়ে যাই।

শবনম, রাবেয়া বেগম যখন তাঁর জীবনের কথা বলেছিলেন, তার কিছুদিন আগে থেকে তাঁর মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছিলাম। সেই সময় কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠতেন তিনি। ধর্ম, আল্লা, দোজক, কর্মফল নিয়ে অনেক কথাই বলতেন। আশ্চর্য হতাম। ভাবতাম, ধীর-স্থির, শান্ত-সংযত বেগমের একি হল! এমন আচরণ কেন করছেন তিনি?

তারপর একদিন, তখন বর্ষা সবে মাত্র শেষ হয়েছে। আসমানে শরতের মেঘের আনাগোনা। একদিন সকাল হবার কিছু পরে হঠাৎ-ই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, শয্যার ওপর নিথর হয়ে বসে আছেন তিনি। মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলাম। আগের দিন স্বাভাবিক দেখেছিলাম তাঁকে, মাত্র একটা রাতে কি বিরাট পরিবর্তন! আর কটা বছরে এসময় কোন দিনই তাঁকে শয্যায় দেখিনি। অসুস্থ শরীরেও ছোট চৌকিটায় বসে জপ করেন।

কাছে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলেছিলাম, জিউ, কি হয়েছে আপনার? তবিয়ৎ ঠিক নেই?

তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমাকে দেখলেন। বললেন, আমি ঠিক আছি বেটী। আমার কিছু হয়নি।

বললাম, না, জিউ। নিশ্চয়ই আপনার কিছু হয়েছে। কি হয়েছে আমাকে বলুন।

—বলবো। নিজেকে নিজেই কথাটা বললেন যেন তিনি। শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম তিনি নিজেকে সামলে নিচ্ছেন। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। এক সময় বললেন, আচ্ছা, আমাকে তুমি অনেকদিন দেখছো, আমাকে দেখে কি মনে হয় তোমার? সাচ বলো।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কান গরম হয়ে উঠেছিল। কষ্টে নিজেকে শান্ত করে বললাম, দেখুন ঝুট বলতে আমি শিখিনি। আর যাকে আমার ভাল লাগে তার সঙ্গেই মিশি। আপনাকে আমার ভাল লাগে বলেই আপনার কাছে আসি।

—কেন ভাল লাগে আমাকে তোমার? বললেন তিনি। আমি আল্লাহকে ডাকি, দিনরাত্রি জপের মালা ঘোরাই বা দিনে একবার আহার করি; সেইজন্য?

বললাম, এগুলো আপনাকে ভাল লাগার কারণ কিন্তু নয়।

তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে জানতে চাইলেন, তাহলে?

—আমি জানি না। মৃদু কণ্ঠে বললাম আমি।

তুমি ঠিক বললে না বেটী। বিনা কারণে কেউ-ই কিছু করে না। সব কিছুর মধ্যেই কিছু-না কিছু কারণ লুকিয়ে আছে। আমাকে তোমার ভাল লাগারও একটা

কারণ আছে। যেমন, তোমাকে আমার ভাল লাগার। তুমি এখন বড় হয়েছো, অনেক শান্ত আর শ্রীময়ী হয়ে উঠেছো, লেকিন, তোমাকে সেই প্রথম দেখা চঞ্চল কিশোরীকে এখনো আমি তোমার মধ্যে খুঁজে পাই। তোমার কালো চোখের তারায় এখনো দুরন্ত আহ্বান। বল, আমাকে তোমার কেন ভাল লেগেছিল ?

মনের গভীরে ডুব দিয়েছিলাম। ভেসে উঠেছিল শান্ত স্নিগ্ধ স্নেহময়ী মূর্তিটি আর পান্না ঝরানো হাসি। বলেছিলাম সেকথা তাঁকে।

শুনে একটু নীরব ছিলেন তিনি। এক সময় পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, বেটী, মনে কর তোমার খুবই প্রিয়জন, যাঁকে তুমি শ্রদ্ধা করো, ভালবাস, যাঁর সততা-নিষ্ঠায় তুমি মুগ্ধ; হঠাৎ কোন কারণে জানতে পারলে তুমি এতদিন, যা জেনে এসেছো, তা কত মিথ্যা, ভুল। তখন কি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, ভালবাসা তোমার অটুট থাকবে ?

শুনে একটু চুপ করে রইলাম। তাঁর দিকে চাইতেই তিনি মাথা নিচু করে নিলেন। মৃদু কণ্ঠে বললাম, জিউ, আপনি আজ কেন এসব কথা বলছেন জানি না ধরুণ আপনার কথা। আপনাকে কয়েক বছর আমি দেখছি। দেখে, আপনার প্রতি যে শ্রদ্ধা আমার মনে জন্মেছে, কোন কারণে আজ যদি আপনার সম্পর্কে বিরূপ কিছু শুনি তাহলে দুঃখ পাব ঠিক কথা কিন্তু আপনার প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধাটা এতটুকু কমবে না।

কথা শেষ করে তাঁর মুখের দিকে চাইতেই দেখলাম চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল পড়ছে। বললাম, একি জিউ, আপনি কাঁদছেন ?

হাত বাড়িয়ে একটা হাত আমার চেপে ধরলেন তিনি। বললেন, বেটী কাথার নয়, এ আমার আনন্দের অশ্রু। দীর্ঘদিন আল্লাহকে ডেকে আমি যা পাইনি, তুমি আজ তাই দিলে আমাকে।

অবাক হয়ে বললাম, এ আপনি কি বলছেন ?

—সচ বলছি বেটী। চোখ মুছলেন তিনি। বললেন, বেটী এ জিন্দেগীটায় গুণাহের শেষ নেই আমার। যেদিন বুঝলাম, আমার মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা সুরু হয়েছিল। আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যেতাম। সেই সময় আল্লাহকে ডাকতে বললেন একজন। পথ দেখালেন। নতুন জীবন সুরু হল আমার। নিষ্ঠাভবে আমি নিয়ম মেনে চলতে লাগলাম। লেকিন, কোথায় শান্তি ? প্রতিরাত্রে আমার পেছনে তাড়া করে ফিরতে লাগলো আমার কৃতকর্ম—আমার পাপ। বছরের পর বছর বিনিদ্র কাটছে আমার। লেকিন আজ !

তিনি চুপ করলেন। আমি চেয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে।

সেদিন নয়, তারপর একদিন বললেন তিনি। তখন তিনি অনেক স্বাভাবিক। শরৎ শেষের অপরাহ্ণের ম্লান আলোয় তার বন্ধ ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শোনালেন একটি মেয়ের জীবনের কথা। মেয়েটি রাবেয়া বেগম। যখন সে নিতান্ত

বালিকা একদিন রাতের অন্ধকারে কারা যেন রে-রে করে হানা দিল। আম্মার পাশে শুয়ে সে তখন গভীর ঘুমে অচেতন। অন্য পাশে শুয়ে আছে আব্বাজান। দরোজা ভেঙ্গে কারা যেন ঘরে ঢুকলো। ঘুম ভেঙ্গে মশালের আলোয় বিস্মিত বালিকা দেখল, মুখে কাপড় বাঁধা কজন দস্যু ঘরে ঢুকলো। আব্বাজান বাধা দিতে গিয়ে লুটিয়ে পড়লো। আম্মাকে তুলে নিয়ে চলে গেলে লোকগুলো। তারপর সব শান্ত স্বাভাবিক।

আব্বাজান জিন্দা ছিল। গর্দানের বদলে একটা হাত খোয়াতে হয়েছিল তাঁকে। বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকার পর সুস্থ হয়ে উঠেছিল। সুস্থ হয়ে আম্মার অনেক সন্ধান করেছিল আব্বাজান। সন্ধান মেলেনি।

দিন কেটে ছিল। বড় হয়েছিল রাবেয়া। কৈশোর শেষে যৌবনের সাড়া জেগেছিল দেহে মনে। আব্বাজান তার সাদীর জন্য পাত্র ঠিক করেছিল। পাশের গ্রামের তার মতই এক সম্পন্ন চাষীর ছেলে সোলেমান। রাবেয়া দেখেছিল। ভাল লেগেছিল সোলেমানকে। সাদীর দিন ঠিক হয়েছিল মহরম মাসে (বৈশাখে)।

কিন্তু দিল হজ্ এ (চৈত্রে) একটা নতুন সম্বন্ধ এল। জায়গীরদার আরফান মীর্জা রাবেয়াকে সাদী করতে চান। প্রমাদ গুণেছিল আব্বাজান। কিন্তু কোন উপায় ছিল না। রমজান মাসের (বৈশাখে) এক দুপুরে প্রৌঢ় আরফান মীর্জা রাবেয়াকে সাদী করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর হারেমে।

তারপরের দিনগুলোর কথা চিন্তা করতে পারে না রাবেয়া। সদ্য যুবতী দেহটাকে কিছুদিন ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেয়েছিল মানুষটা। তারপর অবহেলায় ঠেলে দিয়েছিল দূরে। আর ততোদিনে আরফান মীর্জার হারেমের স্বরূপ কিছুটা প্রকাশ হয়েছিল তার কাছে। সেই সঙ্গে মানুষটার স্বরূপ-ও।

জায়গীরদার হলে কি হয়, আরফান মীর্জার কলিজায় বইছে মুঘল রক্ত। বাবর, হুমায়ুন একই বংশের মানুষ। দিল্লীর মসনদে তখন কায়েম হয়েছে বাদশাহ আকবর শাহ। সিন্ধু প্রদেশের জায়গীরটা আরফান মীর্জার আব্বাজানকে দিয়েছিলেন হুমায়ুন। হাসান মীর্জা যোদ্ধা এবং সৎ মানুষ ছিলেন। যদিও তাঁর কয়েকজন বিবি ছিল। কিন্তু তিনি সুষ্ঠুভাবে জায়গীর পরিচালনা করতেন। প্রজাদের পীড়ন করতেন না। তাদের দেখাশোনা করতেন।

হঠাৎই একদিন হাসান মীর্জার ইন্তেকাল হল। তাঁকে কবর দেবার আগেই তাঁর চার পুত্রের মধ্যে বিরোধ বাঁধলো। শেষে রক্তারক্তি। আরফান মীর্জা ছিলেন কনিষ্ঠ সন্তান। বড় তিন ভাইকে খতম করেছিলেন তিনি। জায়গীরদার বনলেন।

হাসান মীর্জা থাকাকালীন আরফান তাঁর দলবল নিয়ে প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালাতেন। এবার অত্যাচারের মাত্রা বাড়লো। দিন দিন ভরে উঠতে লাগলো হারেম। আবার কিছুদিন পরে-পরে কিছুটা খালিও হয়ে যেত। আরফান মীর্জা তাঁর হারেমের কিছু অবাধ্য বিবি আর দাসীদের উপহার দিতেন ইয়ার বন্ধু আর

দলের কাছের লোকেদের ।

একদিন রাবেয়াকেও উপহার দিলেন আরফান মীর্জা। দোস্ত জালাল খানের হাতে তুলে দিলেন রাবেয়াকে। বললেন, দোস্ত তোমার বিবির চেয়ে নিশ্চয়ই খাপ সুরত। তোমার পাওনা মিটিয়ে দিলাম।

জালাল খান রাবেয়াকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। সেখানেই দেখা হল আম্মাজান সাইদার সঙ্গে। দুজনেই দুজনকে দেখল। চিনতে পারল। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ভেঙে পড়লো কান্নায়।

আরফান মীর্জার ছোট বেলার বন্ধু জালাল খান। কিন্তু দুজনের বিপরীত চরিত্র। একজন ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির। অন্যজন অত্যাচারী, লম্পট। আরফান মীর্জা বন্ধুর ঘর ভেঙে ছিলেন। জালাল খানের বিবি আত্মঘাতী হয়েছিলেন। দেশ ছেড়ে চলে যাবার চেষ্টা করেছেন জালাল খান। পারেননি। কড়া নজরদারীতে রাখা হয়েছিল তাঁকে। শেষে রাবেয়াকে দিয়ে ঋণ শোধ করেছিলেন আরফান মীর্জা।

মা এবং মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছিলেন জালাল খান। আগলে রেখেছিলেন কিছু-দিন। কিন্তু হঠাৎ-ই তাঁর ডাক এল। চলে গেলেন তিনি। যাবার আগে রাবেয়াকে দিয়ে গেলেন সব কিছু।

আরফান মীর্জা দোস্তের মৃত্যুর পর মা আর মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন আবার সুরু হল যন্ত্রণার দিন। আম্মা কয়েক দিন পরেই নিজের জিন্দেগীটাকে খতম করে দিল। রাবেয়াও তাই চেয়েছিল, পারল না। বুকে তার আগুন। পথ খুঁজতে লাগলো সে।

অবশেষে পথের সন্ধান পেল। জালাল খানের সম্পদের কিছুটা খরচ করে এক নতুন খেলায় মেতে উঠলো সে। আরফান মীর্জার একমাত্র সন্তানকে রূপ আর যৌবনের মোহে ভুলিয়ে আব্বাকে খতম করালো। গুপ্ত হত্যা করালো আরফান মীর্জার একমাত্র সন্তান নসরৎ মীর্জাকে। তারপর...

রাবেয়া বেগম তারপর অনেকক্ষণ চুপ করেছিলেন। এক সময় বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল। ম্লান কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, তারপর দিন কাটতে লাগল। সিন্ধু প্রদেশের জায়গীরটা বাদশাহ আকবর শাহ মীর্জা গোষ্ঠীর-ই একজনকে দিয়েছিলেন। তিনি ভাল লোক ছিলেন। তারপর কেমন করে যেন একদিন দিল্লী হারেমে আশ্রিতা হয়ে এসেছিলাম। সেখান থেকে এসেছি আগ্রায়। বয়েস বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে যন্ত্রণা। আল্লার দোয়া প্রার্থনা করছি। দিনরাত ধর্মকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছি। লেকিন, অতীতকে ভুলতে পারলাম না।

পাপের জ্বালায় জিন্দেগীভর জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেলাম। কোথায় শান্তি ?

একটু চুপ করে ছিলেন তিনি। আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে ছিলেন অনেকক্ষণ। অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। মৃদু কণ্ঠে ডেকেছিলেন, বেটী !

আমি তাঁর দিকে চাইতে পারিনি।

তিনি বলেছিলেন, তোমার কাছে একটা জিনিস আমি চাইছি বেটী। আমাকে তুমি মনে রেখো। আর...

আমি তাঁর একটা হাত ধরেছিলাম।

তিনি আমার মুখের দিকে চেয়েছিলেন। হাসি ফুটে ছিল। তারপর খুব আস্তে বলেছিলেন, বেটী, আমি বুঝতে পারছি দুনিয়ায় থাকার মেয়াদ আমার শেষ হয়ে এসেছে। যাবার আগে তোমাকে একটা জিনিস আমি দিয়ে যেতে চাই, নেবে?

করুণ আকুতি ফুটে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠে। আমি কি বলবো স্থির করতে পারিনি। তিনি বলেছিলেন, বেটী, জালালখান আমাকে বেটী বলেছিলেন। তাঁর দৌলত আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলাম সৎ কাজে লাগাবো। সে সুযোগ আমার আসেনি। আমি তোমাকে দিয়ে যেতে চাই। আমার বিশ্বাস তুমি নিশ্চয় সৎ কাজে লাগাতে পারবে সৎ মানুষটার দৌলত। নিয়ে আমাকে মুক্তি দেবে বেটী?

করুণ দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে চেয়েছিলেন। আমি 'না' করতে পারিনি। নিয়েছিলাম দু হাত পেতে। আর সৎ মানুষটার দৌলত আমি সৎ কাজের জন্য আর একজনের হাতে তুলে দিয়েছি।

শবনম, জিন্দেগীতে দুরন্ত কান্নায় সেদিন আমি ভেঙ্গে পড়েছিলাম। বলবন এসে আমাকে সংবাদটা দিয়েছিল। গিয়েছিলাম, দেখেছিলাম তাঁকে। ঘুমিয়ে আছেন তিনি। রাবেয়া বেগম। দেখতে দেখতে বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত অশ্রুর ঢল নেমেছিল আমার দুচোখ বেয়ে। আমি কেঁদেছিলাম।

১৯

বাদশাহ আকবর শাহের আদরের সেখুবাবা বাদশাহ বনলেন (৩রা নভেম্বর, ১৬০৫ খ্রীঃ)। সেলিম হলেন নূরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী। অভিষেকের প্রথম দিনেই জাহাঙ্গীর বহু বন্দীকে কারামুক্ত করলেন। নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করলেন এবং কয়েকটি নতুন আইন প্রবর্তন করলেন। ফলে শাস্তি স্বরূপ নাসাকর্ণ ছেদন, সুরা ও সুরাজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন, জাহাঙ্গীরের জন্মদিন বৃহস্পতিবারে ও আকবরের জন্মদিন রবিবারে পশু হত্যা নিষিদ্ধ হল। পথের পাশে মসজিদ, সরাই ও কূপ নির্মাণ, প্রধান নগরে জনসাধারণের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন রাজ্যের কর্তব্য বলে ঘোষিত হল।

শবনম, মসনদে বসতেন সেলিমের পুত্র খসরু। সেই চেষ্টাই হয়েছিল। মৃত্যু-পথযাত্রী বাদশাহ আকবরের ইঙ্গিতে মসনদে বসেছিলেন সেলিম। কিন্তু মাত্র পাঁচ মাস পরে আগ্রার প্রান্তে সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি দর্শনের অভিপ্রায়ে খসরু সামান্য সংখ্যক দেহরক্ষী নিয়ে আগ্রা ত্যাগ করে দিল্লীর দিকে যাত্রা করলেন। শেষে

সসৈন্যে লাহোরে উপস্থিত হলেন খসরু।

অনেক আশা নিয়ে খসরু লাহোরে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু কিল্লাদার খসরুর পক্ষে যোগ দিলেন না। এদিকে জাহাঙ্গীর সংবাদ শুনে সসৈন্যে লাহোরের দিকে যাত্রা করলেন। পিতা পুত্রের যুদ্ধে খসরু পরাজিত হয়ে কাবুলের দিকে পালিয়ে গেলেন। পথে চন্দ্রভাগা নদী পার হবার সময় বন্দী হলেন বাদশাহী সৈন্যদের হাতে। শৃঙ্খলিত খসরুকে লাহোরের দরবারে আনা হল। সহযোগীদের বিচার হল। বিচার হল শিখ গুরু অর্জুনের। তাঁর অপরাধ বিদ্রোহী আশীর্বাদ প্রার্থীকে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন। বিচারে অর্থদণ্ড হল তাঁর। সাধক অর্থদণ্ড দিতে অস্বীকার করলেন। হাসি মুখে মেনে নিলেন প্রাণদণ্ড।

সেই বছরই (১৬০৬ খ্রীঃ) জাহাঙ্গীরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে একটা ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য জাহাঙ্গীরকে হত্যা করে খসরুকে মসনদে বসানো। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে খসরুর কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাঙ্গীর নেতাদের হত্যা করলেন এবং খসরুর দুটি চক্ষু নষ্ট করে দিলেন। অবশ্য পরে তিনি সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হয়ে পারস্য থেকে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ আনিয়ে চিকিৎসা করিয়েছিলেন। অবশ্য মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি কারাগারেই ছিলেন।

কবছর পর (১৬১১ খ্রীঃ) জাহাঙ্গীর শের আফগানের বিধবা মেহেরুন্নিসাকে সাদী করলেন। মেহেরুন্নিসা হলেন নূরজাহান।

ছোটবেলায় নূরজাহানকে দেখেছি ক'বার। অতি সাধারণ। কিন্তু অদ্ভুত একটা শান্তশ্রী ছিল তাঁর মধ্যে। ধূসর স্মৃতি। রাবেয়া বেগমের সঙ্গে কোথায় যেন মিল ছিল। কিন্তু একদিন তিনি ছিলেন বহু ষড়যন্ত্রের নায়িকা, শাজাহান এবং মহবৎ খানের বিদ্রোহের নেপথ্য রচয়িত্রী, জাহাঙ্গীরের বন্ধন মুক্তিকারিণী, অন্তিম জীবনে ক্ষমতাচ্যুতা এবং লাহোরে বাদশাহের সমাধির পার্শ্বে চির নিদ্রিতা।

বড় হয়ে অনেক কথাই শুনেছি নূরজাহান সম্পর্কে। এখনো তাঁর কথা হারেমে আলোচিত হয় এই জন্যই নামে বাদশাহ ছিলেন জাহাঙ্গীর, নেপথ্যে থেকে রাজ্য পরিচালনা করতেন নূরজাহান।

শুনেছি, প্রথম জীবনেই নাকি মেহেরুন্নিসাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সেলিম। সাদী করতে চেয়েছিলেন। বাদশাহ আকবর রাজি হননি। শেষে মসনদে বসেই জাহাঙ্গীর শৈশবের দুধ ভাই কুতুবউদ্দীনকে বাঙ্গলার সুবাদার করে বর্দ্ধমান পাঠালেন বর্দ্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানকে শায়েস্তা করার জন্য। সেখানে শের আফগানের হাতে নিহত হলেন কুতুবউদ্দীন। সুবাদারের সৈন্যরাও বদলা নিল খুনের। সকন্যা মেহেরুন্নিসাকে নিয়ে আসা হল আগ্রা হারেমে। অথচ নূরজাহানের আব্বা মীর্জা ঘিয়াস তখন দিওয়ান আর ভাই আসফ খানও উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী। শুধু পাঁচ বছর মুঘল হারেমে বন্দিনীর জীবন কাটিয়েছেন

মেহের্‌ন্নিসা। শেষে সালিমা বেগমের চেষ্টায় সাদী। আর সাদীর সময় বাদশাহের উমর বিয়াল্লিশ, বেগমের সাইত্রিশ। যৌবন অতিক্রান্ত প্রায়। শুনেছি তাঁর অনুপম স্বাস্থ্য, অনবদ্য সৌন্দর্য বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় নি।

দীর্ঘ দশ বছর (১৬১২ খ্রীঃ—১৬২২ খ্রীঃ) নূরজাহান মুঘল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। আর সে যোগ্যতা নিশ্চয়ই তাঁর ছিল। যদি তা না থাকতো তাহলে আমীররা নারীর আধিপত্য কিছুতেই স্বীকার করতেন না বলেই আমার মনে হয়। এমন কি মুদ্রার এক পিঠে তাঁর নাম মুদ্রিত হ'ত।

তবে ভুলও তিনি করেছিলেন। ভাই আসফখানের মেয়ে আর্জুমন্দবানু বেগমের যেমন সাদী দিয়েছিলেন তিনি খুরমের সঙ্গে, তেমনি কন্যা লাডলীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন শাহাজাদা শাহরিয়রের এবং খুরমকে হটিয়ে শাহরিয়রকে বসাতে চাইলেন মসনদে। ফলে তাঁর ক্ষমতার স্তম্ভ ভাই আসফখান হলেন অসন্তুষ্ট। অন্য দিকে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের বিশ্বস্ত এবং বহু যুদ্ধের সফল সেনাপতি মহবৎ খান নূরজাহানের আদেশে আমীর উল-উমরা পদ থেকে বিচ্যুত হলেন। আর ঠিক এই সময়েই (১৬২১ খ্রীঃ) নূরজাহান চক্রের আর দুটি স্তম্ভ আব্বা ও আম্মা মারা গেলেন। নূরজাহান্ হয়ে পড়লেন একাকিনী।

সুরা এবং আফিমের নেশায় ঘোর কাটাতে না পারলেও জাহাঙ্গীর রাজ্য বিস্তারে মন দিয়েছিলেন। বিদ্রোহী বাঙ্গলাকে অনেকটা শান্ত করেছিলেন তিনি। তাঁর রাজত্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা মেবার বিজয়। মেবারের অধিপতি কোনদিন মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করেননি। অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন জাহাঙ্গীর। অবশ্যই মহবৎ খানের জন্য। অমর সিংহ জাহাঙ্গীরের আনুগত্য স্বীকার করে সম্মানজনক সর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন (১৬১৫ খ্রীঃ)। সন্ধির সর্ত হল,—চিতোর অমরসিংহকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মেবারের রাণাকে অন্যান্য বশংবদ সামন্তদের মত মুঘল দরবারে উপস্থিত হতে বা বাদশাহের হাতে কন্যা সমর্পণ করতে হবে না। বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ বাদশাহ রাণা অমর সিংহ ও তাঁর পুত্র করণ সিংহের মর্মর মূর্তি আগ্রার রাজোদ্যানে স্থাপন করেছিলেন।

আকবরের সময় আহম্মদ নগরের উত্তরাংশ বিজিত হয়েছিল, কিন্তু দক্ষিণাংশ স্বাধীন ছিল। এই স্বাধীন অংশে মালিক অম্বর নামে এক হাবসী মন্ত্রী শাসন পরিচালনা করতেন। বিচক্ষণ মালিক অম্বর সেনাবাহিনীকে গুপ্তযুদ্ধ শিক্ষাদান করেন। ফলে মুঘল বাহিনী বারবার বিধ্বস্ত হ'ত। বহু চেষ্টা করেও শাহজাদা পরভেজ আহম্মদ নগর জয় করতে পারেননি, কিন্তু শাহাজাদা খুরম (১৬১৬ খ্রীঃ) আহম্মদ নগরের রাজধানী এবং কয়েকটি নগর জয় করেন। এই জয়ে উল্লসিত জাহাঙ্গীর এত সন্তুষ্ট হলেন যে, তিনি খুরমকে শাজাহান (পৃথিবীপতি) উপাধি এবং ত্রিশ হাজারী মনসবদার নিযুক্ত করেন এবং বাদশাহের পাশে দ্বিতীয় সিংহাসনে বসার সম্মান প্রদান করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে অপর একটি উল্লেখযোগ্য

ঘটনা হল কাঙড়া দুর্গজয়। শাহজাদা খুরম কাঙড়া দুর্গ জয় করেছিলেন।

শবনম. বাদশাহ জাহাঙ্গীর তখন অসুস্থ। স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্য কাশ্মীরে আছেন। পারস্যরাজ শাহ আব্বাস কান্দাহার আক্রমণ করলেন (১৬২১ খ্রীঃ)। ইতিমধ্যে কারাগারে গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হলেন খসরু। হত্যাকারী মুহম্মদ রেজা রক্ষীদের হাতে ধরা পড়লো। রটে গেল মুহম্মদ রেজাকে শাজাহান নিযুক্ত করেছিলেন। শুনলেন জাহাঙ্গীর। তবু পারস্যের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য শাজাহানকে আদেশ দিলেন তিনি। শাজাহান কিন্তু কান্দাহার গেলেন না। বাদশাহের আদেশ অমান্য করে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। আবদুর রাহিম খান-ই-খানান শাজাহানের পক্ষ সমর্থন করলেন।

বিদ্রোহ যেন মুঘল বংশের সংক্রামক ব্যাধি। জাহাঙ্গীর বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে মসনদে বসেছিলেন। সামান্য কয়েক মাস পরেই বিদ্রোহ করেছিলেন খসরু। জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র পরভেজ ছিলেন মদ্যপায়ী, চতুর্থ পুত্র শাহরইয়র অকর্মণ্য। এই অকর্মণ্য জামাতাকেই মসনদে বসানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন নুরজাহান। অথচ সকলেই চাইছিলেন জাহাঙ্গীরের পর বাদশাহ হোন শাজাহান।

শাজাহানের কান্দাহার না যাওয়ার কারণ, দূরে গেলেই নুরজাহান ঠিক জামাতাকে মসনদে বসিয়ে দেবেন। আর কান্দাহার না যাওয়ার জন্য ক্রুদ্ধ জাহাঙ্গীর বিখ্যাত সেনাপতি মহবৎ খানকে পাঠালেন শাজাহানকে দমন করার জন্য। শাজাহান দিল্লীর কাছে বিলোচপুরে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যে। দাক্ষিণাত্য থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন বাঙ্গলায়। প্রায় তিন বছর তিনি বাঙ্গলায় ছিলেন। আবার বাঙ্গলা থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করেন (১৬২৬ খ্রীঃ) এবং তাঁর দুই পুত্র বালক দারা শুকো ও ঔরংজীবকে প্রতিভূ স্বরূপ রাজদরবারে গচ্ছিত রেখে মমতাজ ও মোরাদকে নিয়ে নাসিকে আশ্রয় নেন। কিন্তু পরের বছরই মহবৎ খানের সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। নুর-জাহানের ষড়যন্ত্রই মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম সেনানায়ক বিদ্রোহ করেছিলেন।

নুরজাহান বুঝতে পেরেছিলেন পাঠান মহবৎ খানের শক্তি খর্ব না করতে পারলে শাহরইয়রের পথে মসনদে বসা সম্ভব হবে না। মহবৎ খান ছিলেন পর-ভেজের পক্ষপাতী। সেইজন্য তিনি মহবৎ খানকে বাঙ্গলার সুবাদার নিযুক্ত করে-ছিলেন এবং শাজাহানের বিদ্রোহ দমনে ব্যয়িত হিসাব দাখিল করার নির্দেশ দিয়ে-ছিলেন। এবং নির্দেশ অমান্য করলে দরবারে উপস্থিত হবার আদেশ দিলেন।

জাহাঙ্গীর তখন কাবুলের পথে ঝিলম নদীর তীরে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করছিলেন। মহবৎ খান বাঙ্গলার পথে যাত্রা না করে রাজপুত সৈন্যদের নিয়ে জাহাঙ্গীরের কাছে উপস্থিত হলেন। জানালেন অভিযোগ। মহবৎ খানের হাতে বন্দী হলেন জাহাঙ্গীর।

সংবাদ এল আগ্রায়। নূরজাহান কাবুলের পথে যাত্রা করলেন এবং ঝিলম নদী অতিক্রম করে অপর তীরে শিবির স্থাপন করলেন। কিন্তু যুদ্ধের পরিবর্তে নূরজাহান মহবৎ খানের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। বন্দিনী নূরজাহান জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মিলিত হলেন।

ইতিমধ্যে মহবৎ খানের রাজপুত সৈন্য এবং মুঘল সৈন্যদের মধ্যে মতান্তরের ফলে যুদ্ধ সুরু হল। মহবৎ খানের জনপ্রিয়তা কমতে লাগলো। মহবৎ খান লাহোরে ফিরে এলেন এবং বাদশাহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করলেন। জাহাঙ্গীর মহবৎ খানকে ছাড়লেন না। দাক্ষিণাত্যে শাজাহানের বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠালেন তাঁকেই। দাক্ষিণাত্যে পেঁছে মহবৎ খান শাজাহানের সঙ্গে যোগ দিলেন।

বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করলো। কিন্তু এই বিদ্রোহ মীমাংসা হবার আগেই কাশ্মীর থেকে আগ্রা ফেরার পথে পরলোক গমন করলেন বাদশাহ জাহাঙ্গীর (নভেম্বর, ১৬২৭ খ্রীঃ)। লাহোরের কাছে শাহদারায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হল।

শবনম, তোমার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগবে পথের উত্তরে এত কথা আমি লিখেছি কেন? প্রশ্ন জাগাটাই স্বাভাবিক। বাদশাহ বাবর থেকে জাহাঙ্গীর। সকলের কথাই সাধ্যমত লিখেছি। লিখলাম এই জন্যে মুঘলবংশে যেন অভিশাপ জড়িয়ে আছে ছায়ার মত। লোভ আর লালসা। রক্তের সম্পর্ক কত মিথ্যা। পুত্র ক্ষমতা লাভের জন্য বিদ্রোহ করছে পিতার বিরুদ্ধে। পিতা পুত্রকে অন্ধ করে দিচ্ছেন। কি সুন্দর, তাই না শবনম?

আমি মুঘল বংশে জন্মেছি, শরীরে বইছে আমার তৈমুর আর চেঙ্গিজের রক্তধারা। একদিন আমার ব্যবহারে ছিল হিংস্রতা। অনেক কষ্টে আমি নিজেকে সংশোধন করেছি। পথ দেখিয়ে ছিলেন সিত্তীউন্নিসা।

সেলিম ছিলেন সুরাসক্ত। অবশ্য সে সুরা বাদশাহ আকবর শাহ প্রথম তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। অথচ মানুষটা ছিলেন মার্জিত, রুচিবান, শিক্ষিত, শিল্পানুরাগী, সঙ্গীত-প্রিয়। বহুগুণ ছিল তাঁর। একদিকে তিনি ছিলেন গুণীর পৃষ্ঠপোষক, উদার, বন্ধুবৎসল, জীবে দয়াবান, প্রজার মঙ্গলে সতত উন্মুখ। অন্যদিকে সময়ে সময়ে সংকীর্ণচিত্ততা, হিংস্রস্বভাব এবং ধর্মে অনুদারতার পরিচয় দিতেন। অথচ তিনি ছিলেন হিন্দু যোগী বাবালালের সঙ্গকামী ভক্ত। হিন্দুর বৈশাখী, হোলি, শিবরাত্রি প্রভৃতি উৎসবে যোগ দিতেন; অথচ কাঙড়ায় হিন্দুর বিগ্রহ ধ্বংস করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন কোন হিন্দু মুসলমান নারী বিবাহ করতে পারবে না। হিন্দু মুসলমান নারী বিবাহ করে থাকলে হয় ইসলাম ধর্মগ্রহণ করতে হবে, না হলে স্ত্রী পরিত্যাগ করবে। দলপৎ রায় তাঁর মুসলমান স্ত্রী পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিলেন, তাঁর স্ত্রীও স্বামী পরিত্যাগ করতে চাননি। অপরাধের শাস্তি অঙ্গচ্ছেদ করে দলপৎ রায়কে হত্যা করা হয়েছিল।

অদ্ভুত চরিত্র জাহাঙ্গীরের। প্রথম জীবনে দীন-ই-ইলাহীর উদার মতবাদ গ্রহণ

করেছিলেন। প্রচার করেছিলেন একজন পুরুষের একটিমাত্র স্ত্রী থাকবে ; কিন্তু তিনি নিজে শতাধিক নারীকে বিবাহ করেছিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে প্রথম কয়েক বছর বাদে নুরজাহান তাঁর জীবনে আসার পর থেকে রাজ্য পরিচালনায় অনেক উন্নতি হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে নুরজাহান নিজেও ছিলেন সামাজিক, দরিদ্রের বান্ধবী, অত্যাচারিতের ত্রাণকর্ত্রী। শেষজীবনে জাহাঙ্গীরের অত্যধিক মদ্যপানের জন্য নষ্ট স্বাস্থ্য সেই সঙ্গে নুরজাহানের অপরিসীম ক্ষমতালোভ দিল্লীর রাজনৈতিক অবস্থা জটিল এবং অনিশ্চিত করে তুলেছিল। বহু দোষ থাকা সত্ত্বেও বাদশাহ জাহাঙ্গীর ছিলেন হৃদয়বান শাসক।

২০

শবনম, আজ রমজান মাসের প্রথম দিন। শাবানের শেষদিন গেছে। দুটো পত্র পেয়েছিলাম গতকাল। একটা জাহানারার অন্যটা বাদশাহ ঔরংজীবের। তাঁর পত্রে দু-একদিনের মধ্যেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে লিখেছে। বাদশাহ ঔরংজীব তাঁর পত্রে জানিয়েছেন, অত্যধিক কাজের চাপে তিনি এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারছেন না। আর জাহানারার সঙ্গে সিক্রী যাব কি-না আর একবার যেন আমি চিন্তা করে দেখি। পরে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

বাদশাহের পত্রটা খুঁটিয়ে পড়েছিলাম। চিন্তা করেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, আমি জাহানারার সঙ্গে তাঁর নাগালের বাইরে চলে যাই এটা তিনি চান না। অর্থাৎ সন্দেহ। এই সন্দেহ বাতিক ঔরংজীবকে সুস্থ-স্বাভাবিক থাকতে দিল না। সবকিছুতেই তাঁর অবিশ্বাস। নিজের ছায়াকেও বোধহয় বিশ্বাস করেন না তিনি।

গত দুদিন হল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। গতকাল ছিল বোধহয় শীতলতম দিন। তার ওপর শরীরটা ভাল নয়। অন্যদিনের চেয়ে গত রাত্রে সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়েছিলাম কতক্ষণ জানি না, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। ঘুম ভেঙ্গে ছিল শীতের দাপটে। ভাল করে শরীর ঢেকে নিয়েছিলাম।

তারপর পোড়া চোখে আর ঘুম আসতে চায়নি। বদ অভ্যাস। ঘুম না এলেও এসেছিল চিন্তা। অজস্র, এলোমেলো চিন্তা। নিজের পার হয়ে আসা জীবনটার কথাই মনে পড়েছিল প্রথমে। আল্লাহ কেন দুনিয়ায় পাঠালেন ? আর পাঠালেন ঠিক আছে, সাধারণ মানুষের ঘরে পাঠালেন না কেন ? কি দরকার ছিল বাদশাহের ঘরে পাঠাবার ? শাহাজাদীর জীবন তো দাঁড়ের ময়না ছাড়া আর কিছু নয়।

মনে পড়েছিল আব্বাজানের কথা। বাদশাহ শাজাহান। তবে বাদশাহ বনেছেন তিনি অনেক পরে, অনেক রক্ত ঝরিয়ে। ঔরংজীবের সঙ্গে আশ্চর্য মিল তাঁর জীবনের। ঔরংজীবও মসনদে বসার পথে অনেক রক্ত ঝরিয়েছেন।

আব্বাজানও ছিলেন জাহাঙ্গীরের মত অর্দ্ধ হিন্দু। জাহাঙ্গীরের মত আব্বা-

জানের দেহে ত্রি-চতুর্থাংশ হিন্দু রক্ত প্রবাহিত ছিল। জন্মস্থান লাহোর। চৈত্র পূর্ণিমা তিথিতে (১৫৯২ খ্রীঃ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্যই তাঁর নাম খুররাম বা পূর্ণচন্দ্র। তাঁর নাতিদীর্ঘ দেহ, সুঠাম গঠন, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, উন্নত ললাট, যুগ্ম ভ্রূ এবং উজ্জ্বল কপিল চক্ষু এবং কৃষ্ণ চক্ষুমণি। বাদশাহ আকবরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। বাদশাহ তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আম্বাজান ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য, সামান্য তুর্কী ভাষা, এবং ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, ধর্মশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। কৈশোর এবং যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি সার্থক সেনানায়ক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

পনেরো বছর বয়সে আম্মাজান বাগদত্তা হন, কিন্তু পাঁচ বছর পরে সাদী হয়। ষোল বছর বয়সে সফাবী বংশীয় মুজাফর হোসেনের কন্যার সঙ্গে তাঁর সাদী হয়। এই বছরই আবদুর রহমান খান-ই-খানানের পুত্র শাহ নওয়াজ খানের কন্যার সঙ্গে তাঁর সাদী হয়। এছাড়া একজন রাজপুতানীর সঙ্গে সাদী হয় তাঁর।

আম্বাজান মাত্র পনেরো বছর বয়সে হিসার-ই ফিরুজের জায়গীর লাভ করেন। এই সময় থেকেই শুরু হয় তাঁর অভ্যুত্থান। পরে নূরজাহানের সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে নূরজাহান চক্র থেকে বেরিয়ে আসেন এবং বিদ্রোহী অবাঞ্ছিত শাহজাদারূপে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রান্তে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করেন। শেষে জাহাঙ্গীরের স্নেহভাজন হয়েছিলেন (১৬২৬ খ্রীঃ)।

জাহাঙ্গীরে মৃত্যুর সময় তিনি ছিলেন সুদূর দাক্ষিণাত্যে। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরেই নূরজাহান জামাতা শাহর ইয়রকে মসনদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। শ্বশুর আসফ খান শাজাহানকে দিল্লী আসার সংবাদ পাঠিয়ে খসরুর পুত্র দারবক্সকে মসনদে বসিয়ে ছিলেন। শাহরইয়রও লাহোরে নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেছিলেন। আসফখান লাহোরে যুদ্ধে শাহরইয়রকে পরাজিত ও বন্দী করে তাঁর দৃষ্টি শক্তি নষ্ট কবে দেন। শাজাহান শ্বশুরকে মুঘলবংশীয় সমস্ত সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন এবং সেই অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল। দারবক্সও রাজরক্তের ঋণ পরিশোধ করেছিলেন (২১শে জানুয়ারী, ১৬২৮ খ্রীঃ)। এইভাবে রক্তস্নানের পর দিল্লীর মসনদে বসেছিলেন শাজাহান (ফেব্রুয়ারী ১৬২৮ খ্রীঃ)।

দিল্লীর মসনদে বসার পাঁচ মাস পরে তিনি আগ্রায় উপস্থিত হয়েছিলেন। মহা-সমারোহে তাঁর অভিষেক সম্পন্ন হয়েছিল। আসফ খান আটহাজারী মনসবদার এবং মহবৎ খান সাত হাজারী মনসবদারের পদ লাভ করেছিলেন। নূরজাহান চলে গিয়েছিলেন লাহোরে।

মসনদে বসার পর শাজাহানকে দুটো বিদ্রোহের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, একজন খানজাহান লোদী, অন্যজন ঝুমর সিং। দুটি বিদ্রোহই দমন করতে সমর্থ হয়েছিলেন শাজাহান। তার পর তিনি রাজ্য বিস্তারে মন দিয়েছিলেন। প্রায়

ক্ষেত্রেই সফল হয়েছিলেন তিনি।

দিন কাটছিল। আমি আমার মত বড় হয়ে উঠেছি। আম্মাজান তাঁর দুরন্ত সন্তানের দেখাশোনার সব দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন খালেদা আর বলবনের হাতে। অন্য বাঁদীরাও ছিল আমার দেখভালের জন্য। কিন্তু খালেদা ছাড়া আর কাউকেই আমি কাছে ঘেঁসতে দিতাম না। কারণে অকারণে আমার হাত চলতো। রেগে গেলে জ্ঞান থাকতো না। আর সেই সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ। গালিগালাজগুলো শিখেছিলাম আমি বাঁদীদের কাছ থেকে। শুধু বাঁদী কেন, হারেমে আশ্রিতারাও কোন কারণে নিজেদের মধ্যে বিবাদ হলে কম গালিগালাজ করতেন না। ছোট্ট আমি শুনেই শিখে ফেলতাম।

খালেদা গালিগালাজের জন্য কম শাসন করেনি আমাকে। অনেক বুঝিয়েছে। আম্মার কাছে নালিশ পর্যন্ত করেছে। কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত আমার কোন পরিবর্তন হয়নি। সিত্তীউন্নিসার সংস্পর্শে আসার পর থেকে একটু করে আমি পাল্টাতে সুরু করেছিলাম, এবং নিজের অজান্তেই।

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজকবি তালিবা-ই-আমুলীর ভগ্নী সিত্তীউন্নিসা ছিলেন বিদুষী মহিলা। নিষ্ঠাবতী বিধবা সিত্তীউন্নিসার ওপর আম্মাজান জাহানারার শিক্ষার দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। কুসংস্কার মুক্ত সিত্তীউন্নিসা জাহানারার শিক্ষার ভিত গড়ে দিয়েছিলেন।

আমাদের পাঁচ ভাইবোনের সকলকেই আব্বাজান স্নেহ করতেন। তবে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন জাহানারাকে। তার অনেক কারণও আছে। আজমীরের পুণ্য সাধুর আশ্রমে জাহানারা যখন জন্মগ্রহণ করে (২৩শে মার্চ, ১৬১৪ খ্রীঃ) মেবারের রাণা অজিত সিংহ মুঘলের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। বিজয়ী আব্বাজান ছুটে এসেছিলেন, কন্যার নাম রেখেছিলেন, জাহানারা (জগতের অলঙ্কার)। বাদশাহ জাহাঙ্গীরও সদ্যজাতাকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন। জাহানারাকে খুবই স্নেহ করতেন নুরজাহান।

আম্মাজান সিত্তীউন্নিসার হাতে জাহানারার শিক্ষার ভার তুলে দিয়েছিলেন। আমাকে তিনি নিজের ইচ্ছায় কাছে ডেকে নিয়েছিলেন। আম্মাজান আমার শিক্ষার ব্যবস্থা যে করেননি তা নয়। তা তিনি করেছিলেন। কিন্তু যাঁর হাতে তিনি আমার শিক্ষার ভার দিয়েছিলেন তাঁকে আমি একবারেই পছন্দ করতাম না। তিনিও অবাধ্য ছাত্রীকে জোর করে বা কৌশলে পাঠাভ্যাসের কোন চেষ্টাই করতেন না।

আর আমি কি শিখলাম তা জানার মত অবসরও আম্মাজানের ছিল না। কারণ সুর্যোদয়ের আগে থেকে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতেন তিনি। কারণ আগে হারেমের কর্ত্রী ছিলেন সালিমা বেগম। তাঁর পর সে দায়িত্ব পেয়েছিলেন নুরজাহান। আব্বাজান মসনদে বসে তাঁর প্রতি সসম্মান ব্যবহারই করেছিলেন। তিনি কিন্তু নিঃশব্দে লাহোরে চলে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত

সেখানেই অতি সাধারণ জীবনযাপন করেছিলেন। নূরজাহানের বিদায়ের পর হারেমের পাদশাহ বেগমের দায়িত্ব তার অর্পিত হয়েছিল আম্মাজান মুমতাজ মহলের ওপর এবং আম্মাজানের ইন্তেকালের পর জাহানারা হয়েছিল পাদশাহ বেগম।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস শিক্ষিকার কাছে নিশ্চয়ই আমার খোঁজ নিতেন আম্মা এবং তিনিও নিশ্চয়ই আমার নিষ্ঠা ভরে আমার শিক্ষা গ্রহণের কথা আম্মাকে জানাতেন। তবে তিনি যে আমাকে কিছুই শেখাননি তা নয়, তবে সবটাই আমার মর্জি মাফিক। জীবনে অশিক্ষার অন্ধকার দূর করেছিলেন সিত্তীউন্নিসা। পথ দেখিয়েছিলেন। আমার জীবনের এইটুকু সান্ত্বনা মসনদ নিয়ে ভাতৃদ্বন্দ্বের আগের বছর দিলহজ্ব (চৈত্র) মাসের শেষ দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছিলেন। তাঁর একখানি হাত আমার হাতে ধরা ছিল। মৃত্যুর কোন যন্ত্রণা তাঁর চোখে মুখে ছিল না। তিনি আমার মুখের দিকে স্থির অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। মুখে ছিল মৃদু হাসির সূক্ষ্মরেখা। শেষ মুহূর্তে তাঁর চোখের পাতা বন্ধ হয়েই খুলে গিয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলাম মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল জীবন। কাঁদিনি; অবাক বিস্ময়ে আমি তাঁর প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

শবনম, জীবনটা বড় ছোট। দিন মাস বছরের হিসাবে বড় সংকীর্ণ। জীবনটা যদি আকাশের মত উদার-বিশাল হ'ত। পৃথিবীর পথে চলতে চলতে যদি হাজার বছর পার করতে পারতাম। একদিন মনে হ'ত জীবন বড় মূল্যহীন, কি হবে মিথ্যে বেঁচে থেকে? আজ মনে হয়, বেঁচে থাকি। অনেক—অনেক দিন। প্রশ্ন জাগে, আমি কে? কেন আমাকে আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠালেন? কোথায় যাব?

জীবনের যেদিনগুলো পার হয়ে এলাম, কি করলাম? কি শিখলাম? কিছুই জানা হয়নি, করা হয়নি, শেখা হয়নি। এখন আবার সব কিছু নতুন করে সুরু করতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু তা বুঝি আর সম্ভব নয়। সন্দেহের দোলায় দুলছে মন। ঔরংজীব অনুমতি দিয়েছে সত্য, জাহানারা কি আমাকে সিক্রিতে নিয়ে যেতে পারবে? কি জানি?

কেন তোমাকে একথা লিখছি জান? কদিন হল প্রতি রাত্রেই কারা যেন অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে আশেপাশে। বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকেও তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। কদিন হল খালেদা রাতের আহার গ্রহণের পর গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে যাচ্ছে। একটা বিল্লী আমার খাদ্য গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে গত পরশু চোখের সামনে যন্ত্রণায় ছট্-ফট্ করে মারা গেল। খালেদার খাদ্যও বিল্লীকে খাইয়েছি। কিছু হয়নি। তাহলে? আর মীরকে গতকাল থেকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল ছেলেটা? কোথায় যেতে পারে? আর কি খুঁজে পাওয়া যাবে মীরকে? জানি না।

মনটা সকাল থেকেই বিষণ্ন হয়েছিল। তার ওপর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। এমন শীত

কখনো পড়েনি। কক্ষের মধ্যে আগুন জ্বালানো ছিল। গরম ছিল ভেতরটা। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এক সময় ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিলাম। আর ঘুমাতে পারিনি।

ঔরংজীব বড় কঠিন, কঠোর, নির্দয়।

একথা আব্বাজান শাজাহানের সম্পর্কেও প্রযোজ্য নয়কি ?

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছিলাম। ছিঃ ছিঃ একি ভাবছি আমি ? কিন্তু···। সত্যকে অস্বীকার করি কেমন করে ?

আব্বাজান প্রভাতে শয্যা ত্যাগ, স্নান, নমাজ, কোরাণপাঠ এবং করোখা-ই-দর্শন শেষ করে দিওয়ান-ই-আমের প্রকাশ্য দরবারে ময়ূর মসনদে বসতেন। তাঁর সামনে দুপাশে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে মনসবদার, মঞ্চের ওপর পতাকা হাতে 'কুরচী' নামক কর্মচারী, পেছনে অস্ত্র হাতে ভীষণ দর্শন হাবসী দেহরক্ষী, মসনদের নিচে সুশোভিত বালক ভৃত্যের দল। সূর্যোদয়ের চারঘড়ি পরে রাজকার্য আরম্ভ করতেন ; সময়ের ব্যতিক্রম কল্পনাতীত ছিল। দিওয়ান-ই-আম-এ প্রধানত রাজপুতদের অভ্যর্থনা, ফকির, দরবেশদের দান ব্যবস্থা, আমীরদের পদোন্নতি ঘোষণা, উপাধি ও রাজভূষণ বিতরণ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন হ'ত। এভাবে প্রায় দু ঘণ্টা অতিবাহিত হলে তিনি সপারিষদ নতুন সংগৃহীত হস্তী ও অশ্ব পরিদর্শন করতেন।

তারপর তিনি দিওয়ান ই-খাসে উপস্থিত হতেন। আব্বাজান দিল্লী ও আগ্রা দু জায়গাতেই দিওয়ান-ই-খাস তৈরি করিয়েছিলেন। দিওয়ান-ই-খাসের কাজ ছিল বাস্তব এবং বৈষয়িক। উজীর, উকিল, দিওয়ান, বক্সী, সদর, সিপাহশালার সকলেই তাঁর কাছে বক্তব্য পেশ করে আদেশ গ্রহণ করতেন। পাশে বসে থাকা সংবাদ লেখক তাঁর প্রতিটি কথাই লিখে রাখতেন।

দু ঘণ্টা পরে তিনি বাদশাহজাদা ও পাঁচজন উচ্চ কর্মচারীকে নিয়ে শাহবুরুজের গোপন মন্ত্রণা কক্ষে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করতেন।

সেখানে এক ঘণ্টা কাটিয়ে হারেমে চলে আসতেন। তিন ঘণ্টার মধ্যে আহার এবং বিশ্রাম শেষ করতেন। তারপর তিনি আম্মাজানের কাছে অনাথা, বিধবা অথবা কুমারীদের বিবাহের অর্থ সাহায্যের আবেদন শুনতেন এবং হাসিমুখে মঞ্জুরও করতেন। কোন দিন বা পরিহাসচ্ছলে বলতেন, আরজু, আজ মনে হচ্ছে তোমার সাহায্যের তালিকা কিঞ্চিত সংক্ষিপ্ত।

আম্মা মুহূর্ত চিন্তা না করে উত্তর দিতেন, আপনি ঠিক ধরেছেন জাহাঁপনা। তালিকা ইচ্ছাকৃতভাবেই সংক্ষিপ্ত করেছি আজ।

তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন আম্মার মুখের দিকে।

আম্মা বলতেন, ব্যয় ভার কিছুটা কমাবার জন্যই একাজ করতে বাধ্য হয়েছি জাহাঁপনা।

তিনি ক্ষণকাল আম্মার মুখের দিকে চেয়ে থেকে হেসে উঠতেন।

একদিনের কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। যদিও অন্তরাল থেকে দেখে-

ছিলাম। বিশ্রামের পর আম্মাজান তাঁকে বলেছিলেন, জাহাঁপনা, আমার আবেদনের কি করলেন ?

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আব্বাজান একটু গম্ভীর হয়েছিলেন। তাঁকে চিন্তিত দেখিয়েছিল। মৃদু কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, আরজু, অবুঝ হয়ো না। তোমার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ম্লান হয়েছিল আম্মাজানের মুখমণ্ডল। তিনি একটিও কথা বলেন নি আর। আব্বাজান সেদিন নীরবেই চলে গিয়েছিলেন।

কি কারণে সেদিনের সেই আব্বাজানের সঙ্গে আম্মার মতান্তর অনেকেই জেনেছিল। বদখসানরাজ মীর্জা শাহরুখের তৃতীয় পুত্র নজবৎ খাঁ জাহানারাকে সাদী করতে চেয়েছিলেন। আর জাহানারা···। না, তার মনের কথা আমি জানতাম না। ওসব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। শুনেছিলাম, গোপন সাক্ষাতে দুজনেই দুজনকে পছন্দ করেছিল। শুধু বুঝতে পারিনি হারেমের কড়া পাহারা ভেদ করে সেটা কেমন করে সম্ভব হয়েছিল।

শুনেছিলাম, বাদশাহ শাজাহানের কাছে মনোবাসনা জানিয়ে ছিলেন নজবৎ খাঁ। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শাহাজাদী ভিন্ন আর কিছুই তাঁর কাম্য নয়। ভবিষ্যতে মসনদের দাবীদার তিনি হবেন না।

না, বাদশাহ শাজাহান নজবৎ খাঁর প্রার্থনা পূরণ করতে পারেননি। কারণ বাদশাহ আকবর শাহ মুঘল মসনদ নিয়ে বিরোধের আশঙ্কায় শাহাজাদীদের সাদী নিষিদ্ধ করে গিয়েছিলেন। সেই প্রথা ভাঙ্গার সাহস আব্বাজানের হয় নি। শুধু তাই নয়, দীর্ঘকাল ধরে কাশ্মীর আর পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবাহ প্রথা চালু ছিল। ধর্ম সেখানে বাধা সৃষ্টি করেনি। যেমন বাধা সৃষ্টি করেনি মুঘল হারেমেও। রাজপুতানী বেগমরা তাঁদের ধর্মপালন করে গেছেন। কিন্তু বাদশাহ শাজাহান ফরমান জারী করে পাঞ্জাব-কাশ্মীরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন।

নজবৎ খাঁর সঙ্গে সাদীতে রাজি হন নি আব্বাজান। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রথা ভাঙ্গতে সাহসী হননি তিনি। আম্মাজনকে দেখেছি জাহানারার সাদীর ব্যাপারে আর কোন কথা না বলতে। আর জাহানারা ? না, তাকে আমি কোন দিনই বুঝতে পারলাম না। শুনেছি পরেও তার জীবনে অনুরাগের ছোঁয়া লেগেছিল। রাজপুত যুবক···। না, ওসব কথা থাক। আশ্চর্য হয়েছি জাহানারার অপরিসীম সহ্য ক্ষমতা দেখে। তবে একটা ভুল ধারণা তার সম্পর্কে আমার ভেঙ্গে গেছে কদিন আগে। এতদিন আমি তাকে ভুল বুঝে এসেছি।

শুনেছি, আব্বাজান কোনদিন কোন প্রার্থীকে নিরাশ করতেন না। নিরাশ করেছিলেন আম্মাজান মমতাজ মহলকে।

হ্যাঁ, বাদশাহ দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের পর আবার দিওয়ান-ই-খাস ও শাহবুরুজের

গোপন মন্ত্রণা কক্ষে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য উপস্থিত হতেন। কখনো বা রাজ-উদ্যানে পশু-পাখীর যুদ্ধ, বাজিকরের খেলা দেখতেন। দিনের শেষে সন্ধ্যা নামতো, তারপর রাত্রি। চারিপাশে প্রজ্বলিত হ'ত মশাল। হারেমের প্রতি কক্ষ ঝাড় লণ্ঠনের দীপের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠতো।

বাদশা শিস্‌মহলে নৃত্য গীত উপভোগ করতেন। তারপর ভোজন কক্ষে আহার এবং রাত্রি গভীর হবার আগেই শয়ন কক্ষে চলে আসতেন।

নানা জাহাঙ্গীর ছিলেন উদার সুন্নী; নানী জগৎ গোঁসাইনী ছিলেন নিষ্ঠাবতী হিন্দু। শুনেছি, কপালে তিনি চন্দন-তিলক অনুলেপন করতেন বলে নানা তাঁর নামকরণ করেছিলেন গোঁসাইনী। আব্বাজান ছিলেন শিয়া। আব্বাজান প্রতিদিন পাঁচবার নমাজ পড়তেন; রমজান মাসে রোজা রাখতেন; ইসলাম অনুমোদিত পুণ্য দিবসে কোরাণ পাঠ করতেন এবং ফকিরদের অর্থদান করতেন। কিন্তু তিনি জানতেন বাদশাহ আকবর এবং জাহাঙ্গীরের ধর্মমতের বিরুদ্ধে মোল্লাদের উষ্মা ছিল। সেইজন্য তিনি মসনদে বসার পর ধর্মান্ধ গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সিজদা (দরবারে প্রণাম) নিষিদ্ধ করেছিলেন। পরিবর্তে বাদশাহের সামনে জমিন বুস (ভূ-চুম্বন) প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। শেষে চাহার তসলিম (মস্তক অবনত) অনুসারে কপাল-চোখ এবং বাহু স্পর্শ করবে। উলামা ও ফকিরদের এই প্রথা পালন করতে হ'ত না।

না, কঠোর হলেও একথা লিখতে বাধ্য হচ্ছি, বাদশাহ শাজাহান ধর্মে উদার ছিলেন না। হিন্দুদের ওপর তীর্থস্নানকর পুনঃ স্থাপন করেছিলেন তিনি। বিদ্রোহী বুন্দেলরাজ ঝুঝর সিংহের পরাজয়ের পর তাঁর বন্দী পুত্রদের জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী, কন্যা এবং অন্যান্য পুরনারীদের আমীরদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। বুন্দেলরাজ্য মন্দিরের জন্য বিখ্যাত ছিল। বাদশাহের আদেশে অধিকাংশ মন্দির নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। একথা চিন্তা করতে লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায় আমার। বিশাল হিন্দুস্থানের বাদশাহরূপী রক্ষক ছিলেন তিনি। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ছিল তাঁর প্রজা। সকলেই তাঁর কাছে সমান। কিন্তু তা না করে তিনি মুসলিম কর্মচারীদের ধর্মদ্বেষিতায় প্রশ্রয় দিতেন। তাঁর আদেশেই ওরচা রাজার বিখ্যাত মন্দির ধূলিসাৎ হয়েছিল। তিনি বারানসী অঞ্চলে পুরাতন মন্দির সংস্কার এবং নতুন মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ করেছিলেন এক সময় (১৬৩৩ খ্রীঃ)। সেই বছরেই তাঁর আদেশে ছিয়াত্তরটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়।

পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন তিনি (১৬৩৪ খ্রীঃ)। আদেশ দিয়েছিলেন, যে সমস্ত হিন্দু মুসলিম নারী বিবাহ করেছে তারা হয় ইসলাম ধর্মগ্রহণ করবেন, না হলে মুসলিম স্ত্রী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। শাহলাহোরী আর মহবুব আলি সিন্ধী নামে দুজন আমীরকে তিনি হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। হিন্দুদের জন্য

বিভিন্ন প্রকারের পরিচ্ছদ নির্ধারিত হয়েছিল।

অথচ দারা ও জাহানারার হিন্দুধর্মগ্রন্থ আলোচনার বিরোধিতা তিনি করেননি। তিনি সংস্কৃত ও হিন্দী কবিদের যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। পণ্ডিত জগন্নাথ তাঁর বৃত্তি ভোগ করতেন। তিনি কবি সুন্দর দাসকে 'মহাকবি রায়' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। কবি চিন্তামন তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল। হিন্দু জ্যোতিষীদের দিয়ে পরিবারের সকলের কোষ্ঠী রচনা করিয়ে ছিলেন। দিনক্ষণ দেখে যুদ্ধযাত্রা করতেন। নিজের এবং ভাইয়েদের জন্মদিনে সোনা-রুপা দিয়ে ওজন করাতেন। তুলাদানের অর্থ ফকির, দরবেশ আর ব্রাহ্মণদের বিতরণ করতেন। বসন্ত পঞ্চমী, হোলী, দশহরা প্রভৃতি হিন্দু উৎসব দরবারে অনুষ্ঠিত হত।

হিন্দুরাজা ও মনসবদারের অভিষেকের দিন হিন্দু প্রথানুসারে সকলের কপাল চন্দন অনুলিপ্ত করা হত; পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি মাঙ্গলিক চিহ্ন ব্যবহার করা হত। কাশ্মীর অঞ্চলে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছিল।

জানি না আব্বাজানের চরিত্রে কেন এমন নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেত? রক্তে তাঁর বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সেইজন্যই কি?

অথচ তাঁর ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতি আকর্ষণ করতো আমাকে। তাঁর মধুর ব্যবহার এখনো ভুলতে পারিনা। আর সেই অপূর্ব মন ভোলানো হাসি? অবাধ্য দুরন্ত আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হাসি মুখে মৃদু কণ্ঠে বলতেন, এ্যায়সা দুবলা পাতলা রনেসে চলে গা নেহি, ঠিক্‌সে খানা খাও।

আবার আম্মাজানের মৃত্যুর দিন তিনি আমাদের কাছে ডেকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, যে যাবার তাকে ধরে রাখা যায় না। তোমাদের আম্মাজান চলে গেছেন। আমি আছি।

তিনিও চলে গেলেন। কেউ থাকে না। আমরা সকলেই চলে যাব।

২১

মীরকে অবশেষে পাওয়া গেল। এখন সকাল। কিছুক্ষণ আগে তার মৃতদেহ রাজপথে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই তার ছোট্ট দেহটা কবরের অন্ধকারের মুখ ঢেকেছে।

গোলগম্বুজে বসে আছি। একটু আগে খালেদা খুবই কান্নাকাটি করে গেল। খোজা হলেও ছেলেটাকে খুবই পেয়ার করতো খালেদা।

ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম, এমন কেন ঘটছে? এর শেষ কোথায়?

এখন চিন্তার রেশ টেনে ধরেছি। কি হবে মিথ্যে চিন্তা করে। তার চেয়ে যেমন চলছে চলুক। যা হয় হোক। বলবন চলে গিয়ে আমার অবস্থা ডানাভাঙ্গা পাখির মতই। সাধ থাকলেও সাধ্য নেই।

ঔরংজীব...... না, তাঁকেই বা শুধু দোষ দিই কেন ? এতো মুঘল বংশের নিয়তি। মুঘল বংশের ভ্রাতৃবিরোধ, পারিবারিক কলহ এবং মসনদের জন্য দ্বন্দ্ব নতুন ঘটনা নয়। বাবর পিতৃরাজ্য ফারঘনা অধিকারের জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কাবুলে রাজ্য স্থাপন করেন।

হুমায়ুন বাবরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ না করলেও শেষজীবনে বিনা অনুমতিতে বদখসান ত্যাগ করে বাবরকে উত্যক্ত করেছিলেন। হুমায়ুন ভাই কামরান, হিন্দাল ও আসকারীর কাছ থেকে সুব্যবহার লাভ করেননি।

আকবর তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই কাবুলের শাসনকর্তা মীর্জা হাকিমের বিদ্রোহের ফলে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেন।

শাহজাদা সেলিম আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। শাহজাদা খসরু জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে মসনদের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। শাজাহানও জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, জনশ্রুতি, তিনি খসরুকে কারাগারে গুপ্ত হত্যা করিয়ে ছিলেন। শাহরইয়রকে যুদ্ধে পরাজিত এবং অন্ধ করে দেন। তাঁর নির্দেশেই আসফ খান দারবক্সকে হত্যা করেন। দানিয়েলের দুই পুত্র তাহকুর্ম এবং হুসাভ নিহত হন। সবই মসনদের জন্য।

আর সে কথা স্মরণ করেই জীবনের অন্তভাগে তিনি মসনদের জন্য সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্দেশ্যে চার ভাইকে রাজ্যের চারটি অংশের প্রায় স্বাধীন শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। দারা নিযুক্ত হয়েছিলেন পাঞ্জাব ও দিল্লীর শাসনকর্তা। শুজা বাঙ্গলার। ঔরংজীব দাক্ষিণাত্যের আর মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন। তবু তিনি দুর্ভাগ্যকে এড়াতে পারলেন না।

হঠাৎ-ই বাদশাহ শাজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লেন (১৬৫৭ খ্রীঃ শেষে)। দরবারে যাওয়া এবং ঝরোখা-ই-দর্শন বন্ধ হয়ে গেল। আগুনের মত সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো যে সম্রাট শাজাহান মৃত। শুজা, ঔরংজীব, মুরাদ এবং দারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। প্রথমেই মুরাদ উজীর আলি নকীবকে হত্যা করে নিজেকে দিল্লীর বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন। সেই সঙ্গে নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করলেন।

শুজা রাজমহলে নিজের অভিষেক সম্পন্ন করে পূর্বদিক থেকে আগ্রার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। পথে বারানসীর কাছে দারার পুত্র সুলেমান তাঁকে পরাজিত করলেন। পরাজিত শুজা আবার বাঙ্গলায় ফিরে গেলেন।

কুটবুদ্ধি ঔরংজীব একা না এগিয়ে স্থূলবুদ্ধি মুরাদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করলেন। কোরাণ স্পর্শ করে ঔরংজীব শপথ করেছিলেন, যুদ্ধে জয়ী হয়ে সাম্রাজ্য ভাগ করে নেবেন দুজনে। ঔরংজীব এবং মুরাদের মিলিত বিশাল বাহিনী আগ্রার দিকে এগিয়ে এসেছিল। আর সেই সময় ঔরংজীবের জালে জড়িয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে। যুদ্ধের খরচ চালাবার জন্য নিয়মিত অর্থের যোগান দিয়েছিলাম।

আব্বাজানের আদেশে উজ্জয়িনীর সাতক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ধর্মাটের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ এবং মুঘল সেনাপতি কাসিমখান বিদ্রোহীদের বাধা দিয়েছিলেন। দিন শেষ হয়ে আসছে তখন। ক্লান্ত শ্রান্ত বিদ্রোহী বাহিনী। সেই অবস্থাতেই আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন কাসিম খান। বাধা দিয়েছিলেন রাজপুত যশোবন্ত সিংহ। তিনি নীতি মেনে ছিলেন। পথশ্রান্ত শত্রুকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়েছিলেন। ফলে পরদিনের যুদ্ধে রাজপুতবাহিনী পরাজিত হয়েছিল মুরাদ-ঔরংজীবের বাহিনীর কাছে।

ঔরংজীব ও মুরাদের বিজয়ী সৈন্যবাহিনী বিনা বাধায় আক্রার চার ক্রোশ পূর্ব দিকে সামুগড়ের বিশাল প্রান্তরে উপস্থিত হয়েছিল। দারা প্রায় অর্ধলক্ষ সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহীদের বাধা দিয়েছিলেন। যুদ্ধ হয়েছিল সমস্ত দিন। শেষে দারার রণহস্তী আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। সৈন্যরা বিভ্রান্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে সুরু করে। হতাশ দারা ফিরে আসেন আগ্রায়।

সামুগড়ের যুদ্ধের পর ঔরংজীব আগ্রা দুর্গ অবরোধ করলেন। আব্বাজান অনেক চেষ্টা করেছিলেন বিরোধ মীমাংসার। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছিল ঔরংজীবের অনমনীয়তার জন্য। এমন কি আগ্রা দুর্গ সমর্পণে বাধ্য করার জন্য যমুনার জলধারা রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। খাদ্য পানীয় বিলাসে অভ্যস্ত আব্বাজান দুর্গের কুপের জলে তৃষ্ণা নিবারণে বাধ্য হয়েছিলেন। অবরোধের তৃতীয় দিবসে দুর্গদ্বার উন্মুক্তের আদেশ দিয়েছিলেন আব্বাজান। ঔরংজীবের হাতে বন্দী হয়েছিলেন সম্রাট শাজাহান।

আগ্রা থেকে ঔরংজীব দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। পথে মথুরার কাছে রূপ নগরের শিবিরে বিজয়ী বীর মুরাদের অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছিল। শিবির সুসজ্জিত করা হয়েছিল। মুরাদের অভ্যর্থনার জন্য তীব্র সুরা, লাস্যময়ী নর্তকী, সুগন্ধ খাদ্য পানীয় আলোর মালা, পুষ্প স্তবক আনা হয়েছিল। অভ্যর্থনা শেষে অতিরিক্ত মদ্যপানে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছিলেন মুরাদ। নিদ্রা শেষে মুরাদ দেখেছিলেন, তরবারি অপসারিত, হাত-পা শৃঙ্খলিত। মুরাদ প্রথমে শালিমগড় দুর্গে, পরে গোয়ালিয়র দুর্গে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। উজীর আলী নকীবকে হত্যার অপরাধে বিচারের প্রহসনে মুরাদের প্রাণদণ্ড হয়েছিল। ঔরংজীব মসনদের দাবীদারকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

শবনম, মুরাদের মৃত্যুতে দুঃখ পেয়েছিলাম। ভাইজান মুরাদ ছিলেন স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন। ঘোরপ্যাঁচ বুঝতেন না। সাহসী বীর, যোদ্ধা। আমাকে খুবই পছন্দ করতেন। বাল্যে আমার দুরন্তপনায় সকলেই যখন অতিষ্ঠ, আমার ব্যবহারে লজ্জিত, এড়িয়ে চলে ; তখন একমাত্র ভাইজান মুরাদই দেখা হলে কাছে ডেকে কথা বলতেন। আমার খোঁজ-খবর নিতেন। নতুন কি-কি অপকর্ম করলাম জানতে চাইতেন। হেসে বলতেন, চালিয়ে যাও বহিন। দিল যা চাইবে তাই করবে।

কারো পরোয়া করবে না।

বলতাম, আমি যে বদনামী হয়ে যাচ্ছি ভাইজান?

হেসে বলতেন, বদনামী হওয়া অনেক ভাল বহিন। ভাল সেজে শয়তানী করার চেয়ে বদনামী হওয়া ভাল। স্রিফ্ নিজের কাছে সাচ্চা থাকবে। কে কি বলল, কি এসে যায় তাতে।

সেই মুরাদ ঔরংজীবের ষড়যন্ত্রে চলে গেলেন। সুরার নেশায় মাতাল করে ঔরংজীব তাঁকে শেষ করে দিলেন। মুরাদের মৃত্যুতে দুঃখ পেয়েছিলাম। একটা তাজা প্রাণ মসনদের জন্য চলে গেল।

দুঃখ পেয়েছিলাম সুজার জন্য। সুজা ছিলেন বীর যোদ্ধা কিন্তু বাস্তব জ্ঞান সুজার খুব একটা ছিল না বলেই আমার মনে হয়। সুজা ছিলেন নরম প্রকৃতির মানুষ। বাঙলার জল বায়ু তাঁর মনটাকে নরম করেছিল। সৌখিন বিলাসী। সুজার কন্যা গুলবানুও সুজার মতই হয়েছিল। সেই সুজা প্রাণের ভয়ে আরাকানে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তাঁর যে কি হল, আজও জানা যায়নি।

হ্যাঁ, ধর্মাট ও সামুগড়ের যুদ্ধে দারার পরাজয়ে সুজা উল্লসিত হয়েছিলেন। নতুন উৎসাহে তিনি আবার আগ্রার দিকে এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এলাহাবাদের অদূরে খানুয়ার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন (৫ই জানুয়ারী, ১৬৫৯ খ্রীঃ)।

মীরজুমলা সুজার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। সুজা পাটনা, ভাগলপুর ও রাজমহল অতিক্রম করে চট্টগ্রামের পথে আরাকানে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

এর মধ্যে পথে সেনাপতি মীরজুমলার সঙ্গে ঔরংজীবের পুত্র মুহম্মদের মতান্তর দেখা দিয়েছিল। শুনেছি মতান্তরের কারণ সুজার পশ্চাদ্ধাবনের পথে মীরজুমলার সৈন্যদের নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার ও লুণ্ঠন। প্রতিবাদ করেছিল মুহম্মদ। মীরজুমলাকে তাঁর সৈন্যদের সংযত করার কথা বলেছিল। মীরজুমলা মুহম্মদের কথা মানতে চাননি। ফলে বিবাদ। মুহম্মদ সুজার শিবিরে যোগ দিয়েছিল। সেখানে গুলরুখ বানুর সঙ্গে সাদী হয়েছিল তার।

সুজা আরকান পালিয়ে যাবার পর একাকী হয়ে পড়েছিল মুহম্মদ। তার সৈন্যবাহিনীও ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। মীরজুমলা সহজেই তাকে বন্দী করে আগ্রায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। বিদ্রোহের অপরাধে মুহম্মদের বিচার হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় মুহম্মদ। সে এখন গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী জীবনযাপন করছে। গুলবানুও তার কাছে। আর দারা?

না, দারার কথা ভাবতে চাইনা। বড় কষ্ট হয় দারার কথা ভাবলে। দারা ছিলেন সংসারে এক সন্ন্যাসীর মত। চরিত্রে ঠিক বাদশাহ আকবর শাহের মত। উদার নির্লোভী পুরুষ। বাদশাহ পরিবারের অনুপযুক্ত। ধীর শান্ত সংযত। দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-উচ্ছ্বাস কিছুই যেন দারাকে স্পর্শ করতো না। সকলের মাঝে থেকেও দারা ছিল একাকী, নিঃসঙ্গ পথিক। যাত্রা তার মনের গহনে।

দারা কখনো হঠাৎ-ই চলে আসতো আমার কাছে। এসেই চলে যেত। প্রশ্ন করতাম, ভাইজান, তুমি এলেই বা কেন, চলেই বা যাচ্ছ কেন ?

শান্ত কণ্ঠে সে উত্তর দিত, তোমার কথা হঠাৎ মনে পড়লো বলে দেখে গেলাম।

অথচ ঔরংজীবকে আমি বেশি পছন্দ করতাম। তাঁর আশ্চর্য সৌন্দর্য, মধুর ব্যবহারে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তাঁর সম্পর্কে ছিলাম অন্ধপ্রায়।

আর একজনের কথা মনে পড়ে। সুলেমান শিকো। দারার বীর পুত্র। মুঘল মসনদের পক্ষে উপযুক্ত ছিল একমাত্র সে ই। সামুগড়ে দারার পরাজয়ের পর তাঁর বহু সৈন্য ঔরংজীবের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। সুলেমান আর তার বিবি শতেক বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে গাহড়য়ালের হিন্দুরাজার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ঔরংজীব সুলেমানকে তাঁর হাতে তুলে দিতে বাধ্য করিয়েছিলেন গাহড়য়ালরাজকে। শৃঙ্খলা-বদ্ধ সুলেমানকে দরবারে আনা হয়েছিল। দেখেছিলাম সেই বিচার দৃশ্য। মুঘল বংশের সুন্দরতম সন্তান সুলেমানকে দেখে চোখ ফেটে জল আসতে চেয়েছিল আমার।। মনে হয়েছিল আমি কি ভুল দেখছি ? এই কি সেই সুলেমান শিকো ?

সুলেমান বাদশাহ ঔরংজীবকে বিনীতভাবে অনুরোধ করেছিল, জাহাঁপনা, আমি যখন অপরাধী, আমাকে হত্যা করার আদেশ দিন। আমি বন্দী জীবনযাপন করতে চাই না।

ঔরংজীব উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু তোমার অপরাধের শাস্তি তো মৃত্যুদণ্ড নয়। তাহলে কেমন করে আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিই বল ?

সুলেমান বলেছিল, কিন্তু জাহাঁপনা, বন্দীকে পেস্তার জল তো (আফিং ভেজানো জল) পান করতে দেওয়া হয়। পেস্তার জলপান করলে আমি উন্মাদ হয়ে যাব।

ঔরংজীব কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করেছিলেন সুলেমানকে পেস্তার জলপান করতে দেওয়া হবে না। শুনেছি গোয়ালিয়র দুর্গে প্রথম দিনেই সুলেমানকে পেস্তার জলপান করতে দেওয়া হয়েছিল এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত (.৬৬২ খ্রীঃ) সেই পানীয়ই দেওয়া হ'ত তাকে।

শবনম, তুমি শয়তানের নাম শুনেছো নিশ্চয়ই, কিন্তু শয়তান দেখেছো কি ? আমি দেখেছি। ভাইজান ঔরংজীব শয়তানকেও শয়তানীতে হার মানান। মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ কোরাণ শরিফ। পবিত্র গ্রন্থ। সেই পবিত্র গ্রন্থটিকে কথায় কথায় অপবিত্র করতে এতটুকু দ্বিধা করেন না ঔরংজীব এবং সেই সঙ্গে তিনি বলেন, তাঁর গর্ব, তিনি নিষ্ঠাবান মুসলমান। তিনি যা কিছু করেন আল্লাহর ইচ্ছায়।

তবে একটা কাজ তিনি করেছেন। দুঃসাহসের কাজ। মুঘল বংশের রীতি তিনি ভঙ্গ করেছেন। মসনদের দাবীদারের আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে তিনি দারার পুত্র সিপার শিকোর সঙ্গে তাঁর তৃতীয় কন্যা এবং ইজিদ বক্সের সঙ্গে তাঁর পঞ্চম কন্যার সাদী দিয়েছেন।

দারার কথা মনে পড়ে। দারা যেন আকবর শাহের প্রতিচ্ছবি। দীন-ই-ইলাহীর

সমর্থক ছিল দারা আর জাহানারা। কোনরকম কুসংস্কার দারাকে স্পর্শ করেনি। আর ছিল দারার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। মানুষ দারাকে ভালবাসতো। ধনী-দরিদ্র ছিল তার কাছে সমান। শুধু তাই নয়, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সকল শ্রেণীর মানুষ দারার সঙ্গে দেখা করতে পারতো।

আব্বাজান দারাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। সব সময় দারা আব্বাজানের কাছেই থাকতো। ফলে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল দারা। আর তার জন্যই...

কথাগুলো চিন্তা করলে আজও বুকের মধ্যেটা কেমন করে ওঠে। সাধারণ মানুষের কাছে শুনতাম দারার নাম। বাঁদীরা পর্যন্ত দারার নাম করতো।

সেই দারার শেষ জীবন ছিল অত্যন্ত শোকাবহ। আল্লাহ ভাল মানুষটাকে কি প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছেন। চিন্তা করেছি। উত্তর খুঁজে পাইনি। হিন্দুরা জন্মান্তরবাদ কর্মফলে বিশ্বাসী। দারাও কি তার পূর্বজন্মে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল? জানি না। চিন্তা করেছি শুধু। ঈশ্বর-বিশ্বাসী দারার মর্মান্তিক পরিণতি কেন?

শুনেছি, আগ্রা দুর্গ অধিকার এবং ঔরংজীব আব্বাজানকে বন্দী করেছে সংবাদ পেয়ে দারা দিল্লী থেকে লাহোরে চলে যায়। তার ইচ্ছা ছিল বর্ষা শেষ হলে ঔরংজীবের সঙ্গে আবার শক্তি পরীক্ষা করবে। কিন্তু ঔরংজীব বর্ষার আগেই শতদ্রু অতিক্রম করলেন। দারা সপরিবারে মুলতানে চলে গিয়েছিল। গুজরাটের শাসন-কর্তা তখন ঔরংজীবের শ্বশুর শাহ নওয়াজ। তিনি দারাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন। সাহায্যলাভ করে দারা দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করা স্থির করেছিল। কিন্তু সেই সময় যশোবন্ত সিংহ দারার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ঔরংজীবের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

এদিকে ঔরংজীব সসৈন্যে দারার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। দারা আজমীরের দু-ক্রোশ দূরে দেওরাই-এর গিরিবর্ত্মে একটা খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মরক্ষার্থে পালিয়ে গেল (১২ই এপ্রিল, ১৬৫৯ খ্রীঃ) জয়সিংহ ও বাহাদুর খান দারার পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগলো। দারা হিন্দুস্থানে আশ্রয়লাভ অসম্ভব মনে করে পারস্যের দিকে পালাতে লাগলো। পথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দাদারের (বোলান গিরিবর্ত্মের কাছে) আফগান সর্দার জিওন খানের আতিথ্য গ্রহণ করেছিল।

কিছুদিন আগে জিওন খান শাজাহান কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। দারা অনেক কষ্টে সেই প্রাণদণ্ড রহিত করে।

দাদারের শিবিরে দারার প্রিয়বিবি বহু সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী পরভেজের কন্যা নাদীরাবেগম ইহলোক ত্যাগ করে। অন্যদিকে জিওন খান দুই কন্যা এবং এক পুত্র (সিপার) সহ দারাকে মুঘল সেনাপতি বাহাদুর খানের হাতে তুলে দিয়ে উপকারীর ঋণ পরিশোধ করে (আগষ্ট, ১৬৫৯ খ্রীঃ)।

সাতদিনের মধ্যেই হস্তপদ শৃংখলিত অবস্থায় দারাকে একটা অনাবৃত হাতীর পিঠে চড়িয়ে দিল্লীতে আনা হয়েছিল। দুঃখে-অপমানে দারা একবারও চোখ তুলে তাকায়নি। পথের মানুষ দারার দুঃখে শিশুর মত কেঁদেছে। কিন্তু পরদিনই ক্ষুব্ধ জনতা জিওন খাঁর শিবির আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে।

জনরোষ দেখে ভয় পান ঔরংজীব। পরদিনই ধর্মদ্বেষিতার অপরাধে দারাকে কাজীর সামনে উপস্থিত করলেন বিচারের জন্য।

বিচার! বিচার না প্রহসন?

ঔরংজীব নিযুক্ত কাজী নিপুণ দক্ষতায় অপরাধীর বিচার করেছিলেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পর্যন্ত দিয়েছিলেন।

কাজী প্রশ্ন করেছিলেন, শাহজাদা দারাশিকো, আপনি মুসলমান না কাফের?

শান্ত দৃষ্টিতে দারা কাজীর দিকে চেয়ে ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন, জনাব আলী, গোস্তগী মাফ করবেন, আমার জানার কৌতূহল হচ্ছে, আপনি কার বিচার করছেন; শাহাজাদা দারাশিকোর, না একজন মুসলমানের, না একজন কাফেরের?

কাজী থতমত খেয়েছিলেন। সামলে নিয়ে বলেছিলেন, শাহাজাদা দারাশিকোর বিচার করছি।

দারা বলেছিল, জনাব আলী, শাহাজাদা দারাশিকো ধর্মে মুসলমান।

কাজী প্রশ্ন করেছিলেন, মুসলমানের ধর্ম আপনি পালন করেন?

দারা উত্তর দিয়েছিল, এতদিন পর্যন্ত নিষ্ঠাভরে ধর্মপালন করে এসেছি জনাবআলী।

কাজী বলেছেন, ঝুটবাত। আপনি মুসলমানের ধর্ম পালন করেননি। আপনি কাফেরের ধর্ম পালন করেছেন। আপনি কাফেরের ধর্মশাস্ত্র উপনিষদ ফার্সীতে অনুবাদ করেছেন। এর থেকে কি প্রমাণিত হয় না, আপনি মুসলমান নন, কাফের?

দারা ধীর শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, জনাবআলী, একজন মুসলমান যদি কাফেরের ধর্মশাস্ত্র উপনিষদ অনুবাদ করার জন্য কাফের হয়ে যায়, তাহলে আমার কিছু বলার নেই। তবে মুসলমানের ধর্মগ্রন্হ কোরাণ শরিফে নিষেধের কথা লেখা নেই। জীবনে এই উপলব্ধিই আমার হয়েছে, কোন ধর্মের মধ্যেই বিরোধ নেই। বিরোধ আমাদের মনে। হিন্দু-মুসলমান, জৈন-খ্রীষ্টান সকলেই আল্লাহর সন্তান। তিনি আমাদের সকলেরই পরম পিতা প্রভু। আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান। আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা মানুষ। সেখানে হিন্দু-মুসলমান নেই। ধর্ম মানুষের প্রাণের সম্পদ। আত্মা আর পরমাত্মার মিলনের জন্যই ধর্ম। ধর্ম অন্ধকার নয় আলো। জ্ঞান এবং সত্যের মূলমন্ত্র।

কাজী ধমক দিয়ে বলেছিলেন, আপনি কাফের। প্রমাণ আপনার অঙ্গুরীয়তে প্রভু খোদাই করা আছে।

স্নিগ্ধকণ্ঠে দারা উত্তর দিয়েছিল, আমার প্রভু সর্বশক্তিমান দীন দুনিয়ার মালেক

আল্লাহ।

—মিথ্যা কথা। চিৎকার করে উঠেছিলেন কাজী। বিচার হয়েছিল দারার। বিচার শেষে প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন কাজী।

শুনেছি প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনে অদৃশ্যে তাকিয়ে ছিল দারা। তার মুখে ছিল স্নিগ্ধ হাসি। তারপর...

২২

শবনম, বড় কষ্ট, যন্ত্রণা! এই যন্ত্রণার মধ্যে দিন কেটেছে আমার। অপরাধ-বোধ আমাকে প্রতিক্ষণে, প্রতিমুহূর্তে দগ্ধ করেছে। আমিতো এমন চাইনি। ঔরংজীবের পৈশাচিকতা আমার চিন্তার অতীত ছিল। আমি ভাবতে পারিনি সুন্দর মানুষটা এত নিষ্ঠুর হতে পারে। মসনদের জন্য ঔরংজীব শয়তানকেও হার মানিয়েছিল।

আমি নিজেকে ক্রমশ গুটিয়ে নিয়েছিলাম। শুধু রোজ সকালে সাহায্যপ্রার্থী ছাড়া আর কারো সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এইভাবে কেটে গিয়েছিল দিন মাস বছর।

খালেদা আপশোষ করে বলতো, আর কি, এবার তুমি ফকির নাও। বুড়ো বলবনের সঙ্গে কখনো দেখা হলে সে শুধু মুচকি হাসতো।

ঔরংজীবের সঙ্গে কথা বলে হারেম ছেড়ে চলে এসেছিলাম এই গৃহে। তিনিই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। মহল্লাটা উজীর আমীদের। অসংখ্য ছোট বড় গৃহ। নির্জন পরিবেশ। ভাল লেগেছিল।

গত রমজান মাসে আব্বাজানের ইন্তেকাল হয়েছে। মুক্তি পেয়েছেন তিনি।

আব্বাজানের শোকটা কাটতে না কাটতে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সংবাদ। শিবাজী আগ্রায় এসেছিলেন এবং প্রকাশ্য দরবারে বাদশাহ ঔরংজীবকে অপমান করার জন্য বন্দী হয়েছেন।

সংবাদটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল যা শুনলাম তা সত্য নয়, রটনা। প্রকৃত সত্য জানার জন্য ছটফট করতে লাগলাম। চিন্তা করেছিলাম কিভাবে সত্য জানা যায়।

জেনেছিলাম। জানিয়েছিল বলবন। সত্যই বন্দী শিবাজী আর তাঁর পুত্র।

কিন্তু কেন আগ্রায় এলেন তিনি? তিনি কি বাদশাহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছেন?

একটু একটু করে জেনেছিলাম সব ঘটনা। ঔরংজীব যখন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন তখনই শিবাজীর ক্ষমতা বুদ্ধি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তখন তিনি দুর্দান্ত ও কৌশলী মারাঠাকে দমন করতে পারেননি। কিন্তু মসনদে বসেই তিনি

শিবাজীকে দমন করার কথা চিন্তা করলেন। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার তখন শায়েস্তা খাঁ। ঔরংজীব শিবাজীকে দমন করার নির্দেশ পাঠালেন সুবাদারকে। শায়েস্তা খাঁ পুণা ও চাকন অধিকার করলেন এবং কোঙ্কনের উত্তরাংশ কল্যাণ অঞ্চল থেকে শিবাজীর সেনাদল বিতাড়িত করলেন।

বিজাপুরের সেনাপতি আফজল খাঁ শিবাজীকে দমন করতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন। বিজাপুরের সৈন্যরা অনেক চেষ্টা করেছিল শিবাজীকে দমন করার— পারেনি। শিবাজী পিতা শাহজীর সহযোগিতায় বিজাপুরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন এবং নিজের ও বিজাপুরের সৈন্যদের নিয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করেছিলেন। একদিন রাতের অন্ধকারে (১৬৬৩ খ্রীঃ) শিবাজী পুণায় শায়েস্তা খাঁর শিবির আক্রমণ করলেন। সেই আক্রমণে আহত হলেন শায়েস্তা খাঁ। তাঁর পুত্র এবং কয়েকজন দেহরক্ষী নিহত হল। শায়েস্তা খাঁ পুণা ছেড়ে আগ্রায় চলে এলেন। অসন্তুষ্ট ঔরংজীব তাঁকে বাঙ্গলাদেশে পাঠিয়ে দিলেন। পরের বছর শিবাজী সুরাট বন্দর লুঠ করলেন।

ঔরংজীব অম্বররাজ জয়সিংহ এবং সেনাপতি দিলীর খাঁকে দাক্ষিণাত্যে পাঠালেন। কূটকৌশলী জয়সিংহ প্রথমেই বিজাপুরের সুলতানকে নিজের দলে নিয়ে এলেন। শিবাজীর পক্ষের জায়গীরদারদের অধিকাংশকেই কৌশলে বশীভূত করলেন। তারপর জয়সিংহ পুরন্দর দুর্গ ও শিবাজীর রাজধানী রামগড় অবরোধ করলেন। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের ওপর সুরু করলেন অকথ্য অত্যাচার।

নিরুপায় শিবাজী বাধ্য হলেন জয়সিংহের সঙ্গে সন্ধি করতে। নাম হল পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫ খ্রীঃ)। শিবাজী বার্ষিক ষোললক্ষ টাকা আয়ের কয়েকটি জেলা এবং তেইশটি দুর্গ দিল্লীর বাদশাহকে ছেড়ে দিলেন। বাদশাহের সামন্তরূপে তিনি রামগড় সহ মাত্র বারটি দুর্গ আর বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের কয়েকটি জেলা অধিকার করে রইলেন।

শিবাজী দাক্ষিণাত্যে থাকলে মুঘলবাহিনীর অসুবিধা হবে বুঝেছিলেন জয়সিংহ। তাই ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাদশাহ ঔরংজীবের আমন্ত্রণ পত্র তুলে দিয়েছিলেন জয়সিংহ। অতি কষ্টে শিবাজীকে রাজি করিয়ে ছিলেন আগ্রায় আসতে। তারপর...

পুত্র সাম্ভাজী ও কয়েকজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষী নিয়ে আগ্রায় পৌঁছে ছিলেন শিবাজী (১৬৬৬ খ্রীঃ)। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে অতিথিশালায় স্থান হয়েছিল তাঁর। অতিথিসেবার ত্রুটি হয়নি। কিন্তু পরদিন দরবারে বাদশাহের আচরণে মর্মাহত হয়েছিলেন। প্রথমত তাঁর বসবার জন্য কোন আসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। এমন কি দরবারে প্রবেশের পর তাঁকে এবং তাঁর পুত্রকে দরবার গৃহের একধারে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। অপমানিত বোধ করেছিলেন তিনি। কিন্তু দরবার ত্যাগ করে চলে আসতেও পারেননি।

দরবার শেষ হওয়ার মুখে সাক্ষাৎ-প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। ভ্রূ কুঁচকে ছিলেন ঔরংজীব। প্রশ্ন করেছিলেন, বলুন কি চান আপনি?

বাদশাহের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন শিবাজী। কষ্টে নিজেকে সংযত করে প্রশ্ন করেছিলেন, জাহাঁপনা, আমি জানতে চাইছি আমি আপনার আমন্ত্রিত কিনা?

—আমন্ত্রিত? বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন ঔরংজীব। কে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন?

—আপনি স্বয়ং। ধীর কণ্ঠে বলেছিলেন শিবাজী।

—আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি? কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারেননি ঔরংজীব। প্রশ্ন করেছিলেন, কথাটা কি সত্য?

—মহারাজ জয়সিংহ আপনার আমন্ত্রণ পত্র আমাকে দিয়েছিলেন।

মৃদু হাসির একটা সূক্ষ্মরেখা ঔরংজীবের ওষ্ঠে ফুটেই মিলিয়ে গিয়েছিল। শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, বুঝেছি। তার কাছে এক সময় আপনাকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। তাই কৌশলে তিনি আপনাকে আগ্রায় পাঠিয়ে থাকবেন। এসেই যখন পড়েছেন, কয়েকদিন আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।

—অসম্ভব। আমি আজই দাক্ষিণাত্যে ফিরে যেতে চাই। বলেছিলেন শিবাজী।

—তাতো হয়না। শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন ঔরংজীব। আমার অনুরোধ কয়েকটা দিন আপনি আগ্রায় থাকুন। শিবাজী বুঝতে পেরেছিলেন তিনি ভুল করেছেন। প্রশ্ন করেছিলেন, জাহাঁপনা, আমি আপনার অতিথি না বন্দী?

—বন্দী! ঔরংজীব শিবাজীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। মৃদু হাসিতে মুখখানি ভরে গিয়েছিল তাঁর। শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, কথা দিচ্ছি, মেহমানের যত্নের কোন ত্রুটি হবে না।

সত্য সত্যই শিবাজীর যত্নের কোন ত্রুটি রাখেননি ঔরংজীব। পিতাপুত্র এবং সঙ্গীরা একই গৃহে স্থান পেয়েছেন। বাদশাহ শুধু তাঁদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

বলবন বলেছিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো বেগম?

উত্তরে বলেছিলাম, নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে বুড়া।

—শিবাজী সম্পর্কে এত আগ্রহী কেন তুমি?

—কেন? হেসে ফেলেছিলাম। তারপর বলেছিলাম, কিছু মনে কোরনা বুড়া। দাক্ষিণাত্যে যখন গিয়েছিলাম তখন এক সহেলীর কাছে মানুষটার কথা শুনেছিলাম। অতি সাধারণ একজন মানুষ একটা জাতির আপনজন হয় উঠলো কেমন করে সেই কথা শুনেছিলাম তার কাছে। দীন দুঃখী গরীবের বন্ধু। যেখানে অন্যায় অত্যাচার সেখানেই রুখে দাঁড়িয়েছেন মানুষটা। নিজে নয়, মানুষ তাঁকে রাজা বানিয়েছে। সেই জন্যই তাঁর সম্পর্কে আমি আগ্রহী।—শুনে কথা বলেনি বলবন।

তারপর কটা দিন পার হয়েছিল। কদিন পরে সূর্যোদয়ের পর এ গৃহের একটা

ছাদের উপর একজনকে দেখলাম। নাতি দীর্ঘ বলিষ্ঠ এক পুরুষ মূর্তি, শমশ্রু মণ্ডিত মুখ মণ্ডল। তিনি সূর্যের দিকে চেয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি অন্তরালে থেকে তাঁকে দেখেছিলাম। বুকের মধ্যে থর থর করে কেঁপেছিল আমার। মন বলেছিল তিনিই। এক সময় ধীর পদক্ষেপে নিচে নেমে গিয়েছিলেন।

গৃহটি একতলা। কিছুটা জীর্ণ। চারিদিকে উঁচু প্রাচীর ঘেরা। দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। প্রবাদ একসময় শাহজাদা পরভেজের মন্ত্রণালয় ছিল গৃহটি। শাহাজাদা ওই গৃহেই আমীর ওমরাহদের সঙ্গে গোপনে মিলিত হতেন। আব্বা জান বাদশাহ হয়ে মসনদে বসার পর ওই গৃহের ফটকে তালা বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। তারপর থেকে গৃহটি পরিত্যক্ত।

তাহলে কি বাদশাহ ঔরংজীব শিবাজীকে গৃহবন্দী করলেন? ওই গৃহের একটিই মাত্র প্রবেশ পথ। উঁচু প্রাচীর লঙ্ঘন করে পালানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ গৃহের চারিদিকেও আমীর ওমরাহদের গৃহ। দিনে রাতে চারিদিকে সতর্ক প্রহরা। অথচ সকলে জানবে শিবাজী অতিথি হয়ে আছেন বাদশাহের।

পরদিন সূর্যোদয়ে আবার তাঁকে দেখলাম। কদিন পরে তিনিও দেখলেন আমাকে।

শবনম, যৌবনের দিন বিগত প্রায়, তবু তোমাকে জানাই, বুকের গভীরে আমার ঝড়ের দোলা জেগেছিল। শরীরের রক্ত কণিকায় জেগেছিল শিহরণ। সেই ধীর স্থির শান্ত গম্ভীর মূর্তি আমার ঘুমে জাগরণে ব্যতিব্যস্ত করেছিল। আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম শবনম। তুমি বিশ্বাস করো, আমি ভাল বেসেছিলাম।

আচ্ছা, তুমিই বলো ভালবাসার কি কোন সময় অসময় আছে? যৌবনে আমি যে কাউকে ভালবাসিনী তা নয়। ভালবেসেছি বার বার। ভালবেসে মাথা কুটে মরেছি। মিলনের আকাঙ্ক্ষায় উন্মাদ হয়ে গেছি। কিন্তু কঠোর পাহারা বারবার বাধার সৃষ্টি করেছে। কত কেঁদেছি, কত...

না, সে সব দিনের কথা থাক। যৌবনের উন্মাদনার দিন শেষ হয়ে গেছে। বর্ষার দুরন্ত নদী এখন শীতের জড়তা মাখা। কামনা-বাসনার শেষ নেই জানি। নিজেকে সংযত করেছি ধীরে ধীরে। তাছাড়া রাজনৈতিক আবর্তে মধ্য যৌবনের দিনগুলো কেটেছে শঙ্কা আর বেদনার গুরুভার বহন করে। সেই সঙ্গে ভুলের হাহাকারে ডুকরে কেঁদেছি দিনের পর দিন। যন্ত্রণায় ছটফট করেছি।

ক'টাদিন খালেদা আমাকে চোখে চোখে রেখেছিল। বুঝতে পেরেছিলাম আমাকে লক্ষ্য করছে, কিন্তু সহজ হবার চেষ্টা করেও পারিনি। শেষে একদিন বলেছিল, লায়লা, আবার তুমি মরেছো।

কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলাম। কিছু বলতে পারিনি।

খালেদা বলেছিল, লায়লা, আম্মার চোখকে সন্তান কখনো ফাঁকি দিতে পারে না। সন্তানের আনন্দ-বেদনা আম্মা ঠিক বুঝতে পারে। যেমন ক্ষুধা বা অসুস্থতা তার চোখ এড়ায় না, তেমনি দুঃখটাও উপলব্ধি করতে পারে। বলবে আমি তো

তোমাকে পর্দা করি নি, কিন্তু লায়লা, পর্দা না করলেও সেই বচপন থেকে আমার বুকে যে তুমি বড় হয়ে উঠেছো। তোমার সব কিছুই আমি বুঝতে পারি। আগেও তোমাকে দেখেছি। এবার তোমার কি হয়েছে লায়লা?

খালেদার প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিনি। উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিলনা আমার পক্ষে।

বলবন বলেছিল বেগম, শাহাজাদা পরভজের ওই কোঠী বহুৎ খতরণক।

বলেছিলাম, ওকথা বলছো কেন বুড়া?

উত্তরে চোখ বুজে হেসেছিল বলবন। সেই দুষ্টুমির হাসি।

তারপর কোথা দিয়ে কি হয়েছিল আজও চিন্তা করে উঠতে পারি না। একজন মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। যেমন শাহজাদা পরভেজ তাঁর নর্তকীর গৃহ থেকে গোপন মন্ত্রণাকক্ষে গিয়ে উপস্থিত হতেন।

সংবাদ পাঠানো হয়েছিল। তিনি অপেক্ষা করছিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হয়ে এসেছে।

তিনি সচকিত প্রশ্ন করেছিলেন, কে?

মৃদু কণ্ঠে বলেছিলাম, আমি শাহাজাদী রোশেনারা।

—রোশেনারা!

—আপনি আমাকে চেনেন না। কোনদিন নামও হয়তো শোনেন নি। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। এ আপনি কি করেছেন? এমন ভুল মানুষ করে।

কক্ষে মৃদু আলো ছিল। সেই আলোয় তিনি আমার দিকে চেয়েছিলেন। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, আপনাকে আমি চিনি শাহাজাদী। আপনিও আমার একবারে অপরিচিতা নন। আপনার কথা একজন আমাকে জানিয়েছিল।

—কে সে?

—তার পরিচয় তো জানেন। আগ্রায় এসে যদি কোন বিপদে পড়ি আপনার সঙ্গে যোগাযোগের কথা জানিয়েছিল সে। কদিন আপনার কথাই চিন্তা করছিলাম কিন্তু যোগাযোগের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ঈশ্বরের করুণায় যোগাযোগ হয়ে গেল।

কার মারফৎ আমার পরিচয় জেনেছেন বুঝতে কষ্ট হয়নি। বুঝতে পেরেছিলাম শুধুমাত্র জনসমর্থন নয় শত্রু পক্ষেও ছড়িয়ে আছে মানুষটার সমর্থক। বলেছিলাম, তাহলে এভুল কেন করলেন আপনি?

ধীর কণ্ঠে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ভুল তো আমি করিনি।

শুনে স্তব্ধ হয়েছিলাম, বলেছিলাম, ভুল করেন'নি?

—না শাহাজাদী। একটু নীরব থেকে তিনি বলেছিলেন, একটা স্থায়ী সমাধানের জন্যই আমি স্বেচ্ছায় বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

জানতে চেয়েছিলাম, কিসের স্থায়ী সমাধানের কথা আপনি বলছেন?

তিনি গম্ভীরভাবে একটু চিন্তা করে ব্যথিত কণ্ঠে বলেছিলেন, বিধর্মীর অত্যাচার হিন্দুস্থানের মানুষ অনেক সহ্য করেছে। কিন্তু…

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

তিনি বলেছিলেন, জয়সিংহের সৈন্যদের অত্যাচার অবর্ণনীয়। বিশেষ করে নারীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। সেইজন্যই পুরন্দরের সন্ধি করেছিলাম সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করে শুধুমাত্র মানুষের নিরাপত্তার কারণে। কিন্তু অত্যাচার বন্ধ হয় নি। তাই জাহাঁপনার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারি নি। একটা স্থায়ী সমাধানের আশায় সব ঝুঁকি নিয়ে ছুটে এসেছিলাম। এসে বুঝলাম সব ছলনা।

প্রশ্ন করেছিলাম, এখন কি করবেন?

তিনি নীরব ছিলেন। ফিরে এসেছিলাম সেদিন।

শবনম, তোমাকে যে কথা লিখলাম, জানি, তুমি অবিশ্বাস করবে না। যেমন, তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি তার অপরিচিতা নই। শুনে বিস্ময়ের বাঁধ ভাঙা বন্যায় ভেসে যাইনি। যেমন, আমার এখনকার গতিবিধি বাদশাও ঔরংজীবের নখ-দর্পণে। আমি দিনে কবার হাই তুললাম তাও তিনি জানতে পারেন। কিন্তু অন্যে যদি শোনে অবিশ্বাস দানা বাঁধবে তার মনে। বলবে, অসম্ভব।

কিন্তু অসম্ভব বলে কি কিছু আছে? নেই।

কদিনের মধ্যেই আমাদের হৃদ্যতা জন্মেছিল। আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করেছিলাম। আর অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল বলবন নামের বৃদ্ধ খোজা বান্দা। বান্দা বলবন। সর্বত্র যার অবাধ গতি। বাদশাহ্ আকবর শাহের সময় থেকে মুঘল বংশে যে প্রিয়। যার বুদ্ধিমত্তায় মাহাম আনাখার পুত্রের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন বাদশাহ আকবর শাহ।

সেদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পর নিদ্রামগ্ন ছিলেন আকবর শাহ্। মাহাম আনাখার পুত্র আধম খান দলবল নিয়ে হারেম আক্রমণ করেছিলেন। নিরস্ত্র আকবরকে আধম খান যখন আক্রমণ করতে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে বালক বলবন ছুটে গিয়ে বাদশাহের হাতে তরবারি তুলে দিয়েছিল। বাদশাহের হাতে মৃত্যু হয়েছিল আধম খানেরই। সে সংবাদ শোনার চল্লিশ দিন পরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন মাহাম আনাখা। তাঁর বড় সাধ ছিল পুত্র আধম খানকে দিল্লীর মসনদে বসাবার। বাদশাহ আকবর শাহ সেইদিনই জীবন রক্ষাকারী বলবনকে মুক্তি দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, বলবনের যেখানে ইচ্ছা যাবে। তার প্রতি কারো হুকুমই প্রযোজ্য নয়।

সেই বলবনই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলো। উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করেছিল রক্ষী প্রহরী সকলকে। তারপর…

তাঁর সঙ্গে দেখা হতে বলেছিলাম, বলুন আপনি কবে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যেতে চান?

শিবাজী আমার কথা শুনে বিস্মিত দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

· বলেছিলাম, আপনার মুক্তির উপায় আমি স্থির করেছি। এই গৃহ থেকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আমি করবো। এখন বলুন শুধুমাত্র কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে আপনি বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন ?

কৌতুকের ঝিলিক খেলে গিয়েছিল মারাঠার চোখে। বলেছিলেন, আপনার কি মনে হয় শাহাজাদী ?

—আমি সত্য জানতে চাইছি আপনার কাছে।

হেসে ফেলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, না শাহাজাদী, কয়েকজন দেহরক্ষী আর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে আগ্রায় আসিনি। দাক্ষিণাত্য থেকে এখানে আসার পূর্বেই আমার অসংখ্য সহচর এখানে এসে পৌঁচেছে। কিন্তু তারা এসেও কোন লাভ হল না। চিন্তা করতে পারিনি বাদশাহ এইভাবে আমাকে বন্দী করে রাখবেন।

—তবে কি আপনি ভেবেছিলেন বাদশাহ ঔরংজীব আপনাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দিল্লীর লাড্ডু খাওয়াবেন ?

আমার কথাটা শুনে তিনি রাগ করেন নি, হেসে ফেলেছিলেন। গভীর দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন আমার মুখের দিকে। তাঁর সে দৃষ্টিতে কি ছিল জানি না, বুকের মধ্যেটা আমার থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। মৃদু কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, তাই তো !

এক ঝলক রক্ত চমকে উঠেছিল। থর থর করে কেঁপে উঠেছিল সর্বশরীর। নত হয়েছিল চোখ। গভীর কণ্ঠে তিনি আমার নাম ধরে ডেকেছিলেন।

অস্ফুটে বলেছিলাম, দিনের সূর্য অস্তাচলের পথে রাজা।

— রাতের আকাশে ধ্রুবতারা তো মিথ্যা নয় ?

—গাঢ় আঁধারে পথের দিশা পাওয়া যায় না রাজা।

—মনের ঠিকানা যদি ভুল না করে হারিয়ে যাওয়ার ভয় কোথায় ?

— ভয়ে যে মরি সদা।

হেসেছিলেন তিনি। এগিয়ে এসেছিলেন কাছে, আরো কাছে। আমার দুই হাত তাঁর বলিষ্ঠ হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, আমি ভুলবো না। কথা দিলাম।

সেই মুহূর্তে আমার যে কি হয়েছিল জানি না। আনন্দ বেদনায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল মন। শুধু বলেছিলাম, তুমি আগে আসনি কেন ? তিনি কথা বলেননি।

শবনম, একদিন মানুষ জেনেছিল বাদশাহ ঔরংজীবের কড়া পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে শিবাজী কৌশলে আগ্রা থেকে পালিয়ে গেছেন। তাঁর পলায়ন নিয়ে মানুষের মুখে মুখে নানা কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কেউই জানে না। জানে না নেপথ্যের কথা।

অসুস্থ হয়েছিলেন শিবাজী। হেকিম গিয়েছিলেন তাঁর চিকিৎসার জন্য। সেখানেও অর্থের খেলা। হেকিম জানিয়েছিলেন শিবাজী গুরুতর পীড়িত।

কয়েকটা দিন তাঁর ওপর বন্ধ হয়েছিল খবরদারি। তাঁকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়েছিলেন ঔরংজীবের লোক।

ভাইজানকে জানিয়েছিলাম আমি তাজমহলে যাব। আব্বাজান আম্মাজানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবো। আমি দীর্ঘদিন প্রতি বছর একবার-দুবার, কোন কোন বছর তারও বেশি তাজমহলে যাই। গিয়ে আম্মার সমাধির পাশে বসে থাকি চুপ করে। ভাল লাগলে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকি। ভাল লাগে। আগে আব্বাজান যখন বাদশাহ ছিলেন, তখন অনুমতি বা জানানোর প্রয়োজন ছিল না। ঔরংজীব বাদশাহ হবার পর তাঁকে জানাই। তিনি বলেছিলেন, কোন প্রয়োজন নেই তাঁকে জানানোর। আমার ইচ্ছা হলেই আমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি। তবু কেন জানি না, আমি প্রতিবারই যাবার আগে তাঁকে জানাই। আর এই আগে জানিয়ে রাখার জন্য একটা সুবিধাও লক্ষ্য করেছি, নগররক্ষীরা আমার যাতায়াতের পথের সব বাধা দূর করে দেয়।

শেষ শরতের আকাশ হঠাৎ-ই ভারী হয়েছিল থমথমে মেঘে। আগের দিন মধ্যরাত্রি থেকেই সুরু হয়েছিল বৃষ্টি। ভোরের আগে বৃষ্টির বেগটা কমেছিল কিছুটা, কিন্তু বৃষ্টি বন্ধ হয়নি। সকাল হয়েছিল। আমার গৃহ থেকে তিনটি শিবিকা তাজমহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। যদিও এবার শিবিকা বাহকদের যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। কারণ দীর্ঘদিন তারা আমার শিবিকা বহন করছে। এবার নিশ্চয়ই আমার শিবিকা অন্যান্য বারের তুলনায় বেশি ভারী ছিল, কিন্তু সব ব্যবস্থাই আগে থেকে করে রেখেছিল বলবন।

এবার কিন্তু পথে বাধা পেয়েছিলাম। শিবিকার গতি রোধ করেছিল নগররক্ষী। খালেদার চিৎকার কানে এসেছিল। শিবিকা থেকে মুখ বাড়িয়ে নগররক্ষীকে বলেছিলাম, কি হল ?

সে বলেছিল, আমি দেখবো।

প্রশ্ন করেছিলাম, দেখবে কেন ?

—সেই রকমই হুকুম আছে।

—কার হুকুম ?

—বাদশাহের হুকুম। নগরপাল সেই হুকুম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের।

একটু চিন্তা করে বলেছিলাম, ভাল। তুমি কি আমার পরিচয় জান ?

সম্মান জানিয়ে সে বলেছিল, জানি জনাব আলী।

—বাদশাহজাদীর শিবিকা তল্লাসীর হুকুমও কি তোমার ওপর আছে ?

—সেরকম হুকুম নেই। বিনীতভাবে সে বলেছিল, সন্দেহজনক সব কিছুই তল্লাসীর হুকুম আছে।

বুকের মধ্যে দুরু দুরু করছিল। খোদাকে স্মরণ করেছিলাম। বুঝতে পেরে-

ছিলাম কেন এই বিশেষ সতর্কতা। শিবাজীর ভয়ে খোদ আগ্রায় বসে কতটা ভীত বাদশাহ ঔরংজীব। চতুর-কৌশলী শিবাজীর অসাধ্য কিছুই নেই। বহুবার তিনি অঘটন ঘটিয়েছেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। শান্ত কণ্ঠে বলেছিলাম, শোন, আমার তিনটি শিবিকায় আমি এবং আমার বাঁদীরা আছি। যাচ্ছি তাজমহলে আম্মা-জানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে। এ সময় কোনরকম বাধা সৃষ্টি আমি পছন্দ করছি না। বাদশাহকে আমার তাজমহল যাত্রার কথা আগেই জানিয়েছি। তোমাকে কোনরকম তল্লাসী করতে আমি দিতে চাই না। তুমি এক কাজ করতে পার, আমাদের নগরপালের কাছে নিয়ে চল। সেখানে তিনিই জেনে নেবেন বাদশাহের কাছে, আমার তাজমহল যাওয়ার অনুমতি তিনি দিয়েছেন কি-না।

কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীর মুখ পাংশু বর্ণ ধারণ করেছিল। পরিণতির কথা চিন্তা করে বার বার মার্জনা চেয়েছিল। বলেছিলাম, শোন, আমরা তাজমহলে যাচ্ছি। তুমি সংবাদ নিয়ে সেখানে আসতে পার।

নির্বিঘ্নে তাজমহলে পৌঁছেছিলাম। বিদায় মুহূর্তে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলাম রাবেয়া বেগমের ঐশ্বর্য। তিনি বলেছিলেন, এতে কি আছে?

মৃদু কণ্ঠে বলেছিলাম, সামান্য দৌলত। একজন এটি আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন। সৎ কাজে ব্যয় করার কথা বলে গিয়েছিলেন তিনি। আমি আজ একজন সৎ মানুষের হাতে তুলে দিয়ে ভারমুক্ত হলাম।

তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমাকে আমার মনে থাকবে।

বুকের মধ্যে সমুদ্রের আলোড়ন। বলেছিলাম, আর দেরি কোর না।

তিনি বলেছিলেন, বড় দেরি হয়ে গেল।

হেসেছিলাম। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলাম, এই ভাল!

দেখতে পেয়েছিলাম ইতস্ততঃ কিছু মানুষ। তাদের মধ্যে একটা বৃদ্ধ মুখ।

২৩

আক্ষেপে ফেটে পড়েছিলেন বাদশাহ ঔরংজীব, বহিন, এ তুম ক্যা কিয়া? ম্যায় কভি নেহি শোচা।

শান্ত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলাম, কি করেছি ভাইজান? কি চিন্তা করেন নি?

ঔরংজীব বলেছিলেন, সব খবরই আমি জেনেছি।

—কি জেনেছেন আপনি ভাইজান?

— মারাঠা কুত্তাটাকে পালিয়ে যেতে তুমিই সাহায্য করেছো।

অবাক কণ্ঠে বলেছিলাম, শুনেছিলাম বটে শিবাজী আপনার সঙ্গে দেখা করতে

এসে বন্দী হয়েছেন। বন্দী কেমন করে পালিয়ে গেলেন?

—সেটাই তোমার কাছে জানতে চাই।

—আমার কাছে? বিস্মিত হয়েছিলাম। বলেছিলাম, এ আপনি কি বলছেন ভাইজান?

ঔরংজীব ক্রোধে অন্ধ হয়েছিলেন। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, আল্লাহর নামে বল তুমি কি কিছু জান না?

শুনে চুপ করেছিলাম।

তিনি বলেছিলেন, কি হল, চুপ করে রইলে কেন?

হেসে ফেলেছিলাম। বলেছিলাম, বুরা না মানো ভাইজান। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করেন?

স্পষ্ট দেখেছিলাম আমার কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন ঔরংজীব, তারপর বলেছিলেন, তোমাকে বিশ্বাস করি, কি করি-না তাতো তুমি ভালই জান বহিন।

—জানতাম। বলেছিলাম, কিন্তু এখন বোধহয় আমার প্রতি আপনার সেই বিশ্বাসটা অটুট নেই, তা যদি থাকতো, তাহলে আপনি আল্লাহর নামে শপথ করে আপনার বিশ্বাসের ভিতটাকে মজবুত করতে চাইতেন না। আল্লাহর নামে শপথ আমি করতে পারি ভাইজান, কিন্তু যেখানে আমার প্রতি অবিশ্বাস আপনার মনে বাসা বেঁধেছে, সেখানে তাঁর নাম নিয়ে আপনার বিশ্বাস উৎপাদন করতে চাই না।

আমার কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঔরংজীবের মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঔরংজীব ভিন্ন ধাতুতে গড়া মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে এনেছিলেন। সূক্ষ্ম হাসির একটি রেখাও ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখে। বলেছিলেন, তাহলে বহিন, যে সংবাদ আমি পেয়েছি তা ঠিক নয়?

কোন উত্তর আমি দিই নি।

ঔরংজীব বলেছিলেন, শিবাজী তার পুত্র আর দশজন দেহরক্ষীর মধ্যে মাত্র দুজনকে নিয়ে পালিয়েছে। আটজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা চলছে। সত্য নিশ্চয়ই জানা যাবে।

শিবাজীর পলায়নের চতুর্থ দিনের বিকালের ঘটনা। তিন দিন পরে শিবাজী পালিয়েছে এই সংবাদ জানা গিয়েছিল। বলবনের কাছে শুনেছিলাম গোপন সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান বাদশাহ পাননি। বলবন বলেছিল, তার ইন্তেকালের পর ও-পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে থাকে। তৈরি করিয়েছিলেন শাহজাদা পরভেজ। জাহাঙ্গীরের সময়ে আমীর ওমরাহদের একটা অংশ তাঁর সমর্থক ছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন জাহাঙ্গীরের পর শাজাহান নয় পরভেজ বসুন দিল্লীর মসনদে। পরভেজের ইচ্ছায় জাহাঙ্গীরের অনুমোদনে পরপর তিনটি গৃহ নির্মিত হয়েছিল। তৈরি হয়েছিল গোপন সুড়ঙ্গ পথ। আমি যে গৃহে আছি সেখানে থাকতো পরভেজের

এক নর্তকী রক্ষিতা। জাহাঙ্গীরের শেষজীবনে রাজনৈতিক অস্থিরতায় নর্তকীর গৃহ থেকে তৃতীয় গৃহ এক আমীরের গৃহে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন পরভেজ। বলবন ছিল বিশ্বস্ত খোজা। দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতায় মুঘল বংশের অনেক কিছুই জানে সে।

চলে যাবার আগে ঔরংজীব বলেছিলেন, বহিন, তুমি তাহলে সত্য গোপন করে গেলে ?

শান্ত কণ্ঠে বলেছিলাম, ভাইজান সত্য প্রকাশ হবেই।

ঔরংজীব চলে গিয়েছিলেন। সেইদিন থেকেই আমি তার বন্দিনী হয়েছিলাম। একটু-একটু করে আমার সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

২৪

জাহানারা চলে গেল। বলে গেল, আগামীকাল প্রভাতে আমার মুক্তি! যদি সে না আসে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব। আজ আমি একা! খালেদা ছিল। খালেদা নেই। কদিন আগে ঘুম ভেঙ্গে খালেদাকে দেখতে পেলাম না। ভাবলাম নিশ্চয়ই কোথাও আছে। আসবে। কিন্তু খালেদা এল না।

বলবন গেছে। মীর গেছে। খালেদাও চলে গেল। তাকেও নিশ্চয়ই…

না, ভাবতে পারছি না। খালেদা ঔরংজীবের মুখেও তো আহার তুলে দিয়েছে একদিন। ভাইজানকে খুবই ভালবাসতো খালেদা। সুন্দর দেখতে ছিল ভাইজানকে। খালেদা আদর করে ডাকতো, মেরালাল।

ঔরংজীব খালেদাকেও……। ভাবতে পারছি না। খালেদা নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। অতখানি নির্মম নিশ্চয়ই হবে না ঔরংজীব।

অনেকদিন ভাল করে ঘুমাইনি। খালেদা যাবার পর কটা দিন দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি। চোখ বুজলেই দুঃস্বপ্ন দেখি। জানের ভয়? না, মৃত্যুকে আমার ভয় নেই। কষ্ট খালেদার জন্যে।

গতরাত্রেও আমার চোখে ঘুম নামেনি। চিন্তার সমুদ্র আছড়ে পড়েছিল। চিন্তা আর চিন্তা, শেষ নেই। মনে পড়েছিল ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। বাল্য, কৈশোর, যৌবনের দিনগুলো। কত দুঃখ, বেদনা, আনন্দ। সবকিছু ছুঁয়ে গিয়েছিল মনকে। আজ সায়াহ্নে সূর্য পশ্চিমে অস্তরাগে রাঙা। যৌবনের দিনগুলোয় জড়িয়ে পড়েছিলাম রাজনৈতিক আবর্তে। শুধু অর্থ নয় অনেক গোপনীয় সংবাদও সে সময় নিয়মিত সরবরাহ করেছিলাম শাহাজাদা ঔরংজীবকে।. প্রভাবশালী আমীর-ওমরাহদের একাংশকে এনেছিলাম তার পক্ষে। তবে সবটাই গোপনে। পাদশাহ বেগম জাহানারার মত প্রকাশ্যে কখনো আসিনি। আমার বিশ্বাস যদি, তা করতাম, সাধ্য ছিল না ঔরংজীবের মুঘল মসনদে বসা। প্রতিদানে ঔরংজীবের কাছে কিছুই

চাইনি কখনো। জীবনভর শুধু দিয়েই গেলাম। কোনদিন কিছু প্রত্যাশা করিনি। আল্লাহর দেওয়া সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সমান ভাবে গ্রহণ করেছি। একজন দুহাত ভরে দিয়ে গেলেন; আমার আগামী দিনের স্মৃতি। বিদায় মুহূর্তে তাজমহলে আব্বা আর আম্মাজানের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে গভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, তোমাকে কিছু দেবার সাধ্য আমার নেই, আমি হৃদয়ভরে নিয়ে যাচ্ছি।

বাইরে মেঘলা আকাশ টিপ্‌টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ছায়া ছায়া অন্ধকারে সমাধি গৃহ ভরে আছে। তাঁর অস্পষ্ট মুখের দিকে চেয়ে মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলাম, দাওনি কি? আমার মন ভরে গেছে। বঞ্চিতের বেদনা দূর হয়ে গেছে আমার। শুধু একটি অনুরোধ আমার কথা ভুলে তোমার সাধনা সম্পূর্ণ কোর।

তিনি কথা বলেননি। আমার চোখে চোখ রেখেছিলেন। দেখেছিলাম তাঁর দুচোখে প্রতিজ্ঞার আলো।

তিনি চলে গেলেন।

ভাবতে ভাবতে পরম তৃপ্তিতে আমার বুকভরে গিয়েছিল। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ-ই ডাক শুনেছিলাম। লায়লা বলে কে যেন ডেকেছিল আমাকে। বিছানায় উঠে বসেছিলাম। না, আর শুনতে পাইনি সে ডাক। আমি কি ভুল শুনেছি? কিন্তু এখনও আমার কানে ভাসছে সে ডাক। ভুল আমি শুনিনি।

তারপর রাত্রি শেষ হয়েছে। দিনের আলো ফুটেছে। শুরু হয়েছে দিন।

জাহানারা এলো দ্বিপ্রহরের পর। আমি তখন দ্বিতলে আমার শয়ন কক্ষে বিছানায় শুয়েছিলাম। আজ সকাল থেকে জলস্পর্শ করিনি। বাঁদীরা কবার অনুরোধ করে ফিরে গিয়েছিল। সমস্ত দিন আমার কি হয়েছিল জানি না। অস্থিরতা আমাকে গ্রাস করেছিল। দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমার। আমি কোথাও পালিয়ে যেতে চাইছিলাম। কিন্তু আমি বেশ জানি যাবার পথ আমার রুদ্ধ।

পদশব্দ শুনতে পাইনি। উপুড় হয়ে শুয়েছিলাম। কে যেন আমার পিঠে হাত রেখেছিল। সেই স্পর্শে আমি ফিরে ছিলাম। সস্নেহে জাহানারা বলেছিল, কি হয়েছে বহিন?

আমি উত্তর দিতে পারিনি। সমস্ত শরীর আমার থরথর করে কাঁপছিল।

জাহানারা আমাকে ধরেছিল। গভীর কণ্ঠে ডেকেছিল, রোশনি!

সে ডাকে কি ছিল আমি জানি না। তার বুকে মুখ লুকিয়ে আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম। জাহানারা দু-হাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে নিয়েছিল।

এক সময় কান্নার বেগ প্রশমিত হয়েছিল। জাহানারা একটু একটু করে জেনে নিয়েছিল সব কথা। কিছুই গোপন করিনি আজ তার কাছে।

জাহানারা বলেছিল, রোশনি আমিও শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চায়নি। অসম্ভবকে তুমি সম্ভব করেছো বহিন।

মৃদু কণ্ঠে জানতে চেয়েছিলাম, আমি কি অন্যায় করেছি?

—অন্যায় ? আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল জাহানারা। প্রশ্ন করেছিল, তোমার মন কি বলে ?

আমি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি।

পরম মমতায় জাহানারা আমার মাথাটা তাঁর বুকে চেপে ধরে মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, তুমি ঠিকই করেছো বাহিন। লেকিন…।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

জাহানারার মুখমণ্ডল গম্ভীর। ধীর কণ্ঠে সে বলেছিল, বাদশাহ ঔরংজীব তোমার কাছে হেরে গেছে। তাই বড় ভয় হচ্ছে। শোন, ভেবেছিলাম, কটা দিন পরে সিক্রি যাত্রা করবো। না, আগামী কাল প্রভাতে আমরা যাব। তুমি আজই তৈরি হয়ে নাও।

অবাক হয়ে বলেছিলাম, কালই ?

হ্যাঁ, কালই। আমি আর দেরি করতে চাই না। আমার আরো আগে তোমাকে নিয়ে চলে যাওয়া উচিৎ ছিল। চিন্তা কোর না। রাতে কেউ যদি ডাকে দরজা খুলবে না।

—খালেদা কি রাতে ডেকেছিল আমাকে ?

—জানি না। ও কথা চিন্তা কোর না। আগামী কাল সূর্যোদয়ের পরই আমি তোমার কাছে পৌঁছে যাব। তারপর মুক্তি।

জাহানারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। আমি তার একটা হাত চেপে ধরেছিলাম। সে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিল। আম্মার মত হাসি মুখে কপালে চুম্বন এঁকে দিয়ে বলেছিল, ভয় কি, আমি তো আছি।

চলে গিয়েছিল জাহানারা।

শবনম, জাহানারা চলে যাবার পর আমার মনটা অসম্ভব হালকা হয়ে গিয়েছিল। মুক্তির স্বাদ অনুভব করেছিলাম অন্তরে। গোধূলির রক্তরাগে আকাশ তখন ভরা ছিল। আমি মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছিলাম। মানসপটে ভেসে উঠেছিল সেই পরিচিত মুখখানি। কি করছেন এখন তিনি। আমি তাঁর কথা ভাবছি। তিনিও কি…

শবনম, বাইরে সন্ধ্যা নেমেছে। আকাশের বুকে অসংখ্য তারার মালা। আজ এখানেই লেখা শেষ করছি। ইচ্ছা আছে, ফতেপুর সিক্রিতে গিয়ে এ পত্র রচনা তোমার কাছে পাঠাবার একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবো। অপেক্ষায় থাকবো তোমার উত্তরের। বলবন থাকলে আমি কোন চিন্তাই করতাম না।

বাঁদী আমার খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে। আহার শেষ করে শয্যা গ্রহণ করবো আজ। দুচোখে আমার ঘুম জড়িয়ে আসছে। আমি ঘুমাবো। জাহানারা আগামীকাল প্রভাতে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। সে আমার মুক্তির দূত হয়ে নিশ্চয়ই আসবে। ভালবাসা নিও।

ইতিহাস বলছে, সম্রাট শাজাহানের কনিষ্ঠা কন্যা শাহাজাদী রোশেনারা বেগম গুপ্তঘাতকের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন।